দ্বিজেন্দ্রলাল

(স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
জীবন ও রচনার ইতিহাস)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এস্. সি.
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
১৩২৩ সাল।

All Rights Reserved.] [মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা।

যাঁহার "মেঘনাদ" শ্রবণে

বালককালে আমার চিত্তে

কাব্যপাঠানন্দের উন্মেষ হয়

বঙ্গীয় কাব্যে অপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চারকারী

সেই মহাকবি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

অমর স্মৃতির উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

"Paint me as I am. If you leave out the scars and wrinkles, I will not pay you a shilling." *Oliver Cromwell.*

"Speak of me as I am ; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice"—*Othello.*
"I will a round unvarnished tale deliver"—*Ditto* .

"I send you this bald *résumé* * * * ; but I am conscious it is of little worth. The value of a book depends on a writer's fitness to make it worth reading ; wanting which he may travel from youth to old age among teeming adventures, and the record be barren."—*My Life in Two Hemispheres—by Sir Charles Gavan Duffy.*

ভূমিকা

এই গ্রন্থ বঙ্গীয় [illegible] বরপুত্র, দেশাত্মবোধের চরম সঙ্গীতকার, যুগান্তকারী নাট্যশিল্পী, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন-কথা ও বাণী-সাধনার ইতিহাস। 'বিস্তারিত জীবন-চরিত' বলিলে যাহা বুঝায় এই পুস্তক ঠিক তাহা নহে—ইহাকে কবিবরের জীবনের অনুশীলন (Study) বলা যাইতে পারে।

নব্যভারত, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, জন্মভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গদর্শন, ভারতী, প্রবাসী, সাধনা, অর্চ্চনা, নাট্যমন্দির, সন্দেশ, সবুজপত্র, সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা, মানসী ও মর্ম্মবাণী, বঙ্গবাসী, নায়ক, বাঙ্গালী প্রভৃতি মাসিক ও সংবাদ পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে ও জীবনান্তে তাঁহার জীবনকথা ও সাহিত্য-কীর্ত্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, তৎসমূহ হইতে এই গ্রন্থ রচনা বিষয়ে আমি প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি উক্ত পত্রসমূহের সম্পাদকবৃন্দের ও প্রবন্ধরচয়িতাগণের নিকট ন্যূনাধিক পরিমাণে ঋণী। গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সে ঋণ স্বীকার করিয়াছি, এস্থলে তাঁহাদের সকলেরই নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। উক্ত প্রবন্ধাদি লেখকগণের মধ্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত প্রসাদ-দাস গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, এবং স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বাণী-সাধক মহোদয়গণ আমার বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের রচনা হইতেই

আমি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেতিহাসের মূলসূত্র ধরিতে পারিয়াছি এবং গ্রন্থ-সমালোচনার সার সংগ্রহ করিয়াছি। উপরন্তু জ্ঞানেন্দ্র বাবু, প্রসাদদাস বাবু ও অধরবাবু বহুবিধ মৌখিক সংবাদাদি দানেও আমাকে পরম বাধিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অপর যাঁহাদের নিকট আমি উপকরণাদি সংগ্রহবিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীমান্ দীলিপকুমার রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ললিত বাবু পূর্ণিমা-মিলনের তালিকা সঙ্কলনে, ও অপরাপর বিষয়ে, কিশোরী বাবু থিয়েটার সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহে, প্রমথনাথ বাবু সাহিত্যিক বাদানুবাদ সম্বন্ধে ব্যক্তব্য বিষয়ে একটি সুপরামর্শ দানে, এবং দীলিপকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতের পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। আর বন্ধুবর রসময় বাবুর ভরসাতেই আমি এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হই এবং গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহ হইতে প্রুফ্-সংশোধন পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহার সহৃদয় ও মূল্যবান্ সহায়তায় আমি এই কার্য্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি।

১৮নং কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩২৩।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

———

সূচী

চিত্র সূচী

দ্বিজেন্দ্রলাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:*:—

বংশপরিচয়
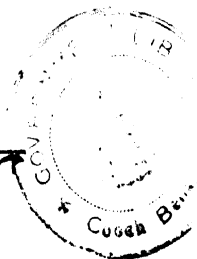
১২৭০ বঙ্গাব্দে, ৪ঠা শ্রাবণ, কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভূমিষ্ঠ হয়েন। রায় মহাশয়েরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। তাঁহাদের বংশের বাৎস্য গোত্র, কুতব শাখা, পঞ্চ প্রবর ও সন্তামণি গাঁই। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা, স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর রাজ-সংসারে দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া, রায় মহাশয়দিগের বংশ "দেওয়ান চক্রবর্ত্তী"র বংশ বলিয়া খ্যাত। অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে "কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন" স্থলে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"চক্রবর্ত্তী গোপাল দেওয়ান সহবতি।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥"

মদনগোপাল কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের প্রপিতামহ—তিনি সেনাপতি এবং তাঁহার অগ্রজ রামগোপাল সহবতের দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মদনগোপাল "রায়বক্সী" পদে অধিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাঁহার অধস্তন পুরুষদিগের "রায়" উপাধি রহিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ছয়ঘরিয়া কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করায় "মতকর্ত্তা"র বংশ বলিয়াও রায় মহাশয়দিগের খ্যাতি আছে। ধনসম্পদে ও মানসম্ভ্রমে কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পিতামহ রাধাকান্ত রায়ের সমকক্ষ লোক কৃষ্ণনগরে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং কার্ত্তিকেয়-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায়ের পরার্থপরতার ও সরল স্বভাবের কথা শুনিলে মনে স্বতঃই ভক্তি ও বিস্ময়ের উদয় হয়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের পরম বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং জ্ঞাতি কুটুম্বের ন্যায় সমাদৃত ও সম্ভাষিত হইতেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নিজেও সেই রাজ-সংসারে দীর্ঘকাল কর্ত্তৃত্ব করিয়া কায়মনোবাক্যে সেই রাজবংশের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র প্রথমে পার্শী শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গালা, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়েন। তিনি কিছুদিন কলিকাতার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে রাজা শ্রীশচন্দ্রের আগ্রহে কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন এবং আপনার আদর্শচরিত্র-বলে ও কর্ম্মপটুতায় সামান্য পদ হইতে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হয়েন। তিনি একাদিক্রমে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, মহারাজ সতীশচন্দ্র, মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র এই তিন জন কৃষ্ণনগরাধিপের অধীনে কার্য্য করিয়া অসামান্য সামঞ্জস্য বুদ্ধির, তেজস্বিতার ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বন্ধু ও মাতুল-পুত্র ছিলেন, এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নাট্যকার-কুলতিলক দীনবন্ধু মিত্র এবং বারাসতের মহামনস্বী কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন যশস্বী ব্যক্তিগণের সহিত

তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরের রাজগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও আদৃত হইতেন এবং কৃষ্ণনগরবাসীদিগের পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তেমনই আবার গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত সমাজের তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, সঙ্গীতজ্ঞ, সদালাপী ও সাহিত্য-রসিক ছিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার সুরধুনী কাব্যে কৃষ্ণনগর বর্ণনা কালে জলাঙ্গী নদীর মুখে বলিয়াছেন—

"কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্,
সুললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হ'য়ে উজানবাহিনী।"

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—"ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত" ও "আত্মজীবন চরিত"। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি সংস্কৃত "ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতাবলী" নামক পুস্তকের আদর্শে লিখিত। ঐ সংস্কৃত পুস্তকখানি ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে বার্লিন নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ডেপুটী কালেক্টর ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র প্রথমে কৃষ্ণনগর রাজাদিগের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেন। পরে জনৈক সুবিজ্ঞ আত্মীয়ের অনুরোধে তিনি বিস্তারিত ভাবে সেই ইতিহাস রচনা করেন। দিবসে রাজবাটীর কার্য্যের পর রাত্রিতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্র দুই বর্ষে এই গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। এই গ্রন্থ প্রচারে একটী সুফল ফলিয়াছিল। কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস বাহির হইতে দেখিয়া, কুচবিহার, নাটোর, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস লিখিত এবং প্রচারিত হয়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের "আত্মজীবন-চরিত" পুস্তকখানিও

বাঙ্গালার সাহিত্য-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উভয় গ্রন্থেই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সঞ্চিত আছে। এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যতীত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র স্বরচিত নানা বিষয়ের গীত সংগ্রহ করিয়া "গীতমঞ্জরী" নামক একখানি সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করেন। ১২৮৫ সালে শেষোক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—*

"পিতৃদেবের চরিত্র মূর্ত্তিমান্ সঙ্গীত, মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য। সততা, সাহস, সত্যবাদিতা, সংযম, ন্যায়পরতা, জিতেন্দ্রিয়তা, অকপটতা, পবিত্রতা, বুদ্ধি, একাধারে এমন সমতানে মিলিত হইতে প্রায়ই কুত্রাপি দেখা যায় না। তাঁহাকে দেবোপম না বলিলে তাঁহার প্রকৃত বর্ণনা হয় না। দ্বিজেন্দ্র বিলাত হইতে একখানি পত্রে পিতৃদেবকে "God-like" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার "দুর্গাদাস" নাটকের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন—'যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি দুর্গাদাসচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্ম্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।' এই ভাষাতে কিছুমাত্র অলঙ্কারের অত্যুক্তি নাই।"

দ্বিজেন্দ্রলালের জননী ছিলেন শান্তিপুরের গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের কন্যা। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন এবং স্নেহ-মমতায় ও সন্তানবাৎসল্যে দ্বিজেন্দ্রের হৃদয়ে গভীর ও অচলাভক্তির উদ্রেক করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র যখন জীবন-সায়াহ্নে ভীষ্মকে বলাইয়াছেন—

"মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে
কত অর্থ যাহা কোন অভিধানে নাই
কত সুধা যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।" ইত্যাদি,

* নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২০।

তিনি যখন চন্দ্রগুপ্তকে বলাইয়াছেন,—"তুমি যাই কর, তুমি আমার কাছে মা,—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—তখন সেই নাটকীয় উক্তির মর্ম্মভেদ করিয়া আমরা তাঁহার নিজের হৃদয়ের ধ্বনি শুনিতে পাই। দ্বিজেন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ নাটক "পরপারে" গ্রন্থের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"সরযূ—মা চিন্‌লে না। চিনবে সেইদিন, যেদিন হারাবে।

"মহিম—তুমি চিনেছ?

"সরযূ হাঁ—আমি যে হারিয়েছি। ও রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না।" এখানেও আমরা কবির নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাই।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সাত পুত্র—দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বকনিষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ৺রাজেন্দ্রলাল, স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সতীর্থ ও মিত্র ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্-এ, বি-এল্, এবং ষষ্ঠ অগ্রজ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি-এল্ বঙ্গসাহিত্য-সাংসারে সুপরিচিত। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এক সময়ে "বঙ্গবাসী" পত্রের সম্পাদকতা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত "পতাকা"ও এক সময়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অন্যতম লেখক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এক্ষণে নদীয়াধিপতি ক্ষৌণীশচন্দ্রের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। হরেন্দ্র বাবু জ্ঞানেন্দ্র বাবুর সহযোগে "নবপ্রভা" পত্রের সম্পাদনা করেন। "নবপ্রভা" এক সময়ে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। হরেন্দ্র বাবু এক্ষণে ভাগলপুরে ওকালতী করেন। দ্বিজেন্দ্রের চতুর্থ অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল রায় নদীয়া-রাজের বর্ত্তমান ম্যানেজার এবং দ্বিতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল রায় সেরিস্তাদারী কর্ম্ম করেন। কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণের বিদ্যানু-

রাগ যে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত ও সাহচর্য্য যে তাঁহার বিদ্যার্জ্জনে সহায়তা করিয়াছিল, একথা আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের একটী মাত্র কন্যা ৺মালতী দেবী দ্বিজেন্দ্রের কনিষ্ঠা ছিলেন। কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জলাল লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নিকুঞ্জ বাবু শান্তিপুরে ডাক্তারী করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এই কনিষ্ঠা ভগিনীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। দ্বিজেন্দ্র 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) নামক কৈশোরক কবিতা পুস্তকে 'উপহার' কবিতায় তাঁহার এই কনিষ্ঠা ভগ্নীকে "হৃদয়ের ভগিনী আমার" সম্ভাষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"কি তোমার কণ্ঠোপরে পূর্ণশোভা নাহি ধরে
কি নাহি কোকিল স্বরে ঢালে সুধা প্রাণে
কিবা নাহি ধরে শোভা পূর্ণ-ইন্দুকিরণে।"

ইহাতে বুঝাযায় মালতী দেবী দ্বিজেন্দ্রের কিরূপ স্নেহ ও শ্রদ্ধার অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

৭ পৃঃ।

৪৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

বাল্য-জীবন

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মস্থান কৃষ্ণনগর এবং সেই নদীয়া-রাজের রাজ-ধানীতেই দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বালককাল অতিবাহিত হয়। দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন।*

"আমাদের সেই নগরপ্রান্তস্থিত উদ্যান অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আভায় গাছের পাতা রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছে বসিয়া কলরব করিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে, একটী ক্ষুদ্র বালক কখন বা ফুল তুলিতে ছুলিয়া ছুলিয়া দৌড়িতেছে, কখন বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। বাগানী কাজ করিতেছে। সম্মুখে গৃহস্বামী দণ্ডায়মান, সেই দেবমূর্ত্তির কনক-রশ্মিতে উদ্যানের শোভা যেন আরও ফুটিয়াছে। এই ক্ষুদ্র বালক দ্বিজেন্দ্র। "গৃহস্বামী" তাঁহার পিতা। * * বালক দ্বিজেন্দ্র এই উদ্যানে সৌন্দর্য্যের মধুপান করিত।

"অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রের পিতৃদেব সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। * * তিনি যখন তাঁহার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে তানপুরা হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে গান করিতেন, তখন তাঁহার মধুর গীতি-কণ্ঠ প্রশস্ত কক্ষ ভরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গগনমার্গে সমুত্থিত হইত। * * * ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গীত-

---

* নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২০।

প্রিয় হৃদয় সেই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিত। বালক গৃহমুক্ত প্রাঙ্গণে আসিল। সেখানে ঝাউ-বৃক্ষশ্রেণী শোঁ শোঁ করিয়া এক গূঢ়ার্থক মৃদুগীতি গাহিতেছে, আর পাপিয়া সুখ-কম্পিত স্বরে গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নিনাদিত করিতেছে। * * * দ্বিজেন্দ্রের বাল্যকালে প্রতি রাত্রিই এই রূপ মধুর সঙ্গীত-বাদনে এই উদ্যানে যেন স্বর্গ অবতরণ করিত।"

দ্বিজেন্দ্রের জীবনের এই অধ্যায়টীর স্মৃতি তদীয় বাল্য-বন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (ছোট আদালতের জজ) মহাশয় একটী সুন্দর কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংরাজি ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে দ্বিজেন্দ্র যখন কলিকাতা হইতে বাঁকুড়ায় বদলি হয়েন, সেই সময়ে বঙ্কিম বাবু ঐ কবিতাটীতে দ্বিজেন্দ্রকে বিদায়সম্ভাষণ করেন। কবিতাটীর পাদটীকায় লিখিত আছে—"কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৫।৬ বৎসর বয়স কালে স্বীয় পিতৃদেব দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বন্ধু রায় দীনবন্ধু মিত্রকে তদীয় "এমন সুন্দর" (শিশু কার ছেলে হায় রে!) কবিতা আবৃত্তি করিয়া মোহিত করিতেন। তখন দীনবন্ধু বাবু খড়িয়ার (জলাঙ্গীর) তীরে ষষ্ঠীতলার বাটীতে থাকিতেন। বলা যাইতে পারে তৎকালে দীনবন্ধুর মধুর হাসি ও দেওয়ানজীর পবিত্র গান কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়ার ন্যায় আর একটী বিশেষত্ব ছিল।" সেই কবিতাটীতে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন—

"স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়ে সুন্দর সৈকত তীরে,
পবিত্র আশ্রম দেখ ধৌত জলাঙ্গীর নীরে;
ও আশ্রমে আনন্দের মহর্ষি আসীন সুখে
হরষ লহর সুধা উঠিছে ছুটিছে মুখে;
আর তাঁর পাশে সেই সুন্দর শিশুটী তুমি;
শৈশবের সে শোভায় উজলিয়া পুণ্য ভূমি,

সুন্দর শিশুটী তুমি গাহিছ তুলিয়া তান—
"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে"—সেই গান,
আহা যেন বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে ছেয়ে
মধুময় রামায়ণ শিশুকণ্ঠে উঠে গেয়ে,
আশ্রম-বালক মোরা শুনিতাম প্রীতিভরে
পিতার মধুর গাথা তোমার মধুর স্বরে,
সে অধ্যায় সুধাময় জীবনের সূচনায়
শৈশবের সে সৌহার্দ্দ জীবনে কি ভোলা যায়।"

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি।—ত্রিবেণী)

এই কবিতার উত্তরে দ্বিজেন্দ্র ঘটিকা কালের মধ্যে যে কবিতা রচনা করেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন—

"ঠিক্ মনে নাই বটে সেই হাসি সেই গান,
দীনবন্ধু কার্ত্তিকেয়, দুই বন্ধু এক প্রাণ,
সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি,
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি।"

কৃষ্ণনগরের সেই রমণীয় উদ্যানে প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রের হৃদয়ে বালককালেই সৌন্দর্য্যবোধের ও কবিত্বের উন্মেষ হইয়াছিল এবং পিতার মধুর কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সঙ্গীতানুরাগ জাগরিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রের বয়স যখন চারি পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন একদিন কার্ত্তিকেয় বাবু হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া "ক্যায়সে কাট্‌টে পেয়ালা মেয় নাগরী" খেয়ালটী গায়িতেছিলেন। দ্বিজেন্দ্র নিকটে শুইয়া একাগ্রমনে যন্ত্রের উপর পিতার হস্তচালনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। গানটী শেষ হইলে রায়

মহাশয় একবার বাহিরে যান। তৎকালে হার্মোনিয়ম দুর্মূল্য ছিল বলিয়া তিনি যন্ত্রটী যত্ন করিয়া রাখিতেন, কাহাকেও হাত দিতে দিতেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন দ্বিজেন্দ্র যন্ত্রটীকে হাতে পাইয়া চাবিগুলি টিপিয়া, তিনি যে গানটী গায়িতেছিলেন তাহারই সুর বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রকে গানটী বাজাইতে অনুমতি দিলেন এবং দ্বিজেন্দ্র সেই সুরের অনুকরণে কোনরকমে গানটী বাজাইয়া দিয়া পিতাকে প্রীত ও চমৎকৃত করিলেন।

দ্বিজেন্দ্র তাঁহার "আর্য্যগাথা" (প্রথম ভাগ) পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন "শৈশব হইতেই গীতি-রচনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেহ প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গীতি রচনা করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম। সে সব গীত তখন কোন শাস্ত্রতঃ সুরে গীত হইত না। যখন যে সুরে ভাল লাগিত তখন সেই সুরেই গাইতাম।" মাতৃভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র বালককালেই মহাকবি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ দে, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ কৌতূহলী হইয়া দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহাকে কবিতা পাঠে উৎসাহিত করিতেন। কবিতা পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মনে কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে—তিনি গীতি কবিতা রচনা করিতে এবং স্বরচিত গীতি গায়িতে আরম্ভ করেন।

দ্বিজেন্দ্র বালককালে অতি দ্রুত ভাবে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। একদিন জ্ঞানেন্দ্র বাবু দ্বিজেন্দ্রকে বলেন "দ্বিজু, নক্ষত্রের বিষয়ে একটী সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়া আমাকে শুনাও।" তৎকালে দ্বিজেন্দ্রের বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। সেখানে লিখিবার উপকরণ ছিল না।

দ্বিজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী মনে মনে রচনা করিয়া, মধুর স্বরে, করুণ সুরে গায়িয়া শুনাইয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

"গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভ শোভিয়া,
তপন নির্ব্বাণ হলে, ভাসায়ে গগন তলে,
নিশীথ আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদরে আঁধারে বসি কেন নিরজনে আসি
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
আঁধারে ও শোভারাশি সথে বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়নোপরে বিন্দু বিন্দু অশ্রুঝরে
অবারিত চখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া।"

সঙ্গীত শিক্ষা ও গীতি রচনা ব্যতীত অপরাপর বিষয়েও দ্বিজেন্দ্র বালককালেই তাহার ভবিষ্যৎ প্রতিভার আভাষ দিয়াছিলেন। সাত আট বৎসর বয়ঃক্রমের সময় একদিন বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া একটী অনুচ্চ প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বাটীর ভৃত্যগণ তাঁহার শ্রোতা হয়। সেদিন ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতার অতিথি ছিলেন। তিন কার্ত্তিকেয় বাবুর সঙ্গে অলক্ষিতে দ্বিজেন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবিষ্যদ্বাণী করেন—"এ ছেলে এক দিন বড় লোক হইবে।"

দ্বিজেন্দ্র যখন ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন এক দিন তাঁহার পুস্তক ছিল না বলিয়া পাঠ অভ্যাস হয় নাই। শিক্ষক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহাদের পাঠ অভ্যাস হয় নাই তাহাদের সর্ব্বশেষে

দাঁড়াইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে বলিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্লাসে দাঁড়াইয়া সাধ্যমত অভ্যাস করিয়া একে একে শিক্ষককে পাঠ দিল। সকলের আবৃত্তি শেষ হইলে শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার ত বই নাই, তুমি আর কি করিবে?" দ্বিজেন্দ্র বলিলেন, "আমার পড়া হইয়াছে" এবং সুন্দরভাবে পাঠ আবৃত্তি করিলেন। শিক্ষক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিয়া পড়া করিলে?" দ্বিজেন্দ্র উত্তর দিলেন "সকলের বলা শুনিয়া।" শিক্ষক মহা প্রীত হইয়া বালকের সেই অসাধারণ স্মরণ শক্তির কথা কার্ত্তিকেয় বাবুর নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আপনার পুত্রের অসাধারণ ক্ষমতা। সেই দিনই দ্বিজেন্দ্র নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন।

আর এক দিন দ্বিজেন্দ্র কেবল খেলা করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, পাঠে মন দেন নাই। তাহা দেখিয়া তাঁহার তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন "দ্বিজু, তুমি আমার নিকট বসিয়া এতখানি ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া আমাকে বলিবে।" জ্ঞানেন্দ্র বাবু ভাবিয়াছিলেন সেই পাঠ অভ্যাস করিতে দ্বিজেন্দ্রের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা লাগিবে। ১০।১৫ মিনিট পরেই তিনি দেখিলেন বালক পুস্তক রাখিয়া দিয়া বসিয়া আছে। জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলিলেন "ছি! দ্বিজু পাঠটী প্রস্তুত করিতেছ না?" দ্বিজেন্দ্র বলিলেন "হইয়াছে।" জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলিলেন, "অসম্ভব! তুমি ভুল বলিতেছ, তোমার কণ্ঠস্থ হয় নাই।" দ্বিজেন্দ্র বলিলেন, "আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে।" জ্ঞানেন্দ্র বাবু ইতিহাস ধরিলেন, দ্বিজেন্দ্র যেন পাঠ করিতেছেন এইরূপ কণ্ঠস্থ বলিলেন।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বারদোলের সময় মহা সমারোহ হইত। এক বৎসর দ্বিজেন্দ্র তাঁহার পঞ্চম অগ্রজের সহিত কৃষ্ণনগরের রাজ বাটীতে বারদোলের উৎসব দেখিতে যান। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার উক্ত

ভ্রাতা রঘুবংশ ও ভট্টি কাব্যের শ্লোক আবৃত্তি করিতে ছিলেন, তিনি তৎকালে কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। দ্বিজেন্দ্র তখন স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র, রঘু ভট্টির ধার ধারেন না, অথচ একটা কিছু আবৃত্তি না করিলে ভাল দেখায় না, ভাবিয়া ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রাসভারি লোক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র তাঁহাকে বালককালে এত ভয় করিতেন যে কোনও দ্রব্যের অভাব তাঁহাকে সহজে জ্ঞাপন করিতে চাহিতেন না। একবার জুতার অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াও দ্বিজেন্দ্র পিতৃসমীপে বলিতে সাহস পান নাই। পরে সহোদরদিগের পরামর্শে পিতার নিকট গিয়া ইংরাজিতে বলেন "Father I have no shoes"। ইংরাজিতে বলার কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজিতে বলিলে পিতা সন্তুষ্ট হইবেন।

দ্বিজেন্দ্র বালককালে অধিক কথা কহিতেন না, শৈশব হইতেই তিনি যেন সাধারণ বিষয়ে উদাসীন, কত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র যে বাটীতে থাকিতেন উহা নগরের প্রান্তভাগে লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী ছিল। তাহার পুত্রগণ বালককালে বাটীর বাহির হইতেন না— উদ্যানের গণ্ডীর অতিক্রম করিতেন না। দ্বিজেন্দ্রের বয়স যখন ৭ বৎসর এবং তাঁহার ভগ্নী মালতী দেবীর বয়স ৪ বৎসর তখন একদিন উভয়ে কাহা-কেও না বলিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। জনাকীর্ণ নগরে উপস্থিত হইলে তাঁহারা বাটীতে ফিরিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু পথভ্রান্ত হইয়া রাজপথে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। পথে সুন্দর বালক ও বালিকা দুইটীকে দেখিয়া লোক জমিয়া গেল। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "তোমরা কে? কোথায় যাইবে?" দ্বিজেন্দ্রের মনে বিশ্বাস ছিল তিনি নিজে পথ খুঁজিয়া যাইতে

পারিবেন এবং মালতীরও "ছোট দাদার" নেতৃত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সেই কারণেই হউক বা পথ হারাইয়া গিয়াছি বলিতে বালকের অভিমানে আঘাত লাগিবে বলিয়াই হউক, দ্বিজেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে নিজেই পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে দেওয়ানজীর পুত্র চিনিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বাটীতে পৌছিয়া দিয়া যায়। দ্বিজেন্দ্র বালককাল হইতেই আত্মনির্ভর।

দ্বিজেন্দ্র বালককালে গুরুজনের কথার বড় বাধ্য ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের দেশহিতকরকার্য্যের আলোচনা করিবার জন্য তৎকালে একটী সভা হইত। ছাত্রদের সভায় তাঁহাদের অভিভাবকেরাও উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের উৎসাহে যোগদান করিতেন। একবার ঐ সভায় একটী অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রের হাত হইতে একটী জামদান (বর্ত্তিকাধার) পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে দ্বিজেন্দ্রের এক অগ্রজ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে সে কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া দেন। তাহাতে দ্বিজেন্দ্রের মনে এরূপ কষ্ট হয় যে তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। কিন্তু কোনও আত্মীয় গুরুজন সেই ক্রন্দনের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি অগ্রজের নিষেধ বাক্য স্মরণ করিয়া কিছুতেই সে প্রশ্নের উত্তর দেন নাই—শেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। বহুবৎসর সেই রোদন-রহস্য রহস্যই থাকিয়া যায়। সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী এই কথা "সন্দেশ" (ভাদ্র, ১৩২০) পত্রে লিখিয়াছেন।

বালককালে দ্বিজেন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। কয়েকবার তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। দ্বিজেন্দ্রের বয়স যখন ছয় মাস মাত্র, তখন পড়িয়া গিয়া তিনি এরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন যে, সে যাত্রা কষ্টে জীবন রক্ষা হইল বটে কিন্তু তাঁহার মুখ বাঁকিয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় বলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দ্বিজেন্দ্রের মুখের সে বক্রভাব একটু

লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। আর একবার ৯।১০ বৎসর বয়সের সময় তিনি ঢেঁকি হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু "নব্যভারত" (শ্রাবণ, ১৩২০) পত্রে লিখিয়াছেন—

"যে ম্যালেরিয়া জ্বরে কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ অংশ ক্রমে উৎসন্ন হইতেছে, সেই ম্যালেরিয়া রোগে দ্বিজেন্দ্রলালকে ও তাঁহার ভগ্নী মালতীদেবীকে আক্রমণ করে।" তখন দ্বিজেন্দ্রের বয়স পাঁচ বৎসর। "অনেক চিকিৎসা হইল। কিছুতেই কোনও ফল হইল না। ক্রমে উভয়ের দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইল। উদর ব্যাপিয়া প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হইল। তখন শান্তিপুর স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। শান্তিপুরে দ্বিজেন্দ্রের মাতুলালয়। দ্বিজেন্দ্রের মাতৃদেবী পীড়িত পুত্র ও কন্যাকে লইয়া শান্তিপুর অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বিজেন্দ্রের পিতৃদেব তদীয় আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"১২৭৫ অব্দের শ্রাবণ মাসে জল বায়ু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত আমার স্ত্রী, তনয় তনয়ার সহিত শান্তিপুরের এক দ্বিতল বাটীতে অবস্থিত হন। ২৯, ৩০ ও ৩১শে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে। ৩২ শে রাত্রিতে এতাধিক বারিবর্ষণ হইতে লাগিল যে রাত্রি দুই প্রহরের পর ছাদের এক স্থান দিয়া হুহু করিয়া সজোরে জল পড়িতে আরম্ভ হইল। আমার গৃহিণী ভয় পাইয়া সকলকে জাগ্রত করিলেন এবং কিরূপে এ দায় হইতে নিস্তার পান তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পার্শ্বস্থ এক কক্ষ পতিত হইল। আমার স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর এক ভ্রাতা, এক ভ্রাতুষ্পুত্র, এক ভ্রাতৃকন্যা এবং দাসী সকলেই ব্যস্ত হইয়া নিম্নতলায় আসিলেন। রজনী তখন তৃতীয় প্রহরেরও অধিক। সকলেই স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। কেবল দাস একজন পরিণত বয়স্ক ছিল, কিন্তু নির্ব্বোধ। যেমন নিবিড় অন্ধকার

তেমনি মুসলধারে বৃষ্টি, প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ। বহির্গত না হইলে তখনি প্রাণ যায় অথচ কোথায় যায় তাহা কেহ কিছু স্থির করিতে পারেন না। সুতরাং সকলেই অস্থিরচিত্ত হইলেন। শেষে নিকটস্থ ডাকঘর মনে পড়িল এবং তথায় যেমন উপস্থিত হইলেন অমনি বাসাবাটীর পতনশব্দ শুনিতে পাইলেন। আর পাঁচ মিনিট বাটীতে থাকিলে সকলের জীবনাবসান হইত। * * * আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতি। তিনি সংসামান্য কারণে বিপদাশঙ্কা করেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্বভাব ছিল বলিয়াই এই শঙ্কট হইতে সকলে রক্ষা পাইলেন। উৎকট বারিবর্ষণে ভীতা হইয়া জাগ্রত না থাকিলে এবং এত উতলা না হইলে নিশ্চয় বিপদ্ ঘটিত।"

সেই দুর্যোগের রাত্রে ডাকঘরের বারাণ্ডায় রক্ষিত একখানি পাল্কীর মধ্যে একটী ভৃত্যের ক্রোড়ে বসিয়া দ্বিজেন্দ্র সে রাত্রি অতিবাহিত করেন। প্রাতে দেখা গেল সেই পাল্কীর মধ্যে এক বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প এক কোণে লুকাইয়া আছে। এইরূপে এক রাত্রির মধ্যে দ্বিজেন্দ্র দুইটী আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার হয়েন। এই দ্বিবিধ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলেও কিন্তু দুরন্ত ম্যালেরিয়া দ্বিজেন্দ্রকে ছাড়িল না। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই সমভাবে ভুগিতে লাগিলেন—দ্বিজেন্দ্রের নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল, মুখে ক্ষত হইল। চিকিৎসক (ডাক্তার কালীবাবু) বলিলেন "আর জীবনের আশা নাই।" তখন আহারের ধরা বাঁধা রহিল না। উগ্র ঔষধ খাইয়া নাড়ী জ্বলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাঁহাদের অবাধে দধি খাইতে দেওয়া হইল। তাঁহারা দধি পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। যে রোগ কিছুতেই ছাড়ে নাই দধির গুণে তাহা পলায়ন করিল। সে যাত্রা দ্বিজেন্দ্র ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইলেন—কিন্তু একেবারে পরিত্রাণ পাইলেন না। কৃষ্ণনগরের জল বায়ুর দোষে মধ্যে মধ্যে তাঁহার

জ্বর হইত। এম্ এ পরীক্ষার সময় তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিলাত হইতে আসিয়াও একবার ঐ পীড়ায় কিছুকাল কষ্ট পান। তাঁহার দাদাশ্বশুর ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়েন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ্যাবস্থা

ম্যালেরিয়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্র কৃষ্ণনগরে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বালককাল হইতেই তাঁহাকে পরিবারবর্গের সকলেই প্রতিভাবান্ বলিয়া মনে করিতেন। যখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইবে সেই সময়ে তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাজেন্দ্রলাল তাঁহাকে মেহেরপুর স্কুলগৃহে বক্তৃতা করিতে বলেন। দ্বিজেন্দ্র সেখানে বাঙ্গালায় দুইটী এবং সংস্কৃত ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়া সেই স্কুলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভূয়সী প্রশংসা করেন। দ্বিজেন্দ্র কৃষ্ণনগরে ফিরিলে তাঁহার ৩য় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বাঙ্গালায় একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। সেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য কৃষ্ণনগরের উকিল, হাকিম ও অন্যান্য অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকিল ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র

সে দিন তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদিগের সভায় তিনিই প্রধান বক্তা হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী বলেন, "এই সময়ে দ্বিজেন্দ্র তাঁহার বালব বন্ধুগণের সহযোগে "চাদর-নিবারিণী সভা" স্থাপন করিয়া যাহাতে চাদ ব্যবহার করা উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করেন। সভায় স্থির হয় এই গরি দেশে চাদর ব্যবহার একটা অনাবশ্যক অপব্যয়। সেই বালক-বৃন্দের সভায় দ্বিজেন্দ্র সতেজে বক্তৃতা দিলেন—সভ্যগণের মধ্যে চাদর গায়ে দেওয়া উঠিয়া গেল। স্কুলের ছেলেরা চাদর ছাড়িল দেখিয়া বৃদ্ধেরা প্রথমে হাসিলেন এবং শেষে অনেকেই দ্বিজেন্দ্রের দলে মিশিয়া "চাদর-নিবারিণী সভা"র সভ্য হইলেন।

১৮৭৮ খ্রীঃ দ্বিজেন্দ্র কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু ঐ স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন। অধ্যাপক রো সাহেব ঐ বৎসর টেষ্ট্ এক্জামিন করেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রের কাগজ পরীক্ষা করিয়া ক্লাসে আসিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন "কোন্ ছাত্রটি দ্বিজেন্দ্র ?" জ্ঞানেন্দ্র বাবু দ্বিজেন্দ্রকে দেখাইয়া দিলে রো সাহেব বলিলেন "দ্বিজেন্দ্র ইংরাজিতে যেরূপ পরীক্ষা দিয়াছে, কোনও ইংরাজ বালক এরূপ পরীক্ষা দিলে তাহার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইত।" ১৮৮০ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দ্বিজেন্দ্র হুগলী কলেজে পড়িতে যান এবং সেই কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্, এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে আসেন।

দ্বিজেন্দ্র যখন কলিকাতায় এম্-এ পড়িতে ছিলেন সেই সময়ে, ১৮৮২ খৃঃ, কলিকাতায় সুবিখ্যাত সরকারী প্রদর্শনী (Calcutta International Exhibition) হয়। কলিকাতার গড়ের মাঠের

কিয়দংশ ঘিরিয়া এবং মিউজিয়মের প্রাসাদটীকে ও তাহার পশ্চিমের পুষ্করিণী ও জমি, চৌরঙ্গী রাস্তার উপর সেতু বাঁধিয়া, ঐ বিরাট্ প্রদর্শনী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিজেন্দ্র একদিন শনিবার কলেজের ছুটির পর কয়েকটী বন্ধুর সহিত ঐ প্রদর্শনী দেখিতে যান। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন জন কতক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা, দাসীদের ও বালক-বালিকাদের সঙ্গে প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। কয়েকজন ফিরিঙ্গী যুবক তাঁহাদের পশ্চাতে লাগিয়াছে ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে। মহিলাগণ তামাসা বুঝিতে পারিতেছেন কিন্তু ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া বেড়াইতেছেন। দ্বিজেন্দ্র সেই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া আত্মদমন করিতে পারিলেন না, ফিরিঙ্গীদের প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ফিরিঙ্গীরাও দ্বিজেন্দ্রকে গালাগালি দিল এবং মারামারি করিতে প্রস্তুত হইল। প্রদর্শনী-গৃহে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে বিপদে পড়িবেন বলিয়া তাঁহার বন্ধুরা দ্বিজেন্দ্রকে কোনরূপে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, ফিরিঙ্গীরা তাঁহাকে শাসাইয়া বাহিরে আসিতে বলিল। দ্বিজেন্দ্র সেই মহিলাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, ফিরিঙ্গীরা দলে পুষ্টতর হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাহারা ৭।৮ জন, দ্বিজেন্দ্র একা—তাঁহার বন্ধুরা মারামারি করিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমেই এক ঘুষিতে দলপতির নাসিকা দিয়া রক্তপাত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে সকলে মিলিয়া দ্বিজেন্দ্রকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দ্বিজেন্দ্র কিন্তু হঠিলেন না, একাই মার খাইতে লাগিলেন ও প্রাণপণে ঘুষিও চালাইতে লাগিলেন। দ্বিজেন্দ্রের অসম সাহসে সাহস পাইয়া বহু সংখ্যক বাঙ্গালী ফিরিঙ্গী যুবকদের আক্রমণ করাতে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন

সমাদর পাইয়া থাকে। সেই দেশপ্রীতিমূলক গীতগুলিতে হেমচন্দ্রের উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতের প্রভাব ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে গুলি অন্ধ অনুকরণ নহে। উত্তর কালে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমের যে মহা সঙ্গীতসমূহে দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীতের অঙ্কুর আর্য্যগাথায় উক্ত সঙ্গীতগুলিতেই উপ্ত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রের কৈশোরক রচনার নমুনাস্বরূপ একটী স্বদেশ-প্রেমাত্মক গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—"আর্য্য!

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল এ একদা দেবলীলা ভূমি— করোনা করোনা তার অপমান।
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান,
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি; করোনা করোনা তার অপমান।
নাই কি চিতোর, নাই দেওয়ার পুণ্য হলদিঘাট আজো বর্ত্তমান!
নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা? করোনা করোনা তার অপমান।
এ অমরাবতী প্রতি পদে যার দলিছ চরণে ভারত সন্তান!
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত করোনা করোনা তার অপমান।
আজো বুদ্ধ আত্মা প্রতাপের ছায়া ভ্রমিছে হেথায় আর্য্য সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায় করোনা করোনা তার অপমান।"

আর্য্যগাথায় দ্বিজেন্দ্রের সাহিত্যিক বিশিষ্টতার আভাষ সুপরিস্ফুট। আর্য্যগাথা তৎকালীন সংবাদ পত্রাদিতে প্রভূত প্রশংসা প্রাপ্ত হয়। "বান্ধব" লিখিয়াছিলেন—"গ্রন্থকার যে কবির হৃদয় লইয়া প্রকৃতির উপাসনা করিতে জানেন ইহার প্রতি গীতেই দৃষ্ট হইবে।" সঞ্জীবনী লিখিয়াছিলেন "উৎকৃষ্ট", Benglee লিখিয়াছিলেন—"Exquisite," Reis and Rayet বলিয়াছিলেন "Real merit." Calcutta Review লিখিয়াছিলেন "He seems to have a heart that is capable of inspiration."

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্র এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালককালের ম্যালেরিয়া তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ করে নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পীড়ায় ভুগিতে ছিলেন। তত্রাচ তিনি সকল পরীক্ষাই সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েন। কিন্তু এম্, এ পরীক্ষার বৎসর জ্বরের প্রকোপ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে কয়েক মাসের জন্য পড়াশুনা একরকম বন্ধ করিয়া তাঁহাকে দেওঘরের নিকট রোহিণী গ্রামে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে হয়। পরীক্ষার দুই কি তিন মাস মাত্র পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তৎকালে তাঁহার ভ্রাতাদের বাসা ২৬ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে ছিল। ঐ বাটীতেই অবস্থান করিয়া তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি, তাঁহার ৩য় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে বলিলেন—তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে যে এত অল্প সময় অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দেওয়ায় তিনি "ফেল" হইবেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু উত্তর দিয়া-ছিলেন—"তুমি ফেল হইবে এ আশঙ্কা আমার নাই। তবে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান পাইবে কি না তাহা আমি বলিতে পারি না।" এম্, এ পরীক্ষাতে দ্বিজেন্দ্র দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছিলেন।

এম্, এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার পরেই দ্বিজেন্দ্র বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ স্কুলে হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা নরেন্দ্র বাবু এই স্থানে থাকিতেন।

দ্বিজেন্দ্র এই সময়ে এবং ইহার পূর্ব্বে "নব্যভারত," "আর্য্যদর্শন" ইত্যাদি মাসিক পত্রে কবিতাদি লিখিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিলাত যাত্রা

রেভেল্‌গঞ্জ স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতে যাওয়ার দুই এক মাস পরে, ১৮৮৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে, কৃষিশিক্ষার্থ ষ্টেট স্কলার্শিপ পাইয়া দ্বিজেন্দ্র ইংলণ্ডে যাইবার জন্য জনক-জননীর নিকট অনুমতি চাহিতে কৃষ্ণনগরে আসিলেন। বিলাত হইতে আসিয়া কোনও কোনও বিষয়ে সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে এই কথা বুঝাইয়া দিয়া দ্বিজেন্দ্রের পিতা তাঁহাকে বলিলেন "আমি তোমার শিক্ষা উন্নতির পথে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তুমি যদি নিজে ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহাতে আমার অমত নাই।" দ্বিজেন্দ্র তাঁহার পিতার মত পাইলেন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে ছাড়িতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। তাঁহার অপর পুত্রেরা তাঁহাকে যখন বুঝাইলেন যে এখানে থাকিলে দ্বিজেন্দ্রের ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া আবার জীবন সংশয় হইতে প'রে কিন্তু বিলাতে তিন বৎসর থাকিলে ঐ রোগ একেবারে সারিয়া যাইবে—আর তিন বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে, তখন অগত্যা তিনি অনুমতি দিলেন; কিন্তু বলিলেন, "বিলাত যাইলে এ জীবনে আবার যে দ্বিজুর সহিত দেখা হইবে, মন যে ত'হা বলিতেছে না। বিদায়ের কথা মনে করিয়া প্রাণ যে কেমন করিতেছে।" তাঁহার দুনয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কিন্তু তিনি অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন না। জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বিদায়-

রাত্রিতে জননী দেবী দ্বিজুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে সমুদায় রাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দ্বিজু শেষ রাত্রিতে অন্তঃপুরে জননীর চরণধূলি মস্তকে লইয়া বিদায় লইলেন। তখন জননী দেবী আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দ্বিজু বাহিরে আসিলেন। সেখানে পিতৃদেব গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বিজুর দ্রব্যাদি বাঁধিয়া দিতেছেন। অন্তঃপুরে জননী কাঁদিতে-ছেন। পিতৃদেব দুঃখে বা শোকে কখন অধীর হইতেন না, কেবল মাত্র সংযত গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন। সেই রজনীতে স্তিমিত দীপালোকে আমরা সকলে দ্বিজুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। দ্বিজুর দ্রব্যাদি বাঁধা হইয়া গেল। দ্বিজেন্দ্র পিতৃদেব-চরণে তাঁহার মস্তক নত করিয়া তাঁহার চরণধূলি লইয়া বিদায় লইলেন। পিতা পুত্র-বিদায়ের সময় একটীও কথা বলিতে পারিলেন না। পিতার বুঝি কেমন মনে হইয়া-ছিল যে, দ্বিজুর সহিত এই শেষ দেখা? তাঁহার এখন একে অধিক বয়স, তাহার উপর তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল।

"আমি সেই শেষ রাত্রির পরিম্লান চন্দ্রের অস্ফুট জ্যোৎস্নায় দ্বিজুকে লইয়া বগুলা ষ্টেসনে যাইবার জন্য শকটে উঠিলাম। কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজু যে জাহাজে যাইবেন তাহাতে কোন বাঙ্গালী যাইতে পারেন কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন "আমি অন্য জাহাজে যাইব।" তাহার পর বিলাতে দ্বিজুর জন্য পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলাম। মান-নীয় রো সাহেব দ্বিজুকে ও আমাকে বেশ জানিতেন। তাঁহার নিকট যাইয়া দ্বিজুর জন্য বিলাতে পরিচয়-পত্র ও উপদেশ লইলাম। তিনি কি বলিয়াছিলেন। তাহা আমার ঠিক মনে নাই। কেবল মনে আছে যে, তিনি বলিলেন, "ইংলণ্ডে বিদেশীর পক্ষে হোটেল ইত্যাদি স্থানে

"harpies" আছে। দ্বিজেন্দ্র তাহাদের হস্তে যাহাতে না পড়েন তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। 'দ্বিজেন্দ্রকে ইংলণ্ডে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমার এক সহোদরকে পত্র দিতেছি,' এই বলিয়া একখানি পত্র দিলেন এবং তাঁহার ভগিনীর কথাও বলিলেন। জাহাজ ছাড়িবার দিবস আমি, ভগিনী মালতী দেবী, অগ্রজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল রায় মহাশয় এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য গঙ্গাতটে যাইলাম। দ্বিজু জাহাজে উঠিল, জাহাজ ছাড়িল। দ্বিজু তীরের দিকে, আমরা জাহাজের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। ক্রমে জাহাজ অদৃশ্য হইল।

"সেই জাহাজে অন্য কোন ভারতবাসী ছিলেন না। নৃত্যগোপাল বাবু অন্য জাহাজে গিয়াছিলেন। * * * সাহেবদিগের সহিত দ্বিজুর ক্রমে আলাপ হইতে লাগিল। সাহেবদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবাসী-দিগকে নিন্দা করিত। দ্বিজু তাহার উচিত উত্তর দিতেন—কঠিন কঠিন উত্তর দিতেন। ইহা জানিয়া এখানে কোন বন্ধু বলিলেন যে জাহাজে দ্বিজেন্দ্র একটী মাত্র ভারতবাসী; সাহেব অনেক, দ্বিজেন্দ্রকে জাহাজ হইতে অনায়াসে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করিলাম, সাহেবরা এরূপ কাপুরুষ জাতি নহে যে সকলে মিলিয়া একজন বিদেশী যাত্রীকে, সাহসী উচিত উত্তর দেওয়ার জন্য, এরূপ খুন করিবে।" * * * বিলাতে অবস্থানকালেও দ্বিজেন্দ্রকে কোন সাহেব কোন অনুচিত কথা বলিলে, দ্বিজেন্দ্র তখনি তাহার মুখের উপরে উচিত উত্তর দিয়া তাহাকে একটু শিক্ষা দিতেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলেন, দ্বিজেন্দ্র "একদিন রিজেণ্ট পার্কের (Regent park) ভিতর দিয়া আসিতে-ছেন, এমন সময় দেখিলেন, একজন পাদরী মহা চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, চারিদিকে লোক ঘিরিয়া আছে। দ্বিজু তাঁহার বক্তৃতা

শুনিতে উৎসুক হইয়া সেখানে গেলেন, অমনি ধর্ম্মপ্রচারক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "And you, the Devil is staring you in the face" "সয়তান তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।" দ্বিজু তাহাতে আরও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "yes, you are" "হাঁ, তুমি তাকাইয়া আছ বটে।" ইহাতে হাসির গড়রা পড়িয়া গেল।" * * *

"দ্বিজু যখন সমুদ্রে, তখন একখানি ইংলণ্ডযাত্রী পোত ডুবিয়া যায়, সংবাদ আইসে। তাহার পরই কিছুকাল দ্বিজুর সংবাদ পাওয়া গেল না। জননী দেবীর নিকট একথা আমরা প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু আমরা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। পিতৃদেব বড়ই চিন্তিত হইলেন। জীবনের প্রান্তভাগে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজুকে বিলাতে যাইবার অনুমতি দিতে তাঁহার যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের ভিতর ঢাকা ছিল। এখন তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। যাহা হউক, কয়েক দিবস পরে ভগবানের কৃপায় দ্বিজুর নিকট হইতে পত্র পাওয়া গেল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

---:•:---

বিলাতের পত্র

এই সময়ে জ্ঞানেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার অনুজ হরেন্দ্র বাবু 'পতাকা' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। বিলাতযাত্রাকালে এবং বিলাতে পৌঁছিয়া বৎসরৈককাল দ্বিজেন্দ্রলাল সেই 'পতাকা''য় ছাপাইবার জন্য নিয়ম মত "বিলাতের পত্র" লিখিয়াছিলেন। ১২৯১ ও ১২৯২ সালের 'পতাকা'য় দ্বিজেন্দ্রের বিলাতের পত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রাবলীতে দ্বিজেন্দ্রের পর্য্যবেক্ষণশক্তি, ভাবপ্রবণতা গুণ-গ্রাহিতা, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতার অভ্রান্ত আভাষ পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া সমুদ্রযাত্রাকালে, রোম, ভেনিস, কার্থেজ, আথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিকথা স্মরণে তাঁহার মনে যে ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল. বিলাতে অবস্থানকালে জগতের বাণীভক্তগণের পুণ্যতীর্থ সেক্সপীয়রের জন্মস্থান Statford-on-Avon দর্শনে তাঁহার হৃদয় কিরূপভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এই পত্রসমূহে আমরা তাহার পরিচয় পাই। তদ্ভিন্ন এই সকল পত্রে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের তুলনায় সমালোচনায় এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার, আহার পরিচ্ছদ, প্রকৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র তাঁহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরকালে দ্বিজেন্দ্রের কোনও কোনও বিষয়ে মতের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিলেও, তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের এবং বাঙ্গালা গদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ এস্থলে কয়েকটী পত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

পতাকা—২রা কার্ত্তিক, ১২৯১—

"এদেশের (সিংহলদ্বীপের) ছোট লোক বড় প্রতারক। একজন জাহাজে আসিয়া তাহার কথিত একটি মুক্তার দাম একশত টাকা বলিল। আমাদের জাহাজের একটি সাহেব বলিলেন যে এক টাকা হইলে তিনি সেটা লইতে পারেন। তাহাতে বিক্রেতা অনেকক্ষণ পরে দুই টাকাতে নামিল। সাহেব আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "These are worse than the Calcutta shop-keepers. They (Calcutta shop-keepers) come down only from Rs 50 to 3 and not from Rs. 100 to 2" আমি তাহার উত্তর দিলাম, "But they are letter than the English shop—keepers, for they would ask for Rs. 100 and would stick to it, though if the real price were Rs. 2." তাহাতে বোধ হইল যে সাহেবেরা খুব আমোদ উপভোগ করিলেন না। কারণ তাঁহারা কেহই আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।"

*   *   *   *

"ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে তর্ক হইতে হইতে একজন সাহেব বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করি, ইংরাজেরা ভারত হইতে চলিয়া যায় আর অন্য জাতি আসিয়া বাঙ্গালীকে ছিন্নভিন্ন করে; তাহারা যেরূপ ইংরেজবিদ্বেষী সেইরূপ ফল পায়।" আমি বলিলাম "আমিও দেখিতে ইচ্ছা করি ইংরাজেরা ভারত হইতে চলিয়া যাইলে বিলাত-নিষ্কাশিত ভারত-প্রবাসী সাহেবেরা কিরূপ অনাহারে মরে।" এটি তাঁহার শ্রুতিসুখকর না

হওয়াতে তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। আমি তাঁহারই জন্য ইহা বলিয়াছিলাম।"

* * * *

"সমুদ্রে চাঁদের উদয় দর্শনীয়, একদিন রাত্রে সহযাত্রিগণ সব আমোদ-পূর্ণ গল্পে সময় কাটাইতেছিলেন, তাহাতে যোগ দিবার প্রবৃত্তি না থাকায় আমি জাহাজের পিছনে গিয়া বসিলাম। তখন চাঁদ উঠিতেছে, সমুদ্রের কিনারায় লহরীময়ী নীলিমা-প্রান্তে, স্নিগ্ধ-লোহিত-গরিমায়, প্রশান্তভাবে, চাঁদখানি দেখা দিল। মধুর স্নিগ্ধ-জ্যোতি, প্রেমময় চন্দ্রমার উদয়ে সমুদ্রের শান্তহৃদয় মৃদুল সমীরসন্তাড়নে দোলাইত হইতে লাগিল। প্রেমিকের মধুর আগমনে, প্রণয়ীর মধুরতর সম্ভাষণ চুম্বনে, স্নিগ্ধ চঞ্চল হৃদয়ে, প্রেমপূর্ণ অন্তরে, চুম্বনের প্রতিদান করিল। এ চুম্বন কি সুন্দর, অপ্সরা-কণ্ঠ-গীতিবৎ 'ইয়োলীয়' বীণা-ঝঙ্কারবৎ স্নিগ্ধ-শান্ত সুন্দর মধুর। সুন্দর জিনিষ সুন্দর; কিন্তু সুন্দর জিনিষের সম্মিলন শতগুণ মধুর। পূর্ণ-বিকশিত, প্রভাতসমীর-সেবিত গোলাপ লাবণ্যময়, পবিত্র নীহারও রমণীয়। কিন্তু উভয়ের সমাগম কি শতগুণ মধুর নহে! চন্দ্রমা বড় সুন্দর; সমুদ্রও অতি মনোহর। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন না হইলে যেন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না, মাধুর্য্যের সফলতা হয় না। সম্মিলনের জন্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এ জগৎ সৌন্দর্য্যের বিবাহ স্থান, লাবণ্যের মঙ্গল-মন্দির। লাবণ্যের সমাগম প্রকৃতির অভিপ্রায়। নয়?"

* * *

'পতাকা—৯ই কার্ত্তিক, ১২৯১—

"একদিন এক সাহেব বলিলেন "এস গান গাওয়া যাক," পরে মিলিত চীৎকারে, উর্দ্ধমুখে মুদ্রিত নেত্রে মস্তক আন্দোলনের সহিত, করতালির সহযোগে "Three blind mice" নামক একটা অর্থশূন্য গান গায়িতে

লাগিলেন। * * * পরে বাঙ্গালা গান শুনিবার তাঁহাদের হঠাৎ ইচ্ছা হওয়াতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "আমি গাহিতে জানি, কিন্তু গাহিব না; আপনারা বাঙ্গালা গান বোঝেন না, কেবল হাসিবেন। আমি আমার গান আপনাদের হাস্যের বিষয় করিতে চাহি না।" আর কেহ আমাকে অনুরোধ করিতেন না।"

* * * *

পতাকা—২৩ সে কার্ত্তিক, ১২৯১—

"সুয়েজে আমি নামি নাই, আমার একজন সহযোগী গিয়াছিলেন এবং নমুনাস্বরূপ কতকগুলি সুয়েজকলঙ্ক ফটোগ্রাফ্ আনিয়াছিলেন। মানুষের চরিত্র মলিনতার বিভীষিকাময় চিত্র। * * * আমি যেন কোথায় পড়িয়াছি বোধ হয়, যে তিনটীতে মানুষের প্রকৃতি জানা যায়; প্রথম পুস্তক, দ্বিতীয় সঙ্গী, তৃতীয় ছবি। মানুষ কি বই পড়ে, কাহার সঙ্গে বেড়ায় ও কি ছবি ঘরে রাখে দেখিয়া সে কি প্রকার মানুষ তাহা জানা যায়। যদি ছবি দেখিয়া জাতি ঠিক করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে সুয়েজবাসী অধঃপাতিত, অপবিত্রতার সীমান্ত গত।"

পতাকা—১৯শে মাঘ ১২৯১—

"এক দিন বঙ্গদেশে একজন সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীদের যে রং কাল তাহার কারণ তাহারা হলুদ খায়। ইহার খুব গূঢ় কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ইংরাজদিগের অর্দ্ধসিদ্ধ আস্বাদহীন মাংস অপেক্ষা আমাদের হলুদবিমিশ্রিত তরকারী অধিক উপাদেয়। অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস ভক্ষণ পশুদিগের ভক্ষণপ্রণালীর এক ধাপ উঁচু মাত্র। পশুরা (অবশ্য মাংসভোজী পশুরা) অপক্ক মাংস ভক্ষণ করে। অসভ্য মানুষ অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস খায় এবং পূর্ণ সভ্য মানুষ সুপক্ক মাংস খাইয়া থাকে। ইংরাজ-

বাঙ্গালীর খাদ্য।

দিগের এই অৰ্দ্ধসিদ্ধ মাংস ভক্ষণ আমি তাহাদিগের ভূতপূর্ব্ব বর্ব্বরতার পরিশিষ্ট (remnant) মনে করি। বাঙ্গালীর এই প্রকার সুপক্ক ব্যঞ্জনাদি আহার তাহাদিগের ভূতপূর্ব্ব সভ্যতার অকাট্য প্রমাণ।

"তথাপি আমি বাঙ্গালীদিগের আহারপ্রথার কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে চাই। তাহারা মাংস যথেষ্ট পরিমাণে খায় না। তাহারা ব্যঞ্জনাদি উদ্ভিদই অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। মানুষের কেবল যে ফলমূলাশী হওয়া প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে তাহা তাহার দন্তের গঠন দেখিলেই প্রতীত হইবে। তাহাদের যেমন ফলমূলাদি খাইবার দন্তও আছে, তেমনি তাহাদের কুকুরের ন্যায় মাংস-চর্ব্বী (canine teeth) দন্তও আছে। তাহার জন্য মানুষকে ফল-মূল-মাংসাশী অথবা সর্ব্বভুক জীব বলিয়া কার্লাইল নির্দ্দেশ করিয়াছেন (man is an omnivorous biped that wears breeches) এ কথার শেষ অংশ সত্য না হইলেও ইহার প্রথম অংশ বড়ই সত্য। * *

"এখানে হয়ত কেহ বলিবেন যে বঙ্গদেশের জলবায়ু বিলাত হইতে স্বতন্ত্র। বিলাতে মাংস ভক্ষণ পোষায়, তাহা না হইলে, ইংরাজ শীতে বাঁচিবে কেন? কথাটা কতক সত্য। এখানে শীতের প্রাবল্যের জন্য অধিক মাংস আহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন স্থানে কোন জাতি বিনা মাংস আহারে থাকিবে ইহা অন্ততঃ প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়। বাঙ্গালী যথার্থতঃ মোটেই মাংস খায় না। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাত্রে ডিনারে মাংস খাইলে শারীরিক আবস্থার উন্নতি বই অবনতি হইবে না, ইহা নিশ্চয়। অবশ্য মাংস খাইতে হইলে ব্যঞ্জন হইতে অল্পতর পরিমাণে খাইতে হইবে। আমাদিগের জাতীয় লোকদিগের প্রলম্বিত তরঙ্গায়িত উদরের কারণ এই অধিক পরিমাণে ব্যঞ্জন ভক্ষণ। শাকভোজী পশু ও মাংসভোজী পশুর

শরীর গঠনের তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে। হস্তীর, গরুর, ছাগের সহিত সিংহের, ব্যাঘ্রের, কুক্কুরের অবয়ব তুলনা কর। শেষোক্ত জন্তুগণের কেমন সুন্দর পেশীময় অবয়ব, পূর্ব্বোক্ত জন্তুদিগের কিরূপ ভারময় বলহীন দেহ। অবশ্য হস্তী অতিশয় বলবান্ জন্তু। কিন্তু কতখানি শরীরে সে বল ব্যাপ্ত দেখিতে হইবে। হস্তী সিংহের মত ক্ষুদ্র জন্তু হইলে তাহার বল কতটুকু হইত ?

"এখানে মসৃণ মস্ত লম্বোদর প্রবীণ কেহ হয়ত বলিবেন যে, আমরা মাংস না খাইয়াই এত দিন বাঁচিয়া রহিয়াছি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাও মাংস খাইতেন না। আমি তাঁহাদিগকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কখন মাংসভুক্ ইংরাজের দ্বারা পদাহত হইয়াছেন কি না? আরও জিজ্ঞাসা করি সদা সর্ব্বদা * * ভয়ে ভীত থাকিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়ঃ কি না?"

পতাকা, ১৯শে পৌষ, ১২৯১। (সাইরেন সেষ্টর—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৪)

বাঙ্গালীর সন্তোষ

"আমার বিশ্বাস যে যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাসগৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, তত দিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। পরিচ্ছন্নতা, ও অন্ততঃ আয়সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবন ধারণ করা আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। * * * আমাদিগের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় আমাদের কৃষকেরা কি গরিব দুরবস্থাপন্ন। যে দিন যাহা পায় প্রায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করে, সঞ্চিত অর্থ নাই; আরামময় বাসস্থান নাই; তৃণাবৃত কুটীরে শতধাছিন্ন শয্যায়, শতগ্রন্থিময় বসনে, বহু সন্তানের পিতা, কৃষক দীনভাবে কোন প্রকারে জীবন যাপন করে। দুর্ভিক্ষকালে তাহারা (হতভাগ্য কৃষক!) সপুত্র-পরিবারে অনশনে প্রাণত্যাগ

করে। ইহার কারণ কি? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে সন্তোষই ইহার মূল। তাহার অবস্থা উত্তম হইতে উত্তমতর হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণা হয় না। পূর্ব্বপুরুষ-ব্যবহৃত ভূকর্ষী ব্যবহার না করিয়া নূতন প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিলে যে ভূমি দ্বিগুণ ফলবতী হইতে পারে ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস হয় না। গরিব থাকিলেই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নবপ্রথার উপকারিতায় অবিশ্বাসী, দুর্ভিক্ষ হইলে তাহারা বিধি নির্ব্বন্ধের দোষ দেয়, নিজ ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় ও স্বীয় ললাটে করাঘাত করে। আমি বলি তাহাদিগের মনে সম্ভোগবাসনা দাও, উন্নতির সোপান রচিত হইবে।

"আমি যেন শুনিতেছি পৃথিবীর ঘটনানভিজ্ঞ ভাবসর্ব্বস্ব (sentimental) কেহ এখানে হয় ত কবিত্বময়ী ভাষায় বলিতেছেন—"বিলাসের চিন্তা দূরে রাখ, সম্ভোগবাসনা শত যোজন অন্তরে চিরদিন অবস্থান করুক, এই সন্তোষই কৃষকদিগের জীবন, ইহাই তাহাদিগের সুখ সম্পদ, ইহাই তাহাদিগের দুর্ভাগ্যে, ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার জননী। বিলাস তাহাদিগের মধ্যে আনিও না। ইহা তাহাদিগের জীবনকে দুঃখময় করিবে, পারিবারিক সুখে কালিমা নিক্ষেপ করিবে, ইহা মধু না আনিয়া তাহাদের জীবনে অসন্তোষের হলাহল ঢালিয়া দিবে।

"ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে,—কবিত্বময়ী ভাষা আমি খুব ভালবাসি, শুনিলে হৃদয় নাচিয়া উঠে, কিন্তু ভাষা ন্যায় (logic) নহে, অলঙ্কার যুক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ আমি জানি, বিলাস মনুষ্যের বা জাতির পতনের মূল। * * * কিন্তু সম্ভোগবাসনা বিলাস নহে। বাসনা কার্য্যময়, বিলাস অকর্ম্মণ্য, বাসনা অসন্তোষ, বিলাস সন্তোষময়। আমি আরও বলিতে চাই, অসন্তোষ উন্নতির মূল। ইহা কার্য্যকে উত্তেজিত করে, সভ্যতাপথ প্রশস্ত করে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক,

কি পারিবারিক উন্নতি সকলের মূলেই এই অসন্তোষ। বক্তা সুরেন্দ্র বাবু যথার্থ লিখিয়াছেন "Our nation have yet to learn the great art of grumbling." অসন্তোষই সভ্যতার মূল। * * * আমাদের জাতির প্রধান শিক্ষার বিষয় এই অসন্তোষ।"

পতাকা, ২৬শে পৌষ, ১২৯১।

"এখানে কেহ বলিতে পারেন যে যদি অসন্তোষই উন্নতির মূল হইল, অসন্তোষই পারিবারিক শৃঙ্খলার কারণ হইল, আর সেই অসন্তোষই ভবিষ্যতের উন্নতির সোপান হইয়া জীবনের সঙ্গী হইল, তাহা হইলে সুখ কোথায় রহিল? অসন্তোষ ও সুখ কিরূপে একত্রে অবস্থান করিবে! আমার বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে অসন্তোষ যেমন অসুখের কারণ, তেমনই অসন্তোষপ্রণোদিত কার্য্যলব্ধ ফল সুখের একটী উপাদান। আমার আরও বিশ্বাস দুর্ভিক্ষ সময় যে খাইতে পায় সে, যে খাইতে পায় না সেই অনাহারী, সপরিবারে মৃতপ্রায়, হতভাগ্য কৃষক অপেক্ষা অধিক সুখী; কারণ তাহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত পুত্র কন্যা কাঁদে না, প্রিয় ভার্য্যা সম্মুখে অনশনে প্রাণত্যাগ করে না। আর সুখই যদি মানবের এক মাত্র লক্ষ্য হয়, যদি আর উন্নত অবস্থায় সুখ না থাকে, তবে মানবের আদিম অবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে বলিতে হইবে। মনুষ্য বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিলে সভ্য হইত না, তাহা হইলে সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি ধরণীপৃষ্ঠ সুশোভিত করিত না, বাণিজ্যপোত নির্ম্মিত হইত না, রেলগাড়ি, বৈদ্যুতিক তার উদ্ভাবিত হইত না, ব্যোমযান আকাশে উড়িত না; তাহা হইলে সঙ্গীতের প্রাণালোড়ী ঝঙ্কার, চিত্রের হৃদয়োন্মাদী মাধুর্য্য, ভাস্করনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির প্রস্তরগত কবিত্ব, কবিতার তারাময়ী ভাষা সৃষ্ট হইত না, ও মানব জীবনপথে কুসুম বৃষ্টি করিত না। অসন্তোষই ইহাদিগের উৎপত্তিস্থান। অসন্তোষই সভ্যতা-স্রোতস্বিনীর নির্ঝর।"

* * *

পতাকা, ২৪শে ফাল্গুন, ১২৯১।

"লণ্ডনে কত বড় বাড়ী, রাজপ্রাসাদের ন্যায় অসংখ্য হর্ম্ম্য কেবল দোকান। এখানে রাস্তার সৌন্দর্য্য এই সজ্জিত সুরম্য দোকানে। পথ দিয়া চলিয়া যাইলে খুব গরিব লোকও সজ্জিত দ্রব্যাদির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যায়। আমার এরূপ বিশ্বাস যে এ দৃষ্টিপাত তাহাদের শোচনীয় দারিদ্র্যজাত কষ্টের কিছু লাঘব না করিয়া হয়ত তাহা বাড়াইয়া দেয়; অথবা তাহাদিগের মনে ধনী হইবার বলবতী বাসনার সঞ্চার করে। তবে ইহা আমার পূর্ব্বকথিত বৃটিশ জাতির বর্ত্তমান অসন্তোষের একটী হেতু। আমাদের দেশের প্রায় সকলেই "গোপাল যাহা পায় তাহাই খায়, ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া আবদার করে না।" যতদিন বঙ্গবাসী "রাখাল" হইতে না শিখিবে ততদিন তাহাদের পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘটিবে না।"

* * * *

পতাকা, ২০শে ভাদ্র, ১২৯২। (লণ্ডন, ১০ই আগষ্ট, ১৮৮৫।)

"শিক্ষিত বাঙ্গালী চোগা-চাপকান ধরিয়াছেন। কিন্তু যদি কাহারও কপালক্রমে চোগা হারাইয়া গেল, চাপকান ছোট হইল ও তাহার বোতাম হঠাৎ একদিন সম্মুখদিকে হইল, তাহা হইলেই তিনি সাধারণসমক্ষে জাতিত্যাগী, অশ্রদ্ধেয় ও দেশবিদ্বেষী বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং ইংরাজের স্তাবক নামে অভিহিত হইলেন। বঙ্গে দেশহিতৈষিতা বড় সস্তা! বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি কেহ কাপড় ও চোগা-চাপকান পরেন ও এলবার্ট স্কুলে জাতীয় গৌরব গান করেন, তিনি দেশহিতৈষী হইলেন ও বঙ্গসমাজে আদৃত হইলেন। * * *

বাঙ্গালীর পোষাক

*   *   *   কিন্তু যদি কাহারও নেতা বা সংস্কারক হইবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা না থাকে ; যাহা ভাল বুঝি আমি নিজে তাহা করিয়া যাইব, ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা হয়, তিনি যদি কোট, চাপকান হইতে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, তিনি কি হেয় হইলেন ? তাঁহার জাতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির মত প্রথায় চলিতে পারেন না বলিয়া কি তিনি জাতির নিকট অশ্রদ্ধেয় ?

"অথচ পোষাক এমন কিছু একটী জিনিষ নয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় উন্নতির গতি স্থগিত থাকে। তথাপি অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি আছে। * * তাহার পরিচালনায় মনুষ্যের উন্নতি বই অবনতি হয় না। প্রতি মনুষ্য এক প্রথাবলম্বী হইলে জাতির কোনও বিষয়েই উন্নতি হয় না, যাহার যে রুচি সে তাহার অনুসরণ করুক। * * পরিচ্ছদ হাজার সামান্য বিষয় হউক, ইহাতেও সেই বিধি খাটে। Individuality is the fountain of progress and the source of human happiness—মনুষ্য জীবনের সুখের মূলে এই স্বানুবর্ত্তিতা। ইহা প্রতি জীবনে নবীনতা আনিয়া দেয়, উদ্দেশ্যহীন জীবন তথ্যপূর্ণ করে, পুষ্পহীন তরুকে কুসুমিত করে। ইহা আবার জীবনে আদর্শ আনিয়া দেয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:•:—

বিলাত-প্রবাস

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলাতে পৌছেন, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন সেখানে ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পত্র পাইয়া দ্বিজেন্দ্রকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া যান।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"দ্বিজেন্দ্র এবং আর কয়েকটী বঙ্গবাসী বিলাতে একটী মধ্যবিত্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাসাখরচ দিয়া থাকিতেন। ঐ বাটীর সমুদয় লোক, কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ, সকলেই দ্বিজুকে বড় ভালবাসিতেন। Land lady দ্বিজুকে এত স্নেহ ও যত্ন করিতেন যে, দ্বিজু বাটীতে একবার আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে "তোমার কোন ভয় নাই। এই রমণীকে আমি বিবাহ করিব, এমন সম্ভাবনা নাই। ইনি বয়সে আমার মাতাঠাকুরাণীর তুল্য।" দ্বিজু বিলাতী খানা ভাল খাইতে পারিতেন না। তজ্জন্য এই শ্রদ্ধেয়া মহিলা দ্বিজুর জন্য একদিন পোলাও রাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য পোলাও কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পাঠককে বলিতে হইবে না। যাহা হউক, তিনি বিদেশে দ্বিজুকে মায়ের মত স্নেহ করিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন।

"দ্বিজু তাঁহার মায়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। কোলের ছেলেকে মা যেমন স্নেহ করেন, দ্বিজুকে তাঁহার মা তেমনি স্নেহ ও আদর করিতেন।

দ্বিজুও তাঁহার মায়ের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। তাহার Lyrics of Indতে stream শীর্ষক কবিতাতে তিনি স্রোতস্বতীর মুখে কুলুকুলু রবে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন। নানা রঙ্গভঙ্গপূর্ণ ঘর্ঘর-নিনাদী বিচিত্র বিলাতে যখন তিনি নির্জ্জনে থাকিতেন, তখন মায়ের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, তাহা নিম্নলিখিত কবিতাতে বেশ বুঝা যায়।—

"Some say, I'm cruel to have left
My mother lone my loss to mourn,
But know they not how sore my heart
For her doth oft in silence burn.
When Nature sleeps in Night's soft arms,
The heavens with starry rapture glow,
Sad visions flit across my sight,
—The dreams of days—long long ago.
The stars I gaze at with whose beams
I played, when I was but a spring
Then think of long departed years,
They back again those visions bring.
Then think I of my mother dear,
Whom I left mourning years ago,
Then bursts my heart, I sob and weep
And cry in muffled murmurs low."

"মিতভাষী গম্ভীর দ্বিজুর হৃদয় কত কোমল ছিল—যখন জননীকে ভাবি, সেই স্নেহময়ী জননী, যাহাকে কত বৎসর হইল শোকে ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, তখন অশ্রুবর্ষণ করি।"

"জননী-বিরহকাতর দ্বিজু বিলাতে অন্তরঙ্গ অকপট বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব এমন সরল ও মধুর ছিল যে, যিনি তাঁহার সহিত মিশিতেন, তিনি তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাই তিনি তাঁহার কবিতাতে যথার্থভাবে বলিয়াছেন,—

"They say I am so young and sweet
They say, that I am passing fair,
Each wishes me to stay with him
And from this pilgrimage forbear.
They say I have auroral locks,
Which in their golden splendour flow,
The say, they see a high romance
In my poetic murmurs low."

"তরঙ্গিণীর মুখে এখানে দ্বিজু নিজের কথা প্রচ্ছন্নভাবে বলিয়াছেন। যে সকল ইংরাজ নরনারী দ্বিজুর গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন যে দ্বিজু বিলাতেই থাকেন। দ্বিজুর যে সকল কবিতা তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণ পাঠ করিতেন, তাঁহারা দ্বিজুর ভাবী জীবনে "high romance" দেখিতে পাইতেন।"

বিলাতে অবস্থানকালে একবার একটী ইংরাজ বালিকার প্রণয়-জালে পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রের তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রলোভন হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সেই বিপদে পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"দ্বিজু বিলাতে থাকিতেই তাঁহার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের সংবাদ পান। আমি এই সংবাদ অতি সন্তর্পণে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম।

পিতৃদেবের প্রতি দ্বিজুর যে ভক্তি ছিল তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এক বৎসরের মধ্যে জননীদেবী পিতৃদেবের অনুসরণ করিলেন। এইবার দ্বিজুকে সংবাদ দেওয়া বড়ই কঠিন বোধ হইল। তাঁহার "ল্যাণ্ড-লেডি" দ্বারা তাঁহাকে এই শোকাবহ ঘটনা জানান হইল।"

১৮৮৫ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বলেন—"যে দিন দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেইদিন কৃষ্ণনগরের সে সময়কার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন—"দাওয়ানজী আপনার কিছু মনের কথা বলিবার আছে? কোন অপূর্ণ সাধ অপূর্ণ বাসনা ব্যক্ত করিবার আছে কি?" মৃত্যুশীর্ণ মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটাইয়া দাওয়ানজী উত্তর করিলেন "আমার মনে কোনও ক্ষোভ নাই। আমার সাত পুত্রই জীবিত; সর্ব্বকনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র বিলাতে গিয়াছে, সেখানে ভাল লেখাপড়া করিতেছে। একমাত্র কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়াছে। আমার সকল সাধ মিটিয়াছে। এখন যাঁহার আহ্বানে লোকান্তর যাইতেছি তাঁহার দরবারে গিয়া হাজির হইতে পারিলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।—সাহিত্য, (৯ই শ্রাবণ ১৩২০, টাউনহলে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সভায় পঠিত প্রবন্ধ)

দেওয়ানজীর জীবনের শেষ দিনের ঘনটার প্রসঙ্গে তদীয় পুত্র হরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"স্বর্গীয়া দেবীসদৃশী মাতৃদেবীকে এই আশ্বাস দিলেন যে "তোমার ভাবনা কি, তোমার সাত ছেলে; সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রও এম্-এ পাশ করিয়া বিলাত গিয়াছে।" যতদূর স্মরণ হয় এই কথাগুলি মৃত্যুর প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাঁহার বন্ধু, সিভিল মেডিকাল অফিসার ডাক্তার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় আশ্বাস

দিয়া বলিলেন—"দেওয়ানজী ভয় কি ?" পিতৃদেব ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন "আমার ভয় ?" (কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের আত্মজীবন-চরিত—পরিশিষ্ট ১৭১ পৃঃ)।

বিলাতে থাকিবার সময় দ্বিজেন্দ্রের জীবনের একটা ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছিল। একদিন দ্বিজেন্দ্র একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিবার সঙ্কল্প করেন; সঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (এক্ষণে মাননীয় বিচারপতি) এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী (এক্ষণে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার) মহাশয়েরা ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাঁহারা অন্যপথে পাহাড়ের উপর উঠিয়া দ্বিজেন্দ্রকে ডাকিতে থাকেন। দ্বিজেন্দ্র অন্যপথে না গিয়া ঋজুভাবে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। পাহাড়টী ছোট হইলেও যে স্থান দিয়া দ্বিজেন্দ্র উঠিতেছিলেন, সে স্থানটী এত খাড়া উঠিয়াছে যে, কিয়দ্দূর উঠিয়া আর উঠিবার উপায় পাইলেন না; নামিবারও উপায় নাই, যে সকল প্রস্তরখণ্ড অবলম্বনে কোন মতে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন তাহা ধরিয়া নামিতে গেলে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গিগণ তাঁহাকে "দ্বিজু দ্বিজু" বলিয়া ডাকিতেছেন, তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিতেছেন না, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; একবার গড়াইতে আরম্ভ করিলে আর রক্ষা নাই, নীচে মাংসপিণ্ডাকারে পতিত হইতে হইবে। তখন বৃক্ষমূল আর তৃণগুচ্ছাবলম্বনে উপরে উঠিবার চেষ্টা করা ভিন্ন উপায়ন্তর ছিল না। তিনি সাহসে ভর করিয়া উঠিতেই আরম্ভ করিলেন। একটী বৃক্ষমূল ছিন্ন বা হস্তস্খলিত হইলে, এক গুচ্ছ তৃণ উৎপাটিত হইয়া আসিলে, আর কোন মতে রক্ষা নাই, তথাপি উঠিতে লাগিলেন, শরীরে বল ও মনে দ্বিগুণ উৎসাহ আসিল। সে যাত্রা ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিলেন্। তিনি নির্ব্বিঘ্নে উপরে উঠিয়া নিরাপদ্ স্থানে উপস্থিত হইলেন।

উপরে উঠিয়াই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।” (জন্মভূমি, কার্ত্তিক, ১৩২০)

বিলাতে অবস্থান কালে দ্বিজেন্দ্র "Lyrics of Ind" নামে একখানি ইংরাজিতে গীতি কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন—“বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আশক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিগ্যাভ্যাস কালে বায়রণের Manfred ও Childe Haroldএর দুই canto এবং মেঘদূত ও উত্তর চরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাতে গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespear বার বার পড়িতাম। * * * বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার্ এডুইন আর্ণল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতা-গুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎ-সাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।” (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১০)

বঙ্গবাসী বলেন (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) “এই গ্রন্থে তাঁহার জয় জয়কার হইয়াছিল। * * * কলিকাতার ইংলিশম্যান ও ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্র গ্রন্থের খ্যাতিবাদে মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিল, এমন কি ষ্টেটস্‌ম্যান্ লিখিয়াছিলেন ‘যদি গ্রন্থে ডি এল্ রায় নাম না থাকিত তাহা হইলে ইহা কোন উচ্চাঙ্গের ইংরাজ কবির লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত।” ষ্টেটস্‌ম্যান আরও লিখিয়া-ছিলেন “He possesses undoubted genius and much of the fervour of a great poet. *Scotsmen* লিখিয়াছিলেন, “His language and versification are of one born to the

manner of English poetry." ইণ্ডিয়ান মিরার এই পুস্তকের কবিতাগুলিকে "Literary gems" আখ্যা দিয়াছিলেন।

এই পুস্তক সম্বন্ধে আর্য্যাবর্ত্ত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) লিখিয়াছেন—"প্রত্ন-তত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত হইলে সভ্য-জগতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। কিন্তু বিদেশীর পক্ষে ইংরাজিতে কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করিয়া স্থায়ী যশের আশা করা যায় না—যাইতে পারে না। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যে দিক্‌পাল, কিন্তু তাঁহাদের ইংরাজি রচনা আজ বিস্মৃতির অন্ধ অতলে স্থানলাভ করিয়াছে। তরুদত্ত ও মনোমোহন ঘোষ কেহই ইংরাজি সাহিত্যে স্থায়ী স্থানলাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলে সাহিত্যের সম্পদ সম্বর্দ্ধিত হইত—তাঁহাদের ভাগ্যেও স্থায়ী যশো-লাভের সম্ভাবনা থাকিত। দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজি রচনায় নিপুণতা ছিল। কিন্তু তাঁহার ইংরাজি কবিতাপুস্তক-বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত।"

পক্ষান্তরে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে মনস্বী ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়া-ছিলেন—(প্রদীপ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৮) "মিঃ রায় ইংরাজি কবিতার রচনায় বিদেশীর দুর্ল্লভ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে ক্ষমতা দেখিয়া উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ কবি স্বয়ং স্যর্ এডুইন্ আরণোও্ বিস্মিত, বিমুগ্ধ। এই বাঙ্গালীর লিখিত ইংরেজী কাব্য (Lyrics of Ind) পড়িয়া ঐ ইংরেজ কবি বিস্ময়সূচক প্রীতি প্রকাশ করিয়া বলেন—"Ashtonishing. Undoubted poetical power"—বিস্ময়কর, সন্দেহ রহিত সুনিশ্চিত কবিত্ব শক্তি।" পরন্তু বিশিষ্ট বিলাতী পত্র 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিবিউ' এবং স্কচ্‌ম্যান এই বাঙ্গালীর ঐ ইংরেজী কবিতা পুস্তকের প্রভূত ও প্রকৃত প্রশংসা করিয়াছেন। শেষোক্ত পত্রের সমালোচক রায় মহাশয়ের রচনায় ইংরেজী ভাষার প্রয়োগদক্ষতার ও

ছন্দ ব্যবহার-নিপুণতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "এই বাঙ্গালী ইংরেজী কবিতা প্রণয়ন-কল্পে জন্মকবি।" প্রশংসা ইহার অধিক হইতে পারে না। আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যতবড় ইংরেজীনবিশ হউন বা থাকুন, কেহ কখনও ইংরেজী কবিতা প্রণয়নে প্রকৃত পক্ষে পারদর্শী হইতে পারেন নাই। ইংরেজী কবিতা রচনায় কৃতিত্বের কথা এক শুনা গিয়াছিল স্বল্পজীবী কুমারী তরুদত্তের আর শুনিতেছি এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। ইহা বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকর; বাঙ্গালীর বহুমুখী শক্তিরও সুদুর্লভ।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"১৮৮৩ খ্রীঃ বিলাত প্রবাস কালে দ্বিজু Lyrics of Ind নামক ইংরাজিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিজেন্দ্র তখন ইংরাজি ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইবেন এইরূপ আশা পোষণ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য নহে। মাইকেলও প্রথমে ইংরাজি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া কীর্ত্তিলাভ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। পরে অনুতাপের সহিত মাতৃভাষার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া অমরগ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন। এই কথা আমি তখন দ্বিজেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ইহার পর দ্বিজেন্দ্র আর ইংরাজি কবিতা লিখেন নাই।" (নব্যভারত, ১৩২০)

দ্বিজেন্দ্র ইংলণ্ডে সিসেষ্টার (Cirencester) কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকীয় কৃষিকলেজের এবং রাজকীয় কৃষি সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত—M. R. A. C., ও M. R. S. A. E (Lond.) হয়েন এবং F. R. A. S. ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:•:—

সংসারে প্রবেশ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) দেশে আসিয়া ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলাটের সহিত যেরূপ স্বাধীন ভাবে কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ভাল চাকুরী পাইলেন না। তাঁহার ন্যায় কৃষি-শিক্ষা করিয়া এক জন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী Statutory civilian হইলেন, আর দ্বিজেন্দ্র 'ডেপুটী' হইলেন।"(নব্যভারত ভাদ্র, ১৩২০)

ডেপুটীগিরিতে নিয়োগ পাইবার মাসত্রয় পরে এবং কর্ম্মস্থলে গমন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রের পরিণয় সংঘটিত হয়। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া একদিন দ্বিজেন্দ্র তদীয় আত্মীয় ও বন্ধু স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতার বাটিতে কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীকে প্রথম দর্শন করেন। তৎকালে সুরবালার বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। শরৎবাবুর কোনও আত্মীয় ব্যক্তি সেই দিন দ্বিজেন্দ্রের নিকট সুরবালার সহিত তাঁহার বিবাহের কথায় উত্থাপন করেন এবং দ্বিজেন্দ্রের সম্মতিক্রমে তাঁহার অগ্রজদের নিকট সেই বিবাহ-প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"পূজনীয় (ডাক্তার) ৺কালীচরণ লাহিড়ীর পুত্র ৺সত্যজীবন লাহিড়ী কলিকাতার বিখ্যাত

চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বিশিষ্ট ধনি-পরিবার তাঁহাদিগের একটী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বিবাহ আমার মতে ইচ্ছনীয় বোধ হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রও প্রতাপ বাবুর কন্যাকে মনোনীত করিলেন। দ্বিজেন্দ্র বিবাহে কোন টাকা এবং দানসামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ে কোন সর্ত্তই করেন নাই।”

তৎকালে ডাক্তার প্রতাপ বাবুর অবস্থার উন্নতি হয় নাই। তিনি বিডন ষ্ট্রীটের একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকিতেন। তাঁহার কন্যার সহিত সম্বন্ধ হইলে, দ্বিজেন্দ্র বলেন—দেনা-পাওনার প্রস্তাব করিলে তিনি বিবাহ করিবেন না। দ্বিজেন্দ্রের অগ্রজেরা কন্যা দেখিয়া যাইলে গুজব উঠিল কন্যাটী “বোবা”। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রকে পুনর্ব্বার কন্যা দেখিতে আসিতে হইল। দ্বিজেন্দ্র কন্যাটিকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা একটু ‘থতমত’ খাইয়া গিয়া স্পষ্ট উত্তর দিতে না পারাতে দ্বিজেন্দ্র ভাবিলেন বুঝিবা গুজবটা সত্য—বালিকাটী “বোবা”। পরে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য দ্বিজেন্দ্র তাঁহাকে একখানি পুস্তক হইতে পাঠ করিতে দিলেন। বালিকা পাঠ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রের সন্দেহ মিটিয়া গেল, বিবাহ স্থির হইল জানিয়া প্রতাপ বাবু দ্বিজেন্দ্রের হস্তে একখানি খামে বন্ধ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে দিবার জন্য একখানি পত্রের সহিত কৃষ্ণনগর হইতে বরযাত্রী আনিবার পাথেয়স্বরূপ একখানি ৫০০৲ টাকার নোট প্রেরণ করেন। সেই বিবাহে প্রতাপবাবুকে যৌতুক বা বরপণ-স্বরূপ অর্থব্যয় করিতে হয় নাই। বিবাহ হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে সম্ভ্রান্তপরিবারে আর একটী শিক্ষিতা কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাবের কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার অন্যতম

কারণ—দ্বিজেন্দ্র বলেন যে তিনি হিন্দুমতে ভিন্ন বিবাহ করিবেন না, কিন্তু কন্যা-পক্ষীয়েরা ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে ব্যতীত অপর কোনও মতে বিবাহ দিতে রাজি ছিলেন না।

১৮৮৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে (১২৯৪, বৈশাখ) দ্বিজেন্দ্রের বিবাহের দিন স্থির হয়। জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্র দেশে আসিলে মাননীয় ৺রায় যদুনাথ রায়বাহাদুর আমাকে নদীয়া জেলার একজন পদস্থ গণ্যমান্য পণ্ডিতের সাক্ষাতে বলিলেন যে "আমরা দ্বিজেন্দ্রকে সমাজে লইব।" এই কথা বলিয়া উক্ত পণ্ডিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি বলেন ঠাকুর?" ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা লিখিতে লজ্জা হয়। ঠাকুর অম্লানবদনে বলিলেন, "তোমরা আমাকে কত টাকা দিবে?" ঐ ঠাকুর এবং অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঠাকুরের প্রকৃতি আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তথাপি ঐ কথাটা শুনিয়া বড়ই ঘৃণা বোধ হইল। আমি রায়-বাহাদুরকে বলিলাম "এ বিষয় আপনাদের যত্ন ও শ্রম করিবার আবশ্যক নাই। * * * দ্বিজু কথনই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন না।

"যাহা হউক, ভ্রাতাগণ দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া শুভবিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কৃষ্ণনগরের কয়েকটী সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের কোন প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহা-দিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সহসা চলিয়া গেলেন। যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ দ্বিজু ও তাঁহার নবোঢ়া বধূকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলাম; দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্বেও কেহ আমদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।"(নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২০)

"একঘরে"—

আর্য্যাবর্ত্ত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পৈত্রিক বাসগৃহের পার্শ্বে তাঁহার জন্য বাঙ্গালা রক্ষিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত তাঁহাকে অঙ্কে স্থান দিতে অসম্মত। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হিন্দু-সমাজের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন—প্রতিবাদের ভাষা জ্বালাময়ী, ভঙ্গী ভীষণ। দ্বিজেন্দ্রলালই বলিয়াছেন—"ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায় ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধদংশন, ইহার ভাষা অগ্নি-দাহের জ্বালা।"

দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়াই "একঘরে" পুস্তিকা খানি লিখিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলে দ্বিজেন্দ্র ভাষার সংযম রক্ষা করিতে পারিতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ পূর্ব্বপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জ্ঞানেন্দ্র বাবুর মন্তব্যে সপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্র "একঘরে" পুস্তকে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে কথা "স্বদেশপ্রেম" শীর্ষক পরিচ্ছেদে পুনরুত্থাপন করিতে হইবে বলিয়া এস্থানে বিবৃত করিলাম না।

"এক ঘরে" পুস্তিকায় হিন্দু সমাজের প্রতি কটূক্তি আছে বলিয়া উহা সাহিত্য-সংসারে আদর পায় নাই। এমন কি দ্বিজেন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়েরাও ঐ: পুস্তক প্রকাশের জন্য দ্বিজেন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পুস্তকের লিপিকৌশলে সুখ্যাতির বিষয় আছে। "আর্য্যাবর্ত্ত" ঐ পুস্তকের ভাষায় অসংযমের দোষ দেখাইয়াছেন—মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন—ঐ পুস্তকে "দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাসক্ষমতার—বিদ্রূপপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া

যায়।" Indian Mirror লিখিয়াছিলেন—"Stinging Satire : Noble feeling." Bengalee লিখিয়াছিলেন—"Bears the inpress of a great talent." National Guardian লিখিয়াছিলেন—"Bound to add to his reputation as a satirist." স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন -"Withering sarcasm."

দ্বিজেন্দ্রলালকে সমাজে একঘরে হইয়া থাকিবার কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। বিবাহের পর কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিতেই সকল গোল মিটিয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:•:—

গবর্ণমেণ্ট-সার্ভিস

১৮৮৬ খ্রীঃ ২৫শে ডিসেম্বর দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে জমির জরিপ ও রাজস্ব নিরূপণ (Survey and Settlement), আবকারি (Excise), ভূমিসংক্রান্ত দপ্তর ও কৃষি (Land Records and Agriculture) এবং শাসন ও বিচার বিভাগসমূহে কর্ম্ম করিতে হয়, এবং সেই কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে মধ্যপ্রদেশ (১৮৮৬), মোজাফরপুর (১৮৮৭), ভাগলপুর ও মুঙ্গের (১৮৮৬—৯১), দিনাজপুর (১৮৯১—৯৩), বাঁকিপুর (১৮৯৪), ঢাকা (১৮৯৪—৯৮), কলিকাতা (১৮৯৮—১৯০৪), খুলনা (১৯০৫), বহরমপুর (১৯০৬), কাঁথী

(১৯০৬), গয়া ও জাহানাবাদ (১৯০৬—০৮), ২৪-পরগণা—আলিপুর (১৯০৯—১২) এবং বাঁকুড়ায় (১৯১২) কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে হয়।

ডেপুটীগিরিতে নিযুক্ত থাকিয়া দ্বিজেন্দ্র তাঁহার কৃষি-বিদ্যার অভিজ্ঞতা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। কেবল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ১৯০৬, খ্রীঃ বঙ্গদেশের ফসল (Crops of Bengal) বিষয়ে ইংরাজিতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে তিনি চাকরী হইতে বিদায় লইয়া কৃষিকার্য্য করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

তাঁহার চাকরীর ইতিহাসের কিয়দংশ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং "জন্মভূমি"তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

" * * সেটল্‌মেণ্ট কার্য্য শিখিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (Central Provinces) পাঠান। সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত কাজ শিখিতে আবার মোজাফরপুরে প্রেরিত হই। এই দুই কার্য্য ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ খ্রীঃ আমি শ্রীনগর ও বনোল ষ্টেটের আসিষ্ট্যাণ্ট সেটল্‌মেণ্ট অফিসার হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় যাই। সেখান হইতে মুঙ্গের ও তথা হইতে পূর্ণিয়ায় উক্ত কাজ শেষ করিয়া, আমি বর্দ্ধমান ষ্টেটে, সুজামুটা পরগণায়, সেটল্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি।

"উক্ত (সুজামুটা পরগণার) সেটল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্গদেশে একটী উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারেরা জরীপে জমি বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা সেটল্‌মেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এইরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ। প্রজার

সহিত যখন পূর্ব্বে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমির পরিমাণ হস্তবুদে লেখা হয়। এমন কি, এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমিই এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট অধিক খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা (বা জমিদার) যদি বেশী জমির বেশী খাজনা দাবী করেন ত তাঁহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন্ জমিটুকু বেশী অধিকার করিয়াছে। আর ড্রেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমির বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই।

"(আমার) এই রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয়, এবং তাহাতে জজ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় স্যার চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া, উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়া, স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন, ও কাগজ পত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎর্সনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটল্‌মেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোটলাট বলেন "আমি নিজে সেটল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলাম। আমি সেটল্‌মেণ্ট কাজ বেশ বুঝি।" তদুত্তরে বলি যে, "আপনি পাঞ্জাবে সেটল্‌মেণ্ট কাজ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের সেটল্‌মেণ্ট আইন এবং বঙ্গদেশের সেটল্‌মেণ্ট আইন একপ্রকার নহে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে।" এই উত্তর শুনিয়া ছোটলাট আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন, ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটল্‌মেণ্ট অফিসারদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন, এবং তাহাই আইনে (সেটল্‌মেণ্ট ম্যানুয়েলের নোটের ভিতর) ঢুকাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন।

"ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল, হাইকোর্ট, জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন ; এবং সেই হাইকোর্টের 'রুলিং' অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটল্‌মেণ্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমি বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটী আপীলে স্যার চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি সেটল্‌মেণ্ট ম্যানুয়েল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন।"

জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"হাইকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইল Mr. D. L. Roy ভ্রান্ত হন নাই Sir Charlesই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে স্যার চার্লসের ক্রোধ উপশমিত না হইয়া বর্দ্ধিত হইল। তিনি আইনে পরাস্ত হইয়া "Mr. Roy শ্রমবিমুখ" কলিকাতা গেজেটে এইরূপ দোষারোপ করিলেন। কিন্তু দ্বিজুর উপরিতন কর্ম্মচারী মাননীয় ফিনি-উকেন সাহেব দ্বিজুর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিলেন যে "Mr Royএর কার্য্য monument of industry and ability. মিঃ রায়ের কার্য্য পরিশ্রম এবং দক্ষতার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।"

"দ্বিজেন্দ্রের উপরিতন কর্ম্মচারী উচ্চপদস্থ শ্রীযুক্ত ফিনিউকেন সাহেব সাহসপূর্ব্বক এইরূপ না লিখিলে বোধ করি, ছোট লাট দ্বিজেন্দ্রকে "ডিগ্রেড" করিয়া দিতেন। যাহা হউক, দ্বিজেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, সত্যের অনুরোধে এবং গরীব প্রজাদিগের হিতকল্পে তিনি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি পদে পদে এইরূপ তেজস্বিতা প্রকাশ না করিলে তাঁহার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল। তিনি কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্টে একটী মন্তব্য প্রেরণ করিলেন। তাহা গবর্ণমেণ্টের পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। সেই পুস্তক আমি পাঠ করি।

এই মন্তব্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে "আপনারা কার্য্যের ভ্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন, ভ্রম বুঝাইয়া দিলে আপনারা বুঝিবেন না, শুনিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ ভ্রান্ত নিয়মাবলীর যাহা অনিবার্য্য অনিষ্টজনক ফল তাহা ঘটিলে, আপনাদিগের আদেশানুসারে যে কর্ম্মচারী ঐ নিয়মাবলীতে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তাহার স্কন্ধে ঐ নিয়মাবলীর দোষ চাপাইয়া থাকেন। যাহা ঘটিয়াছে, আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে লিখিয়াছিলাম যে, তাহাই ঘটিবে। এক্ষণে আমাকে দোষী বলা কতদূর সঙ্গত আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।" এইরূপ লেখার পর দ্বিজেন্দ্রের যে চাকুরী যায় নাই তাহাই আশ্চর্য্য, কেবল তাহা আশ্চর্য্য নহে, তাহা ব্রিটিশ শাসনের ইংরাজদিগের পক্ষে একটা প্রশংসার কথা। ...... উপরিউক্ত ফিনিউকেন সাহেব যে একাকী দ্বিজেন্দ্রের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা নহে। যখন ছোটলাটের সহিত দ্বিজেন্দ্রের বাদানুবাদ হইতেছিল, তখন সেই স্থানে মাননীয় F. R. S. Collier কালেক্টার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। কলিয়ার সাহেব বিশেষ আইনজ্ঞ, ছোটলাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি বলেন?" তাহাতে কলিয়ার সাহেব বলেন "I think Mr. Roy is right" আমার বিবেচনায় মিঃ রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক।

"দ্বিজেন্দ্র কিছুকাল পরে কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারে ত্যক্ত হইয়া "Honesty is not the best policy"—সততা সাংসারিক স্বার্থসাধক নহে এই বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা করায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বিজেন্দ্রের উপর চটিয়া দ্বিজেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান। দ্বিজেন্দ্রের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে একদিন আমি দ্বিজেন্দ্রের কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখিলাম যে, দ্বিজেন্দ্র অতি গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে "আমি চাকুরী
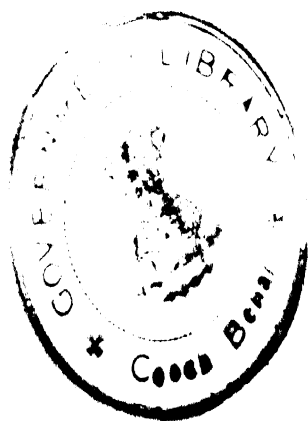
দ্বিজেন্দ্রলাল (বিভিন্ন বয়সে)

২ দ্বিজেন্দ্র-পত্নী সুরবালা দেবী — পৃঃ ৫৫

ছাড়িয়া দিব মনে করিতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি করিবে?" তিনি বলিলেন যে, "কলিকাতার একটি জমিদার ৬০০৲ ছয় শত টাকা বেতনে আমাকে তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক।" আমি তাঁহাকে বলিলাম 'একাজ তুমি কদাপি করিও না। তুমি যেরূপ তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা, তুমি কোনও জমিদারের ষ্টেটে এক মাসও কাজ করিতে পারিবে না।'

"সুজামুটী সেটেল্‌মেণ্টের পরে দ্বিজেন্দ্র ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া দিনাজপুরে প্রেরিত হন। এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ তথা হইতে বঙ্গদেশে আবকারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শক (First Inspector) নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৭ই মার্চ ল্যাণ্ড-রেকর্ডস এবং কৃষিবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর হন, ১৯০০ খ্রীঃ আবকারী বিভাগের কমিশনরের সহকারী-রূপে নিযুক্ত হন। এই বৎসর পুনর্ব্বার আবকারী পরিদর্শক হন।"

নবম পরিচ্ছেদ

—:•:—

আর্য্যগাথা-দ্বিতীয় ভাগ

সংসারে প্রবেশ করিয়া চাকুরীর ঝঞ্ঝাটে ছয় সাত বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য-সেবার তাদৃশ অবসর পান নাই। সেই সময়ে তাঁহাকে কর্ম্মো-পলক্ষে ক্রমান্বয়ে মধ্যপ্রদেশ, মোজাফরপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনাজপুর,

ও বাঁকিপুরে অবস্থান করিতে হয়। মধ্যে একবার ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হইয়া তিনি ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে তিন মাসের অবকাশ লইয়া মুঙ্গেরে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিয়া আসেন।

'আর্য্যগাথা-প্রথমভাগ' প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে, ১৩০১ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার আর্য্যগাথা-দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করেন। তখন দ্বিজেন্দ্রের বিবাহিত জীবন, নববসন্তসমাগমে শত-পিক-কলরবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—আর্য্যগাথায় অধিকাংশই প্রেমের গান। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন "দশবৎস পূর্ব্বে আর্য্যগাথা প্রতি-শ্রুত হইয়াছিল যে, যদি সে আদর পায় ত আবার নূতন গীত শুনাইবে। কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে সে আশাতীত আদর পাইয়াছিল। তাই আবার সে নূতন গীত শুনাইতে আসিয়াছে। দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে, * * * আজ আমি আর সেই পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ পরিদর্শক, বিস্মিত বালক নাই।

আজ যেনরে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল ;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস ফুটেছে আজ নূতন আলো।

মলয়ানিলস্পৃক্ত প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়-কুঞ্জে তাই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।"

এই গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ পাশ্চাত্য কবিগণের গীতের অনুবাদ, অপরার্দ্ধ কবির নিজস্ব রচনা।

কবি গ্রন্থের প্রথমাংশের নাম দিয়াছেন "কুহু" এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাম দিয়াছেন "পিউ"। কবির "স্বপ্নময় কুহুময় প্রেম"এর "অস্ফুট" কাকলীর আভাষ দিবার জন্য এস্থলে একটী গীত (কীর্ত্তন) উদ্ধৃত করিলাম :—

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে, ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই, অবাক্ হইয়ে থাকি।

ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন রহিলো তোমারি কাছে ;
ওই মুখপানে চাই ; ও মুখকমলে জানিনা কি মধু আছে।
আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে, হেরি তোর রূপরাশি
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে, নিরখি তোমার হাসি ;—
সখি, তোমারি কারণে দুখময় ধরা সুখভরা সম দেখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই, তোমারে হৃদয়ে রাখি।

এই পুস্তকে দ্বিতীয়াংশের "উপহার" কবিতায় কবি সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বঙ্গললনার স্তুতি গান করিয়াছেন। বাঙ্গালার কুল-লক্ষ্মীগণের গুণগরিমায় কবি কত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত তুলনায় বাঙ্গালার পুরুষদিগকে তিনি কিরূপ অপদার্থ ভাবিতেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য সেই কবিতাটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। এই কবিতা বা গীতটী কবির "বঙ্গনারী" নাটকে স্থান পাইয়াছে।

চিরজীব সুখিনী বঙ্গরমণি রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুর কোকিল মৃদুস্বরা রে ;
দিব্য গঠনা, লজ্জাভরণা, বিনত ভুবনবিজয়ী নয়না,
ধীরা, মলয় ধীরগমনা, স্নেহ প্রীতিভরা রে।
শিশিরস্নিগ্ধ মেদুরা, কিশলয় পেলবা বামা,
অপরাজিতা নম্রা, নবনীল নীরদ শ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে ;
দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রী-সীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্য সতীরে,
মর্ম্মর দৃঢ় চরিতা, জল কোমলাঙ্গধরা রে।
কে বলে কালো রূপ নয়, যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?

তাজি নবঘন কে চাহে শ্বেত মেঘ শোভা প্রথরা রে।
জীবপ্রেম ভরিত হৃদয়া মেঘস্নিগ্ধ শ্যামকায়া,
নিন্দি তুহিনে শুভ্রচরিতে, বঙ্গ জ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে, কালোরূপে অমরা রে।
হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে— পঙ্কপতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষ ভীরু রমণী দস্যু রমণী—স্বার্থ দাসদাসী ;
কে দিল পশু সাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে॥

তৎকালীন "সাধনা" পত্রে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকখানির সমালোচনা করেন। তিনি গ্রন্থের দোষগুণ উভয়ই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে সমালোচনা সাহিত্য-রসিকের উপভোগ্য। রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন— "গ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজি প্রথার ভাষা আমাদের কাণে খারাপ লাগিয়াছে। * * "চেয়োনা বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে।' ইংরাজিতে cold শব্দের সহিত একটা অপ্রিয়-ভাবের যোগ আছে * * সেইজন্য হিম আঁখি শব্দটা কাণে বিজাতীয় ঠেকে। * * গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কবি স্কচ্, ইংরাজি এবং আইরিশ গানের যে সকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষা অনেক স্থলে অদ্ভুত হইয়াছে।

"গ্রন্থখানি সঙ্গীত পুস্তক, এই জন্য ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবে না। কারণ গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময় গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেই রূপই হওয়া উচিত। কারণ সঙ্গীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ মাত্র করাই আবশ্যক। * * * হিন্দুস্থানী গানে কথা এতই যৎসামান্য যে তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারি না—ননদিয়া, গগরিয়া, চুনরিয়া আমরা

কানে শুনিয়া যাই মাত্র কিন্তু সঙ্গীতের সহস্রবাহিনী নির্ঝরিণী সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মত প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবেগ, এক অনির্ব্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার করিয়া দেয়। * * ছন্দ সম্বন্ধেও একথা খাটে। নদী যেমন আপনার পথ আপনি কাটিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া গেলেই ভাল হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দী গানের কথার কোন ছন্দ থাকে না,—সেই জন্যই ভাল হিন্দী গানের গতি-বৈচিত্র্য এমন অভাবিত-পূর্ব্ব ও সুন্দর। * * * কাব্য স্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে কিন্তু সঙ্গীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হয়।

"বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক্ হইলেও তাঁহারা কখন কখন একত্র মিলিয়া থাকেন। * *

"বঙ্গদেশের কীর্ত্তনে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য্য আকার ধারণ করিয়াছে; তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই পূর্ণ সোণার কবিতা ভরাসুরের সঙ্গীত নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। * * *

"আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ খানিতে উভয় শ্রেণীরই গান দেখা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুর তালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্যসমালোচকের অধিকারবহির্ভূত! আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ, যাহা পাঠ মাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে গানগুলির মাধুর্য্যও সম্ভবতঃ সুরসংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা, গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে,

তথাপি ভাল এন্‌গ্রেভিং হইতে তাহার আদর্শ অয়েল পেণ্টিংয়ের সৌন্দর্য্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তেমনি কেবলমাত্র সেই সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি। উদাহরণস্বরূপ "একবার দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি" কীর্ত্তনটীর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা বেদনায় পরিপূর্ণ, অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত। * * * এই কবিতাটী কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বিচিত্র। আমাদের সঙ্গীত সাধারণতঃ একটী মাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ীভাব অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ভাব হইতে ভাবান্তরে বিচিত্র আকারে ও নব নব ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে না। সেইজন্য আমাদের বক্ষ্যমান কবিতাটীর উপযুক্ত রাগিণী আমরা সহজে প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু সুর না থাকিলেও আমরা ইহাকে গান বলিব ; কারণ ইহাতে আমাদের মনের মধ্যে গানের একটা আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেয়—যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমরা মনের ভিতর পূরণ করিয়া লই। গান এবং কবিতার প্রভেদ আমরা এই গ্রন্থ হইতেই তুলনার দ্বারা দেখাইতে পারি।

সে কে ? এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ? অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;
সে কে ? দূর হতে দূরাত্মীয় প্রিয়তম হতে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ;
সে কে ? লতাহতে ক্ষীণতারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারিনা আজীবন ;
সে কে ? দুর্ব্বলতা যার বল ; মর্ম্মভেদী অশ্রুজল ,
প্রেম উচ্চারিত রোষ যার ;

সে কে ? যার পরিতোষ মম সফল জনম সম ;
সুখ-সিদ্ধি সব সাধনার ;
সে কে ? হলেও কঠিন চিত শিশুসম স্নেহভীত ;
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে ;
সে কে ? বিনাদোষে ক্ষমা চাই যার ; অপমান নাই ;
শতবার পাদুখানি ছুঁয়ে ;
সে কে ? মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নুপুর হয়ে বাজে ;
সে কে ? হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া ;
যার হৃদি প্রহেলিকা মাঝে ?

"ইহা কবিতা, কিন্তু গান নহে। সুর সংযোগে গাহিলেও ইহাকে গান বলিতে পারিনা। ইহাতে ভাব আছে এবং ভাব প্রকাশের নৈপুণ্যও আছে কিন্তু ভাবের সেই স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সদ্য-উৎসারিত আবেগ নাই যাহা পাঠকের হৃদয় মধ্যে প্রহত তন্ত্রীর ন্যায় একটী সঙ্গীতময় কম্পন উৎপাদন করিয়া তুলে।

ছিল—বসি সে কুসুম কাননে।
আর—অমল অরুণ উজল আভা—ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল—এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়া সম হে) ;
ছিল—ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি—অতুল গরিমারাশি।
সেথা—বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—হাসি হরষ, আশা ;
সেথা—ঘুমায়ে ছিল রে, পুণ্য, প্রীতি, প্রাণভরা ভালবাসা ;
তার সরল সুঠাম দেহ ; প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো ;
যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা দিয়ে ; রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত, সোহাগ সরম স্নেহ।
যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে) ;

যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি—সুমিলিত সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়—কোকিল কূজিত গান।
শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো) ;
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী—অমনি অধীর প্রাণে ;
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া, কি মন্ত্র গুণে কে জানে।

"এই কবিতাটীর মধ্যে যে রস আছে, তাহাকে আমরা গীতরস বলিতে পারি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রবাবুর উক্ত মতের সার্থকতা নিজে বেশ বুঝিলেন। তাই দশ বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যগাথা-প্রথমভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত গীতগুলিকে কবিতায় ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিবার একটী কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। তিনি ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন "আর্য্যগাথার সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধে প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ সুরে গেয়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায়, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আমরা গাইবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের নিকট গাইয়া বেড়াইতে পারিতাম তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য্য, অসৌন্দর্য্য স্বরের উপরই অধিক নির্ভর করিত, কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।"

এই বিষয়ের স্থানান্তরে পুনরুত্থাপন করিতে হইবে বলিয়া রবীন্দ্র বাবুর ও দ্বিজেন্দ্রলালের উক্ত মন্তব্য দুইটী বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম।

'আর্য্যাবর্ত্ত' লিখিয়াছেন—"সন ১৩০১ সালে 'সাধনা'র যে সংখ্যায় এই (আর্য্যগাথার) সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপ কবিতা "কেরাণী" প্রকাশিত হয়। কবিতার নিম্নে কবির নাম ছিল না; তাই এই কবিতায় নূতন রসের ও নূতন ভাবের পরিচয় পাইয়া বাঙ্গালার বহু সাহিত্যিক সন্ধান করিয়া লেখকের নাম জানিয়াছিলেন। এই "কেরাণী" কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিহাস-কবিতার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করে।" 'সাহিত্যে' সেই বৎসরই "অদল-বদল", পর বৎসর ১৩০২ সালে "রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা", "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা", ১৩০৩ সালে "ভাটপাড়ায় সভা" "শ্রীহরি গোস্বামীর জীবনচরিত", "নন্দলাল" (হাসির গান) এবং ১৩০৪ সালে "কর্ণমর্দ্দন কাহিনী" বিদ্রূপ-কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। 'নন্দলাল' গীতটী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্র "Reformd Hindoos", "আমরা পাঁচটী ইয়ার", "বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল" ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত হাসির গান রচনা করিয়া বন্ধুসমাজে গায়িয়া সেগুলির প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে "সাহিত্যে" ও "ভারতী"তে ও অপরাপর মাসিক পত্রেও হাসির গান প্রকাশিত হয়। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রের গীতি-কবিতা এবং অন্যান্য গানও রচিত হইতেছিল। ১৩০৪ সালের সাহিত্যে 'আগন্তুক', ১৩০৬ সালের সাহিত্যে "নবীন পান্থ" এবং কয়েকটী গান প্রকাশিত হয়। অন্যান্য মাসিকপত্রেও তৎকালে দিজেন্দ্রলালের এই চতুর্ব্বিধ রচনা (বিদ্রূপ কবিতা, হাসির গান, গীতি কবিতা ও গান) প্রকাশিত হইতেছিল।

এই হাসির গানগুলিকে ভিত্তি করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রমান্বয়ে কল্কি-অবতার (১৩০২), বিরহ (১৩০৪), ত্র্যহস্পর্শ (১৩০৭), প্রায়শ্চিত্ত (১৩০৮) এই পাঁচখানি প্রহসন রচনা করেন, বিদ্রূপ কবিতাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া ১৩০৫ সালে তাহার ব্যঙ্গ-কাব্য (burlesque) 'আষাঢ়ে', প্রকাশিত করেন, এবং গীতি কবিতাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার

মন্দ্র (কাব্য) ১৩০৯ সালে প্রকাশ করেন। ১৩০১ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত দশবৎসর দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ সুখের বৎসর—তাঁহার রচনাতেও মনের সেই আনন্দ প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই সময়েই তিনি তাঁহার শিল্পসৌন্দর্য্যময় নাট্য কাব্য তিনখানি রচনা করেন। ১৩০৭ সালে 'পাষাণী', ১৩০৯ সালে 'সীতা' এবং ১৩১০ সালে 'তারাবাই' প্রকাশিত হয়।

'তারাবাই' প্রকাশের পর তাঁহার জীবনের নাটকে সুখকর অঙ্কের যবনিকা পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই দশ বৎসরের পর তিনি ব্যঙ্গ-কবিতা ও হাসির গান সামান্যই লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি যে 'হাসির গান' পুস্তক প্রকাশিত করেন তাহার অধিকাংশ গীতই এই সময়ের রচনা। প্রহসন, ব্যঙ্গ-কবিতা ও হাসির গান, গীতিকাব্য এবং নাট্যকাব্য, কবির এই সময়ের এই চতুর্ব্বিধ রচনার ইতিহাস পরবর্ত্তী চারিটী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

——•:*:•——

প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক নাটক

প্রহসন রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে লিখিয়া গিয়াছেন—"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।

"প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে—কল্কি-অবতার—একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ ত্র্যহস্পর্শ রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে (? ষ্টারে) অভিনীত হয়।" (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।)

সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার—এই প্রহসনখানিই আর্য্য-গাথা-২য় ভাগ প্রকাশিত হইবার পর কবির প্রথম পুস্তক। এই পুস্তকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—"স্থানে স্থানে দেব-দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেব-দেবী বিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য। কারণ হিন্দু-সমাজ ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা

অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। * * * বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত গোঁড়া, নব্য-হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেত ফেরত, এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।"

এই প্রহসনের "দ্বিতীয় অভিনয়" এর প্রথম-দৃশ্যে কবি গ্রন্থের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণিমা-মিলনে আবৃত্তি করিয়া সেই দৃশ্যের হাস্যরস স্ফুটতর করিতেন। সেই দৃশ্যটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"[স্থান নবরচিত কল্কিদেবের বিচিত্র আদালত। কাল—দ্বিপ্রহর বেলা, বিরাট্‌জনতা। সম্মুখে ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী।]

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে—
কল্কিদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে ;
সকলের তাঁর কাছে আজ বিচার হবে ;
ভাইগণ এইক্ষণ প্রস্তুত হও তবে ;—
চুপ করে' বসে' থাক, করো না ক গোল ;
সকলেরই ডাক হবে—(ঢেঁড়াদারকে)
বাজারে ভাই ঢোল। [দামামা ধ্বনি]
যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,
করেছেন যাঁরা হিন্দুসমাজ-বিভ্রাট,
দেবেন তাঁদের সাজা দেব-কল্কিসম্রাট্‌,
—রাজার উপর রাজা যিনি, লাটের উপর লাট।
নয়ক এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল,
এবার শাস্তি শূল বাবা—(ঢেঁড়াদারকে)
বাজারে ভাই ঢোল। [দামামা ধ্বনি]

বিলেত ফের্ত্তাচয়, দেখবে কি হয় ;
বড় পা ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে চুরুট্ খাওয়া নয়।
চোক বুজে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়।
নব্য-হিন্দু লুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয় ?
দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর ঝোল—
নেও এবার ঠেলা সব—(ঢেঁড়াদারকে)
বাজারে ভাই ঢোল। [দামামা ধ্বনি]
গোঁড়া হিন্দুরাই হাস্‌ছ কি ছাই !
ছেলেবেলার খাদ্য বুঝি মনে নাই ভাই ?
পণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাই,
শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিত্রাণ নাই—
হাজার নাড় টিকি, হাজার বল হরিবোল ;
রক্ষা নাই কোন দিকে—(ঢেঁড়াদারকে)
বাজারে ভাই ঢোল। [দামামা ধ্বনি]
এই বঙ্গদেশ, আজ হবে শেষ ;
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলযোগ বেশ ;
তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ ;
তাই এসেছেন কল্কি—ব্রহ্মারই আদেশ—
ঐ শোন কল্কিদেবের আগমনের রোল ;
নিজের নিজের পথ দেখ—(ঢেঁড়াদারকে)
বাজারে ভাই ঢোল।
[দামামা ধ্বনি ও উভয়ের প্রস্থান]"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'কল্কি-অবতার' লিখেন, তখনও তিনি, সমাজ যে তাঁহাকে ক্রোড়ে লয় নাই সে কথা ভুলিতে পারেন নাই। প্রত্যুত সে দুঃখ,

অভিমান ও তীব্র অন্তর্দাহ তখনও তাঁহার মন তিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পুস্তকখানি একটু অবহিত হইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একঘরে প্রবন্ধে ও কল্কি-অবতার প্রহসনে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই—প্রভেদ এই যে একটী গালাগালি, অপরটী ব্যঙ্গের ও শ্লেষের কশাঘাত! একটীর কটূক্তি কেবল গোঁড়া সমাজপতিদের উপর প্রযুক্ত, অপরটীর ব্যঙ্গ সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ভণ্ডামির উপর ব্যবহৃত। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই গল্প করিতেন যে, তাঁহার "একঘরে" প্রকাশিত হইলে কোনও ভদ্রলোক ভূতপূর্ব্ব ক্যানিংলাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী যোগেশ বাবুর দোকানে আসিয়া ঐ পুস্তকখানি কিনিয়া দোকানে বসিয়া উহার আদ্যন্ত পাঠকরেন; পরে যোগেশ বাবুর সম্মুখেই ঐ পুস্তকখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া জুতার তলায় সেই পত্রখণ্ডগুলি নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া উঠিয়া যান! কল্কি-অবতারে, একঘরের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা বজায় আছে ; কিন্তু ব্যঙ্গের পোষাক পরিয়া তাহা এরূপ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে যে, দ্বিজেন্দ্রের বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাঠক রাগ করিবেন কি হাসিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিবেন না। সম্ভবতঃ মনের মধ্যে 'কিলটী চুরী' করিয়া বাহিরে হাসিয়া ফেলিবেন। "একঘরে" পাঠ করিয়া কবির হিন্দুসমাজভুক্ত আত্মীয়েরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু "কল্কি-অবতার" পাঠ করিয়া রক্ষণশীল সমাজের নেতা "বঙ্গবাসী"ও লিখিয়াছিলেন—"এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই।" কবির পরিহাসরসিকতার সাফল্যের ইহা একটী উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। একঘরের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা কল্কি-অবতারে একাধিক স্থলে আছে। এস্থলে দুইটী উদাহরণ দিলাম—

(১) কিসের প্রায়শ্চিত্ত! theft murder ও করিনি
কারুর wife seduce করে নিয়ে আসিনি

তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই—
আসল এ sin গুলোর জন্যে। প্রায়শ্চিত্ত চাই
মুরগী আর শূকর খেলে, বিলেত গেলে চলে,
কিম্বা বাপ cholera কি বাজ পড়ে মলে।
এ প্রায়শ্চিত্তর অর্থ যে কি পাইনেক খুঁজে,
এ প্রায়শ্চিত্তর value বা কি উঠিনিও বুঝে
A society মানবে কে ? Priests রা সব চোর
আর এ society ও আজ rotten to the core.

(২) হাঁস খেলে দোষ নাই মুর্গী খেলে দোষ
প্যাঁজ খাওয়া দোষ, আর হিং খাওয়া নয় ;
চীন গেলে ধর্ম্ম থাকে, বিলেত গেলে যায়।

'একঘরে' পুস্তকে দ্বিজেন্দ্র যে অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনায় উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলির ভাষা নিতান্ত নিরীহ বোধ হইবে, অথচ 'একঘরে' পাঠ করিলে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাঠকের মনে লেখকের উপর যে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে, কল্কি-অবতারের রহস্যে সেরূপ করে না। কল্কি-অবতারের কবিতা 'সমিল গদ্য' বলিলেই হয়, কিন্তু সেই মিলের অপ্রত্যাশিত ও নিপুণ শব্দচাতুর্য্যে বক্তব্যের হাস্যরস অধিকতর উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কল্কি-অবতারের নিরীহ হাস্য ও ব্যঙ্গের নূতন ভঙ্গী গুণগ্রাহীর নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। Englishman লিখিয়াছিলেন ঐ পুস্তকের রচনা "wonderfully epigramatic and witty."

"কল্কি-অবতার" এ "Reformed Hindoos" "আমরা পাঁচটী ইয়ার" 'বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল' ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রের সাতটী বিখ্যাত হাসির গান আছে। সেই হাসির গানের নূতন রসের আস্বাদ পাইয়া বঙ্গসমাজে

আনন্দের অভিনব উৎস উৎসারিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রের জয়-জয়কার ধ্বনিত হইয়াছিল।

বিরহ—কল্কি-অবতার প্রকাশিত হইবার দুই বর্ষ পরে, ১৩০৪ সালে, 'বিরহ' প্রকাশিত হয়। এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাখানি দ্বিজেন্দ্রলাল "কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে" উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গপত্রে দ্বিজেন্দ্র লিখিয়াছেন—"বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্য-গীতির পক্ষপাতী, তাই এই রহস্য-গীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল। আপনি ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ বিষাদ-বেদনাপ্লুত বিরহের করুণ গাথা গাহিয়াছেন। আমি "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" হইয়া বিরহের রহস্যের দিক্‌টা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে। * * আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের হাস্যকর অংশটুকু দেখানো।"

এই পুস্তকখানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। এইখানিই থিয়েটারে অভিনীত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পুস্তক। এই পুস্তক অভিনয়ের প্রথম রজনীতেই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যালয়ের দর্শকগণের নিকট অসাধারণ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। অভিনয়স্থলে সে রজনীতে অনেক গণ্যমান্য ও ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রীতি প্রকাশ করেন।

বিরহ নাটিকা দ্বিজেন্দ্রলালকে যে শুধু রঙ্গমঞ্চ হইতে বিজয়মাল্য পরাইয়া দেয় তাহা নহে, সাহিত্যিকদিগের নিকটও এই পুস্তকখানি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক পুস্তক বলিয়া সমাদৃত হয়।

এই পুস্তকে "ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে," "তোমার বিরহে সইয়ে দিবানিশি কত সই"—বিখ্যাত হাসির গীত এবং

(চার্ব্বাক দর্শনের ও ওমার খায়েমের নীতির পরিপোষণ করিয়া লিখিত) "হেসে নেও এ দুদিন বৈত নয়" সুন্দর গীতটী স্থান পাইয়াছে।

ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে 'বিরহ' অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই বিরহের হাসির গানগুলি বাঙ্গালী সমাজে পরিচিত হইয়াছিল ও শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সেই জন্য 'বিরহ' নাটিকাখানি রঙ্গালয়ের দর্শকদের নিকট একেবারে নূতন ঠেকে নাই এবং তাহারা অপ্রত্যাশিত ভাবে গ্রহণ করে নাই ; কিন্তু ঐ পুস্তকখানি দর্শকেরা—অমৃত বাবুর ভাষায়—"নিয়েছিল"।

ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার—এই প্রহসনখানি ১৩০৭ সালে রচিত এবং ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

এই প্রহসনের উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার তদীয় "সুহৃদ্বর শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন মহোদয়"কে লিখিয়াছিলেন--"প্রহসনখানিকে উদ্দেশ্য হীন বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ, কারণ তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গৌরবের হেতু না থাকিলেও সাধারণের পক্ষে যেটুকু আমোদ সেই টুকুই nett লাভ। তবে যদি তুমি ইহার মধ্যে কোন গূঢ় ও গুরু উদ্দেশ্য দেখ তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় As you Like it এর Duke এর ন্যায় একজন মহাত্মা ব্যক্তি যিনি

"Found tongue in trees, books in the running brooks
Sermons in stones and good in everything."

এই প্রহসনে দ্বিজেন্দ্রলালের "পারত জন্ম না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা" "হতে পার্ত্তাম আমি মস্ত একটা বীর" "তারেই বলে প্রেম, যখন থাকেনা futureএর চিন্তা থাকে না ক shame" প্রভৃতি নির্ম্মল হাস্যরসাত্মক সর্ব্বজনসমাদৃত গানগুলি আছে। কিন্তু এই প্রহসনের ঘটনাপরম্পরা হাস্যোদ্দীপক হইলেও এবং তাহাতে নীতি শিক্ষার উপাদান থাকিলেও

এই পুস্তকের হাস্যরস নির্দ্দোষ বলা যায় না এবং এই পুস্তকে দ্বিজেন্দ্র-লালের অনাবিল ব্যঙ্গের সুনাম রক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা রুচিবিকারগ্রস্ত নহেন তাঁহাদেরও এই প্রহসনের আখ্যান-বস্তুর পরিণাম অপ্রীতিকর এবং আবিল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রায়শ্চিত্ত—এই পুস্তকখানি ১৩০৮ সালে মাঘ মাসে প্রকাশিত এবং ক্লাসিক থিয়েটারে "বহুৎ আচ্ছা" নামে অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্র-লাল এই পুস্তকখানি তদীয় "বাল্যবন্ধু" ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "করকমলে" উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে লিখিয়া-ছিলেন—"বিলেতফের্ত্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা তোমাকে স্পর্শ করে নাই। * * * আমি যে মত এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি, তুমি নিত্য বেশে, আচারে ও কার্য্যে তাহা দেখাইতেছ।"

এক বৎসরের মধ্যেই ১৩০৯ সালের পৌষ মাসে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"ক্লাসিক থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ পুস্তক খানিকে অভিনয়ের পক্ষে অতি দীর্ঘ বিবেচনা করিয়া অভিনয় কালে প্রথম সংস্করণের কতক অংশ বর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আমিও উক্ত অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি।"

ইহা দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ একখানি হাস্যরসাত্মক নাটক। ইহাকে "প্রহসন" বলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তি ছিল। তিনি উক্ত ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "অনেকে এই পুস্তকখানিকে প্রহসন বলে অভিহিত করেন। আমার বিবেচনায় সেটি একান্ত ভ্রম। হাস্যবহুল নাটক মাত্রই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে Moliere এর Comedy গুলিও

প্রহসন। আমি এই গ্রন্থে বিলেতফের্ত্তা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটী ছবি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা অতিরঞ্জিত বটে। কিন্তু মূল কেন্দ্রীয় ছবিটি ব্যক্তিগত না হইলেও প্রাকৃত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

এ পুস্তকখানি বিদ্বজ্জনসমাজে সমধিক আদর পাইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আমি উক্ত সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ।"

এই পুস্তকখানি দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ববর্ত্তী হাস্যরসাত্মক নাটক অপেক্ষা সমধিক আদর পাইবার প্রধান কারণ ইহার নির্ম্মল পরিহাস। এই পুস্তকে বিলাতী সভ্যতার ও আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী সমাজের উপর ব্যঙ্গের কশাঘাত আছে বটে কিন্তু সে পরিহাস সর্ব্বত্র উপভোগ্য—সুরুচিসঙ্গত। এই নাটকেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত হাসির গান "আমরা বিলেতফের্ত্তা কভাই," "নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু কর" "কটি নবকুল কামিনী! অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি, মন্দ-গামিনী" এবং "চম্পটির দল আমরা সবে," প্রথমে প্রকাশিত হয়। এই নাটক পাঠ করিয়া কোন "নবকুলকামিনী"র বা নব্য হিন্দুর চৈতন্য হইয়াছিল কি না বলা যায় না। কিন্তু শুনা যায় কোনও কোনও 'চম্পটি'র সত্য সত্যই আচার ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি 'চম্পটি'র মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—"দেখছি যে বিলাতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

ব্যঙ্গ-কবিতা ও হাসির গান *

আষাঢ়ে—সন ১৩০৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতা (burlesque) 'আষাঢ়ে' প্রকাশ করেন। যে সময়ে তিনি প্রহসনগুলি লিখিতেছিলেন এবং হাসির গানে তাঁহার জয় জয় কার হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়েই তিনি "আষাঢ়ে"র ব্যঙ্গ কবিতাগুলি মাসিক পত্রে প্রকাশ করিতেছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"আষাঢ়ে"র রচনা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখিয়াছেন—"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্য-রসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া "আষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি।" (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

'আষাঢ়ে' প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যে যে একটী নূতন জিনিস আসিল একথা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। সাহিত্য-সংসারে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরীয়ান কলিকাতা গেজেটে লিখিলেন—

'It is a burlesque written with exquisite skill and inimitable humour. The doggrels composing the poem

* এই অধ্যায়টী মৃজাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভায় (২৮শে মে, ১৯১৬) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সভাপতিত্বে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

seem to be admittedly suited to the description of the themes selected. The writer apparently is a master-hand in this class of composition." লেখক যে শক্তিশালী এবং রচনা যে পাকা হাতের তাহা সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন।

কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ "সাধনা" পত্রে এই পুস্তকের একটী সহৃদয় সমালোচনা লিখিয়া কবিতার দোষ গুণ উভয়েরই বিচার করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। * * কিন্তু ইহা নিশ্চয়, বাংলা পাঠক-সমাজে তাঁহার নাম গোপন থাকিবে না।

"আষাঢ়ে কতকগুলি হাস্যরস-প্রধান কবিতা। তাহার অনেক-গুলিই গল্প আকারে রচিত। গল্পগুলিকে 'আষাঢ়ে' আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার পাঠকদিগকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। * *

"বইখানির মধ্যে গায়ে বাজে এমনতর কৌতুকও আছে। ইহার শেষ কবিতার নাম "কর্ণ-মর্দ্দন"। কিন্তু এই মর্দ্দন ব্যাপারটি সকল কবিতাতেই কিছু না কিছু আছে। গল্পপ্রসঙ্গে সামাজিক কপটতার যে অংশটাই কবির হাতের কাছে আসিয়াছে সেইখানেই তিনি একটুখানি রহস্য টিপ্পনী প্রয়োগ করিয়াছেন।

"এরূপ প্রকৃতির রহস্য-কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং "আষাঢ়ে"র কবি অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা, ভঙ্গী, বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।

"ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া উচিত

মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা বর্ণনা করিতে মেঘনাদ-বধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন ?'

"ভাষা সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে তিনি কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই এবং দিলেও আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম না। পদ্যকে সমিল গদ্য রূপে চালাইবার কোন হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়, কারণ কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতঃই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। * * * অবশ্য কোন নূতন ছন্দ প্রথম পড়িতে কষ্ট হয়, * * * কিন্তু আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্ব্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যক মত কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমিবেশি করিয়া চলিতে হয়। * * * অথচ শোনাইবার যোগ্য এমন কৌতুকাবহ পদার্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। * * * আবৃত্তির পক্ষে কৌতুক কবিতা অতি উপাদেয়। অথচ "আষাঢ়ে"র অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।

"অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মত আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। * * তাঁহার "বাঙ্গালী মহিমা" "ইংরাজ-স্তোত্র", "ডিপুটী-কাহিনী" ও "কর্ণবিমর্দ্দন"

বিনা বহু বাক্যব্যয়ে অতি পারিপাটী
সোজা গিন্নির বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাটী।"

এই "তবলা কি অবলা"য় কেমন সুন্দর antithesisটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ ছবি অন্য সাহিত্যে বড় বেশী পাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।" (ভারতী, আষাঢ়, ১৩২০)

হাসির গান--পূর্ব্বেই বলিয়াছি "আষাঢ়ে" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্র যে সকল হাসির গান রচনা করেন সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি দুইখানি প্রহসন প্রকাশ করেন। তাহার পরেও তিনি যে সকল হাসির গান রচনা করেন সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার অপরাপর প্রহসন রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে হাসির গানই দ্বিজেন্দ্রের প্রহসনের প্রাণ। বহুবর্ষ পরে দ্বিজেন্দ্রের প্রহসনে ও নাটকে সন্নিবেশিত সমস্ত হাসির গান একত্র করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত "হাসির গান" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই "হাসির গান" বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে দ্বিজেন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি—এই হাসির গানের প্রচারে অদ্বিতীয় হাস্যরসিক কবি বলিয়া দ্বিজেন্দ্রের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হাসির গান রচনা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে লিখিয়া গিয়াছেন—"সেই সময়ে (বিলাত হইতে আসিয়া) আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় কোন বাঙ্গালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি

একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।" (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

নাট্যকার-কুলতিলক দীনবন্ধু যেমন Postal Depertmentএ কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বেড়াইতেন এবং যেখানে যাইতেন সেইখানেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ হাস্যকৌতুকে আসর জমাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন, দ্বিজেন্দ্রলালও সেইরূপ আবকারী ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্মে যেখানে যাইতেন সেইখানেই হাসির গান গায়িয়া তাঁহার হাস্যগীত-প্রতিভায় সকলকে আকৃষ্ট করিতেন। দ্বিজেন্দ্রের হাসির গান যে অতি অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার একটী প্রধান কারণ দ্বিজেন্দ্রের এই পরিদর্শক কর্ম্মে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার সুযোগ। অবশ্য দ্বিজেন্দ্র সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন বলিয়াই সেই সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

যে সময়ে দ্বিজেন্দ্রের হাস্যরস-প্রতিভার উন্মেষ হয়, সেই সময়ের উল্লেখ করিয়া "আর্য্যাবর্ত্ত" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) লিখিয়াছেন—"এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যিক সমাজের অবস্থা সাহিত্য সমালোচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। * * * বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মত সাধনা করিয়া যে ভাবগঙ্গাপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তখন তাহার পুণ্যধারা শত শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র সাহিত্যকে স্নিগ্ধশ্রী ও সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে; কিন্তু তখন আর একজন সেই শত ধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন না। * * * যে ইণ্ডিয়া ক্লাব আজ জীবিত, কিন্তু জীবন্মৃত, * * সেই ইণ্ডিয়া ক্লাব তখন বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মিলন স্থান। এই ইণ্ডিয়া ক্লাবের কতিপয় সভ্য আবার 'ডাকাইত ক্লাব' সংগঠিত করিয়া সভ্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের ও সৌহার্দ্দ্যের উপায় করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া ক্লাবে ও ডাকাইত ক্লাবে সাহিত্যিক

আলোচনা হইত। কখন ক্লাব-গৃহে, কখন উদ্যানে, কখন বা নৌকায় সম্মিলিত সভ্যগণ সঙ্গীত সাহিত্যাদির আলোচনা করিতেন। এই সকল সম্মিলনে দ্বিজেন্দ্রলালও থাকিতেন, রবীন্দ্রনাথও থাকিতেন। একের উপর অপরের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল বা কোনও প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না কে বলিবে।"

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন—"সাহিত্যাকাশে তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) যে সময় সমুদীয়মান, মধুসূদন সে সময়ে পরলোকগত। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সে সময়ে জীবিত থাকিলেও, কবিবর বিহারিলালের শিষ্যবর্গের নবোদয়ে তাঁহাদের 'জারিজুরী' তখন কমিয়া আসিতেছিল। * * সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য কাহারও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, কাহারও মতামতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিলেন। এই নূতন পথে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রতারিত হন নাই। তাঁহার হাসির গানের নূতনতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল।" (অর্চ্চনা, আষাঢ়, ১৩২০) পক্ষান্তরে মনস্বী সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন তখন বাঙ্গালায় ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল; নব্যহিন্দু কেবল আর্য্যামীর আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজসংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন, এবং রাজনৈতিক-সম্প্রদায় কংগ্রেশের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতে-ছিলেন। "ন্যাকামী"র প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানী করিয়া, দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙ্গের সুরে

হাসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান বাঙ্গালা ভাষায় যেমন অপূর্ব্ব, সে গানের সুর ও গীতপদ্ধতিও তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গায়িতেও তিনি স্বয়ং তেমনি অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকল জেলায় সকল সমাজে, তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গায়িয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নূতন অম্লমধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। * * ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, নব্যহিন্দু, বিলাতফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশহিতৈষী, রাজনীতিক আন্দোলনকারী, বাবু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, হাকিম—বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর সকল রকম ন্যাকা ধরিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ কেহই তাঁহার প্রতি রুষ্ট নহে, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাকে না। * * * দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল * * বাঙ্গালীর পক্ষে উহা নূতন সামগ্রী; পূর্ব্বে উহা বাঙ্গালায় ছিল না।" (সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২০)

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-কবিতা ও হাসির গান বঙ্গসাহিত্যে যে এক সময়ে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় দ্বিজেন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় সভাপতির আসন হইতে তাঁহার মণিমুক্তাখচিত ভাষায় বলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আলোক, সাহিত্যের প্রায় সকল অংশেই পড়িয়াছিল, কিন্তু হাসির গানই তাঁহাকে সার্থক সাহিত্যিক বলিয়া, বঙ্গবাণীর ধন্য সেবক বলিয়া, তাঁহার যশোপুষ্পের মনোমদ সৌরভ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। * * * অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, উজ্জ্বল প্রতিভা, অসামান্য শব্দসম্পদ যেমন তাঁহার ব্যঙ্গ রচনায়, হাসির গানে প্রকাশিত হইয়া আছে, এমন আর কোথাও কোন বিষয়ে হইতে পারে নাই। * * *

'আমরা পাঁচটী এয়ার—দাদা আমরা পাঁচটী এয়ার', 'তারেই বলে প্রেম', 'তোমারই বিরহে সইরে' প্রভৃতি গানগুলি নিছক হাস্য। 'We are reformed Hindoos, "বিলাত ফের্ত্তা কভাই' প্রভৃতি গানগুলির ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ততটা উদ্দেশ্যহীন নহে—সেই ব্যঙ্গের পশ্চাতে তীব্র ভৎর্সনা, মর্ম্মন্তুদ বেদনা, লুক্কাইত অশ্রু আছে। আবার 'ইরাণদেশের কাজি', 'পাঁচশ বছর সয়ে আছি', 'আজি এই শুভদিনে,' প্রভৃতি গানগুলিতে গভীর শ্লেষ আছে। ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে এক পূর্ণিমা-মিলনে দ্বিজেন্দ্রের মুখে শেষোক্ত গান কয়টী শুনিয়া স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "এ কি হাসির গান? এ যে cruellest tragedy".

দ্বিজেন্দ্রের হাসির গানের ব্যঙ্গ কশাঘাতে কাহারও কাহারও স্কন্ধ হইতে অনেক কু-অভ্যাসের ভূত নামিয়া গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দ্বিজেন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় সুবক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছিলেন "একবার শ্রীরামপুরের স্বর্গীয় নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের শ্বশুর ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়েন। সেখানে গোস্বামী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের মুখে তাঁহার হাসির গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, দ্বিজেন্দ্র অপর গান না গায়িয়া তাঁহার "নন্দলাল'' গীতটাই নন্দলাল বাবুকে শুনাইয়া দেন। গোস্বামী মহাশয় বলিতেন যে সেই নন্দলাল গান শুনিয়া তাঁহার স্বভাবের অনেক দুর্ব্বলতা শুধরাইয়া গিয়াছিল। অনেকের ধারণা আছে যে ঐ নন্দলাল গীতটী দেশব্রত, ভারতের অদ্বিতীয় বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিয়াই লিখিত। তাঁহারা শুনিলে বিস্মিত হইবেন, দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী পত্রে সেই নন্দলাল গীতটীরই বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়।

সাহিত্যরথী পাঁচকড়ি বাবু লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ঠিক শ্লেষ বিদ্রূপ নহে, উহা কৌতুক মাত্র। সে কৌতুকের অন্তরালে স্তরে স্তরে করুণা অনুকম্পা সমবেদনা যেন সাজান রহিয়াছে। শ্লেষ বিদ্রূপ যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা হেন অভিজ্ঞতার এবং পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীন জ্ঞানে শ্লেষ বিদ্রূপের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। * * * কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদের লইয়া সরলহাসি হাসিতেন, স্বয়ং তাহাদের দলে মিশিয়া যাইতেন। "আমরা সেজেছি বিলাতী বাঁদর"—এই এক 'আমরা' শব্দ প্রয়োগ করাতেই ইউরোপ অনুচিকীর্ষু বাঙ্গালী সাহেবদের প্রতি কি প্রগাঢ় অনুকম্পা প্রকাশ করা হইয়াছে। * * * Reformed Hindoos, ইরাণদেশের কাজি, ইংরেজিনবিশের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন প্রিয়তার গানে, নন্দলালের দেশহিতৈষণায়, 'পাঁচশ বছর এমনি করে' গানে, প্রত্যেক হাসির গানে, প্রত্যেক ব্যঙ্গে, প্রত্যেক কৌতুকে তিনি নিজেকে বাদ দেন নাই, নিজেকে জড়াইয়া কৌতুক করিয়াছেন। * * * তিনি বাঙ্গালী সঙ্গীতের মহিমা বুঝিতেন, বিলাতী সঙ্গীতের বিশিষ্টতার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি এই দুইটাকে বেমালুম মিলাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গানের সকল সুরেই ইংরাজি ভাঁজ আছে। বিশেষতঃ Reformed Hindoos, ইরাণদেশের কাজি প্রভৃতির ছাঁকা বিলাতী সুর। কিন্তু এ বিলাতী সুর বাঙ্গালীর কানে বাজে না, সবাই আনন্দে ঐ বিলাতী সুরে গান গায়িয়া আনন্দ উপভোগ করেন। যাঁহারা হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্ত দেশের সুর যাঁহাদের কানে বাজে, তাঁহারাও দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুনিয়া কখনই ব্যথিত বা মর্ম্মাহত হন নাই। ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। প্রতিভা বলি তাহার, যে আধুনিক ইংরাজি ভাবভঙ্গী রীতি পদ্ধতিকে বেমালুম

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার সহিত মিলাইয়া চালাইতে পারে। এ পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা অদ্বিতীয়—অপরাজেয়।" (মানসী, আষাঢ়, ১৩২০)

মনস্বী ব্যারিষ্টার শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই মর্ম্মে বলেন যে দ্বিজেন্দ্রের হাসির গানে কি কি আছে, কিসে কিসে মিলাইয়া কি উপায়ে তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সকলই বুঝিতে পারে—কিন্তু এপর্য্যন্ত সে হাসির গানের অনুকরণ হইল না—তাহাতে বুঝা যায় দ্বিজেন্দ্রের মধ্যে এমন কিছু ছিল—যাহা অপর কাহারো নাই—তাঁহার 'নিমক' ছিল। সেটুকু তাঁহার নিজস্ব—অননুকরণীয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

——•:•——

গীতিকাব্য—মন্দ্র

মন্দ্র—যে সময়ে হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রের জয়-জয়কার উঠিয়াছিল, সেই সময়ে (১৩০৯ সালে) তাঁহার 'মন্দ্র' নামক গীতিকাব্য প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি তিনি কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে গ্রন্থখানিকে "অকিঞ্চিৎকর কবিতা-সমষ্টি" বলিয়া উল্লেখ করেন।

রবীন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'এর (নবপর্য্যায়) এই কাব্যের সমালোচনা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান

করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল্ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটী অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

"সে সাহস কি শব্দনির্ব্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।

"কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষ্যান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক-মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য, বিস্ময়, কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

"এইরূপে মন্দ্র কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই; ভাবের অভাবনীয় আবর্ত্তনে তাহার ছন্দ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলঙ্কারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

"কিন্তু নর্ত্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে মন্দ্র কাব্যের কবিতা-গুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিস্ময়, সমস্তই পুরুষের, তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সরলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোন নজর নাই।

* * *

"দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়া-ছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাববিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন—পূর্ব্বে যাহার

দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি—সুখের সেবা প্রেমের নয় ;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি সে সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়।”

এই কাব্যের তাজমহল কবিতায় কবি মোগল ও আর্য্যজাতির যে চমৎকার তুলনায়-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—

"বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাব-স্নান মর্ম্মর আগারে ;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর সৌরভে,
পোলাও কালিয়া খাদ্য ; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন ;
উদ্যান ; নির্ঝর ; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য ; নূপুর নিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে ;
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ ;
মরণের পরে স্বর্গ ;—তাও সেই রূপসীর বক্ষ।

"আর আর্য্য জাতি ? ঠিক তার বিপরীত।
রূপ—প্রকৃতির শোভা ; রস—পৃথিবীর ;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু ; শব্দ—নিকুঞ্জ সঙ্গীত ;
গন্ধ—যা বহিয়া আনে উদ্যান সমীর।
পুণ্য—নদী জলে স্নান ; অঙ্গে শুভ্রবাস ;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত ; শয্যা—ব্যাঘ্র চর্ম্ম ;
আবাস—কুটীর কক্ষ ; চরম বিলাস
জীবনের—তীর্থ যাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম্ম ;
এ সংসার—মায়া ; মৃত্যু—মোক্ষ দুঃখহীন
শ্মশানে, নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়া পরব্রহ্মে লীন।”

কবি এই পুস্তকে যে সুখ-মৃত্যুর কামনা করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের অন্তিমঘটনায় সেই কবিতার করুণ ভাব মর্ম্মস্পর্শী আকার ধারণ করিয়াছে—

"তবে এক সাধ আছে মরিব যখন কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া পুত্র কন্যা গণ ;
আর বন্ধু যদি কেহ করে ভক্তি করে স্নেহ
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধু জন ;
খুলে দিও দ্বার !—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর—আকাশের আলো।
দেখি যেন শ্যামধরা শস্যভরা পুষ্পভরা
এতদিন যাহা দিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদু মন্দ পবনে চামেলি গন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ; আমি ও-পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নাট্য-কাব্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল পদ্যে তিনখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন—(১) পাষাণী, (২) সীতা, (৩) তারাবাই। এই পরিচ্ছেদে সেই তিনখানি পুস্তকেরই কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

পাষাণী—এই নাট্যকাব্যখানি ১৩০৭ সালে আশ্বিন মাসে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। কবি এই পুস্তকখানি তাঁহার বন্ধু "শ্রদ্ধাস্পদ, উদারচরিত, সরল, বিদ্যোৎসাহী, শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই সি এস মহোদয়"এর করকমলে উৎসর্গ করেন। পাষাণী নাটকে কবি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ গৌতমের এক মহিমান্বিত অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—এবং এই কাব্যখানি শব্দ-বৈভবে, রচনানৈপুণ্যে ও চরিত্র-চিত্রণে অনিন্দ্যসুন্দর। ইহার অমিত্রাক্ষর কবিতা সুললিত ও সুখপাঠ্য। এই নাট্যকাব্যখানি পাঠে ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মুগ্ধ হইয়া নব্যভারতে আবেগবিহ্বল স্তুতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"আজি অন্ধকার গহ্বরে একখানি ছবি দেখিলাম, অপূর্ব্ব সুন্দর মহান্, ফিডিয়াসের ভাস্কর কর্ম্ম, রাফেলের চিত্র! * * মহর্ষি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপীয়রের নিন্দার বিষয় নহে।" কিন্তু এই পুস্তকের বিরুদ্ধ-সমালোচনাও হইয়াছিল। কবি নিজেই মন্দ্র কাব্যের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে সেই সমালোচনার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"কোনও এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত "পাষাণী" নাটকের সমালোচনায় কহিয়াছিলেন যে আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যে হেতু অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী রূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্মীকির রামায়ণ খানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই * * *। আমি শুদ্ধ দায়িত্ব-শূন্য সমালোচনার উদাহরণ স্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।"

অনেকের ধারণা, পাষাণী নাটকে কবি অহল্যার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক চরিত্র হইলে কবির গৌরবের বিষয় হইত সন্দেহ নাই; এবং সে চিত্র পৌরাণিক বলিয়া হিন্দুদের প্রাণে আঘাত করিতে পারে এই আশঙ্কায় নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ এই নাটকের অভিনয় করেন নাই। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে। একবার ষ্টার থিয়েটারে ঐ নাটিকাখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, ঐ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন—নতুবা নহে। অমৃত বাবু বলেন ঐ নাটিকায় দেবদেবীদের লইয়া যে ব্যঙ্গ রঙ্গ আছে—নাটিকা-খানি হাস্যরসাত্মক হইলে তাহা দোষের হইত না—কিন্তু পাষাণীর মত Serious (গম্ভীর) নাটিকায় ওরূপ পরিহাস নিতান্ত নিন্দনীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃত বাবুর কথা মত নাটিকার পাত্র-পাত্রীদের নাম বদলাইয়া দিতে সম্মত হয়েন নাই। ঐ নাটিকাখানি কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। কেবল একবার রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী মহাশয়দের উদ্যোগে স্থানীয় Happy Club কর্ত্তৃক উহা অভিনীত হয়। রাণাঘাটে অভিনয় স্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বিজেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণাধিক? উঠ তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ,
পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু
আমিও রাখিব পতিসত্য! কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারণে! উঠহে যশস্বী
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে,
তুমি দলি' তাহে চলে যেও সুখে
যশের মন্দিরে, তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা! সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের! চিন্তা কর দূর
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর।"

অবশ্য সীতার এই মহিমময় আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আলোকে রামের চরিত্র ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সীতার বনবাসের ঘটনায় রামের চরিত্রকে আমাদের একালের চক্ষে ভবভূতি যত খর্ব্ব করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র সেরূপ করেন নাই। এবং মহর্ষি বাল্মিকীও রামকে শাপগ্রস্ত ও মতি-ভ্রান্ত করিয়াও এস্থলে কলঙ্কের কালিমা হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সীতা-চরিত্রের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি "কালিদাস ও ভবভূতি" গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—"আর সীতা—আকাশ-পবিত্র চরিতা, নক্ষত্রের মত ভাস্বরা, শেফালিকার মত সুন্দরী, যূথিকার মত নম্রা, জগতে অতুলনীয়া সীতা, তাঁহার জন্য পশু-পক্ষী কাঁদে, কবি কাঁদিবেন না? ইহার জন্য দেবোপম রামের উপর কবির একটা রোষ আসিয়া পড়ে। ভবভূতিরও আসিয়াছে। সেই রোষ বাসন্তীর মুখে

আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।” এরূপ স্থলে মহাকবি ভবভূতির যে দশা ঘটিয়াছিল, সহৃদয় দ্বিজেন্দ্রের নিজেরও যে সেই দশা ঘটিবে ইহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। পরন্তু একালের মাপ-কাঠিতে পরিমাণ করিলে দ্বিজেন্দ্রের চক্ষে রামচন্দ্রের চরিত্র অধিকতর খর্ব্ব দেখাইবারই কথা। এই কথাটি স্মরণ রাখিলে দ্বিজেন্দ্র কি পরিমাণে আত্মসম্বরণ করিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তদীয় “বঙ্গবাণী” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন “পাষাণীর কবি আর একটী মাত্র কাব্য লিখিয়াছিলেন—সীতা, এই কাব্যদ্বয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে বলিয়াই আশা করিতেছি। উহাদের শিল্পআত্মা দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে দুর্ল্ভ এবং দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকিবে। আমরা এখন সঙ্গীত সাধনাতেই অবস্থিত, ছন্দের সাহায্যে নাটকীয় জীবন অথবা ভাব-সাধনার শক্তিটুকু সুলভ হইয়া পড়িতে, কিংবা উহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেও দীর্ঘপথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।”

তারাবাই—এই নাট্য-কাব্যখানি ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়। কবি এই গ্রন্থ “মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের কর-কমলে” উৎসর্গ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন “এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত ‘রাজস্থান’ হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে, চারণ কবি দ্বারা রাজপুতদিগের মনোরঞ্জনার্থ গীত হইয়া থাকে। * * * আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই মহিমময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই। * * * আমি যদিও এ নাটকের মূল বৃত্তান্ত রাজস্থান হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের

সহিত এই নাটকের অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ নাটক ইতিহাস নহে।

সঙ্গর চরিত্রের নিকটে পৃথ্বীর চরিত্র প্রথমে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গ উদার, পৃথ্বী রাজ্যলোভী। সঙ্গর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিলে পৃথ্বীর চরিত্র মলিন হইয়া যাইত। সঙ্গর চরিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াও গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-হানি করিয়াছে।"

কবি এই নাটকখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলেন—কিন্তু সেই ছন্দের বাক্যবিন্যাসে ও গতিতে মাইকেলের গুরুগম্ভীর ছন্দোমাধুরী নাই। ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ একাধিক সমালোচক দ্বিজেন্দ্র-লালকে এই ত্রুটী দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং কবি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উক্ত দোষ ব্যতীত দ্রুত কথোপকথনের পক্ষেও পদ্য অনুপযোগী। ইহার পরে বহুদিন তিনি আর পদ্যে নাটক রচনা করেন নাই। এই নাটকখানি "ইউনিক" থিয়েটারে অভিনীত হয়।

কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন—

"মন্দ্রে"র পর "তারাবাই" নামক একখানি নাট্যকাব্য প্রচারিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার প্রতিভা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হইলেও, ভাষার হিসাবে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ নহে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অভিনব অমিত্রাক্ষর রীতি প্রচলিত করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকটী আদৌ সুশ্রাব্য বা সুমিষ্ট করিতে পারেন নাই। ক্রিয়াপদের প্রসারণে কবিতা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। "তারাবাই" কাব্যের অমিত্রাক্ষরের আমি ইহাই সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী বলিয়া মনে করি। একটু নমুনা দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে—"হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে অতিথি দ্বাদশ দিন।" বিলম্বিত ক্রিয়াপদটী পূর্ব্বে না বসাইলে ইহা পদ্য

না গদ্য নির্ণয় করা নিতান্তই দুষ্কর হইত। সে যাহা হউক, "তারাবাই" এর ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের "মন্দ্র"কাব্য অপেক্ষা শ্রুতিকটু হইলেও ঘটনা-বিন্যাসে ও আখ্যানবস্তুর হিসাবে রঙ্গমঞ্চে 'তারাবাই' নাটকই দ্বিজেন্দ্র-লালকে দক্ষ নাট্যকাররূপে পরিচিত করাইয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্ত বা বহুত-আচ্ছা" ষ্টারে ও ক্লাসিক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলেও, নাট্যকার হিসাবে তারাবাই নাটকই দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-সমাজে নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা দান করে।" (সাহিত্য —পৌষ, ১৩২০)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-বিয়োগ।

বিবাহের পর ১৬ বর্ষ দ্বিজেন্দ্রের দাম্পত্যজীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে অতি-বাহিত হয়। সেই সময়েই তিনি অসামান্য-হাস্যরসিক কবি বলিয়া পরিচিত হয়েন এবং তাঁহার প্রহসন, ব্যঙ্গ-কবিতা, হাসির গান, নাট্যকাব্য-ত্রয়, আর্য্যগাথা ২য় ভাগ ও মন্দ্র রচিত হয়। নিজের ও পত্নীর রূপ যৌবন, সুন্দর প্রকৃতি, অনিন্দ্য স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা, পদমান্য, সর্ব্বোপরি পরস্পরের প্রতি আবেগময় ও গভীর ভালবাসা তাঁহাদের বিবাহিত জীবন সুখময় করিয়াছিল। সেই সুখভোগের মধ্যে বৈচিত্র্য দান করিবার জন্যই যেন বিধাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ক্ষণিক শোকের

আস্বাদ দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচটী সন্তান হয়, তাহার মধ্যে তিনটী অতি শৈশবে প্রাণত্যাগ করে—ইহাই দ্বিজেন্দ্রের দাম্পত্যজীবনে বিষাদের আস্বাদ। কিন্তু ইহাতে পতি-পত্নীর অনুরাগের বন্ধন নিবিড়তর করিয়াছিল—একমাত্র পুত্রসন্তান ও একটি কন্যাই তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সমস্ত অভাব পূরণ করিয়াছিল। পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমার (দ্বিজেন্দ্রের বড় আদরের "মণ্টু") ১৮৯৭ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় এবং কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সুন্দর শিশু দুইটীকে লইয়া এবং পত্নীকে আদর্শ গৃহিণীভাবে পাইয়া দ্বিজেন্দ্রের সংসারযাত্রা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিধাতার অজ্ঞেয়-বিধানে দ্বিজেন্দ্রের ভাগ্যে "এত সুখ সহিল না"—নিয়তির এক নির্ম্মম ফুৎকারে তাঁহার সংসার-সুখের উজ্জ্বল দীপ হঠাৎ নিবিয়া গেল।

১৯০৩ খৃঃ ২৯শে নভেম্বর দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তৎকালে দ্বিজেন্দ্র নিকটে ছিলেন না। পূর্ণগর্ভা স্ত্রীকে কলিকাতায় রাখিয়া তিনি মফস্বলে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি তারযোগে সংবাদ পাইলেন তাঁহার স্ত্রী মরণাপন্না; আসিয়া দেখিলেন তাঁহার গৃহ শূন্য—তাঁহার অন্তর্বত্নী পত্নী হঠাৎ ৫ মিনিটের শোণিত-স্রাবে,—তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষা না করিয়াই—মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়, খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এই দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পীড়া এতই অতর্কিত ও সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ করে যে, তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার অবসর মাত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে দ্বিজেন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলেন, তিনি সেই সময়ে একদিন দ্বিজেন্দ্রের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন "তিনি তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বাটীতে পালঙ্কে বসিয়া আছেন, কখনও দুই একটি কথা বলিতেছেন। খুব লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সামান্য আর্দ্র হইতেছে। তিনি বলিলেন 'মনুষ্যের হৃদয় স্ত্রীলোকের মত, যুক্তি মানে না।' শোকের আর কোনও কথাই বলিলেন না।" দ্বিজেন্দ্রের স্নেহাস্পদ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বলেন, তাঁহার সহিত যখন দ্বিজেন্দ্রের এই দুর্ঘটনার পর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন দ্বিজেন্দ্র কর্ম্মস্থানে (আবকারী আপিসে) যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখের ভাব ক্রন্দনে স্ফীত ও আরক্তিম হইলে যেরূপ হয়—সেইরূপ। দ্বিজেন্দ্র কোন কথাই বলিলেন না, রসময় বাবু তাঁহার গাড়িতে উঠিয়া প্রায় এক মাইল পথ এক সঙ্গে যাইলেন—উভয়ের মুখে কোন কথাই বাহির হইল না।

দ্বিজেন্দ্র কিছুদিনের জন্য অবকাশ পাইবার আবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী বাদশা (Mr. K. J. Badshah I. C. S.) সাহেব তাঁহাকে ছুটী দিলেন না—বুঝাইলেন 'ছুটী লইলে তোমার মন আরও খারাপ হইবে—এ সময়ে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাই ভাল।' ১নং ঝামাপুকুর লেনের যে বাসাবাটীতে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল; সে বাটী ত্যাগ করিয়া তিনি আর একটী বাটীতে উঠিয়া গেলেন; কিন্তু কার্য্যে তখন তাঁহার মন লাগিল না। আবকারী ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্মে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে হইত—অথচ মাতৃহারা পুত্র-কন্যাকে অপরের নিকট পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিলীপকুমার তখন ৬ বর্ষ বয়স্ক এবং 'মায়া' পঞ্চমবর্ষীয়া শিশু মাত্র। সেইজন্য তিনি আবকারী বিভাগের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতাতেই প্রায় একবর্ষকাল—১৯০৪ খ্রীঃ অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন।

দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেন "দলে দলে দ্বিজেন্দ্রলালের গুণমুগ্ধ কত ব্যক্তি তৎকালে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা দান করিবার প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু অতুল প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল সান্ত্বনাদানের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনেক সময়ে একান্তই অশোভন ভাবে হাস্যালাপ করিতে থাকিতেন। কখনও বা সঙ্গীত-সুধায় সকলকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিতেন। সেই সময়ে একদা দ্বিপ্রহরে একাকী পাইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'অপনি এ সময়ে কি করিয়া অত হাস্যালাপ করেন, বুঝিতে পারি না।' তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল গলদশ্রুলোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—'সবই পারি, কিন্তু তার প্রসঙ্গ বা এই সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট মৌখিক সান্ত্বনা বাক্য আমার সহ্য হয় না। সে যে আমার কি ছিল তাহা তোমরা কি বুঝিবে?' এই কথা বলিয়া কবিবর পুত্র কন্যা দুইটীর হাত ধরিয়া গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিলেন।"

স্ত্রীবিয়োগের ৫ বর্ষ পরে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে একখানি সুরম্য দ্বিতল বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার পত্নী 'সুরবালা'র নামে সেই বাটীর নামকরণ করেন—"সুরধাম"। এই পত্নীর স্মৃতি-সৌধকে দ্বিজেন্দ্র যথার্থই সুরধাম বলিয়া কল্পনা করিতেন। নূরজাহান নাটকে যখন দ্বিজেন্দ্র মাতৃভূমিকে "অতুল চিরবিমোহন তুমি সুরধাম" বলিয়া বন্দনা করেন, তখন তিনি তাঁহার স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশমাতৃকাকে তাঁহার চিরদয়িত 'সুরধাম' নামে সম্ভাষণ করিয়া যথার্থ ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং সংসারের ভারপ্রাপ্ত হইয়া অল্পবয়সেই পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যে

উত্তরকালে কলিকাতায় উক্ত মূল্যবান্ বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন সে সমস্তই তদীয় পত্নী সুরবালার গৃহিণীপনার গুণে। সুরবালা অন্যায় অসঙ্গত সহ্য করিতে পারিতেন না, সেইজন্য দ্বিজেন্দ্রের সহিত তাঁহার কথান্তর হইত, কখনও কখনও মনান্তরও হইত। কিন্তু পতিপত্নীর সেই ক্ষণিক অভিমানজনিত কলহ বিবাদ ক্ষণিকেই মিটিয়া যাইত এবং তৎপরে উভয়ের অনুরাগ মেঘমুক্ত শরদম্বরের মত সুন্দর ও মধুরতর হইয়া ফুটিয়া উঠিত। পত্নীবিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্র দ্বিতীয়দার পরিগ্রহের জন্য একাধিকবার সনির্ব্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তিনি দৃঢ়তার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে একের মৃত্যুতে অপরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না; তিনি সে প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। তিনি আরও বলিতেন যে দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ করিয়া কেবল দরিদ্রবংশবৃদ্ধি করা বইত নয় —তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

সেই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে হারাইয়া দ্বিজেন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহার চিত্র দ্বিজেন্দ্র নিজেই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্র 'হতভাগ্য' নামক কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"একখানি তার তরী ছিল বিজনশূন্য ঘাটে বাঁধা;
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে;
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে; পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।
একটি ছেলে একটি মেয়ে,— একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে,
হাতে ধরে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায়;
সারাবছর ঘুরে বেড়ায়; জানেনা সে হতভাগা
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড় ;
তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া !
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র তাপে আগুন ছোটে ; জানে না সে
কোথায় দাঁড়ায় গাছের তলায় ছাড়া।

বর্ষা আসে ঘন ঘটায়, বজ্রঘন কড়কড়ে,
নেমে আসে বারিধারা বেগে ;—
একবার তাকায় হতভাগা ছেলে মেয়ে দুটির পানে,
একবার তাকায় ধূসর ঘন মেঘে।

নৌকাখানি মাত্র ছিল যৎসামান্য, যাহা কিছু
পরতে খেতে দুবেলা দুমুটো ;
কুঁড়েখানি মাত্র ছিল মাথা গুঁজতে, বসতে, শুতে,
নিয়ে ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটো।

সাধের নৌকাখানির উপর যাত্রী নিয়ে শস্য নিয়ে,
বেয়ে বেয়ে, কত দেশে দেশে ;—
যা কিছু তার ভাড়ার কড়ি পেত, নিয়ে গুঁজত মাথা,
ফিরে ঘুরে কুঁড়েটিতে এসে।

ছেলেটিকে কোলে নিত, মেয়েটিকে কোলে নিত,
ধরত বুকে বাহু দিয়ে ঘিরে ;—
অমনি তাহার চোখের সামনে মুছে যেত বিশ্বজগৎ,
চক্ষু দুটি বুজে আসত ধীরে।

মনে হত কুঁড়ে খানি, রাজার বাড়ী কোথায় লাগে !
কাঠের পালঙ্ মনে হত রূপোর।
ধীরে ধীরে পাড়িয়ে ঘুম, ঘুমিয়ে পড়ত জাপটে ধরে
ছেলে মেয়ের নিজের বুকের উপর।

ছেলে মেয়ের ছিল না মা, চলে গেছে আটটি বছর
দেশান্তরে কাল স্রোতের টানে ;
যে দেশেতে মানুষ গেলে আর সে ফিরে আসে নাক,
সে দেশ কোথায় কেহই নাহি জানে।

ভালবাসত ছেলে মেয়ের—যেমন সব মা ভালবাসে
প্রবল গভীর;—বিরাট্, ঘন স্নেহে;
একা তাদের রেখে গেছে তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,
এখন তাদের দেখেও নাক চেয়ে।
তবে কিনা যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহ টুকু
ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা;
হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্ব্বস্বধন পুত্রটিরে, দিয়ে গেছে কন্যা প্রিয়তমা।
এখন তাদের বাপই আছে, সে-ই বাবা, সে-ই মা, সেই তাদের
বাপের চিন্তায় মায়ের চক্ষে রাখে;—
দিনের বেলায় মজুর খেটে রোজগার করে আনে কড়ি;
রাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকে।" (আলেখ্য—'হতভাগ্য')

অন্যত্র দ্বিজেন্দ্র মাতৃহারা শিশুপুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন—

"সাঙ্গ হলে দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই গাঢ় ঘুমের ঘোরে,
ঘুমোচ্ছিসরে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও রে!
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেছিস, নেতিয়ে গেছিস,
বাছা আমার আহ্রে! ওরে আমার যাহ্রে!
কে দিল তোর মাথায় বালিশ? কে দিল তোর চাদর গায়ে?
কে পাড়াল ঘুম?
ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো!
ওরে আমার বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দার কুসুম!
শুনতো হুকুম, কর্ত্ত পেয়ার, যে জন, এখন নাইত সে আর;
মায়া কাটিয়ে চলে সেত গেছে এখান থেকে;
—তোকে যাহ্ আমার কাছে রেখে!
যত দিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল, তুই বলে সে সারা;
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে,—ওরে মাতৃহারা!

কোথায় যে সে চলে' গেল কিছুই না বলে গেল ;
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার—যে, ফির্ব্বে না সে আর।
যাহা কিছু বিশ্বাস করে' দিয়ে ছিলাম তাহার কাছে, সে তা নিয়ে গেল
রচেছিলাম যে সংসারে, এত দিনে, এত শ্রমে ;—ভাসিয়ে দিয়ে গেল।
এখন আবার নূতন যত্নে, নূতন শ্রমে, নূতন করে' নূতন সংসার রচি ;
আমি না হয় সেটা পারি, তুই যে নেহাইৎ কচি।

* * * * *

সে যদি তোর থাকতো, খানিক আবদার কর্ত্তিস্ শোবার আগে,
দাবী কর্ত্তিস্ চুমা ;
টেনেনিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুস্বরে "ঘুমা যাদু ঘুমা।"
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে চাদরখানি, গায়ে দিয়ে, বালিশ দিয়ে মাথায় ;
ঘুমটি অমনি ছেড়ে এল আঁখির দুই পাতায়।
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি,
ছেঁড়া একটা মাদুরে,—ওরে আমার যাদুরে !
বুঝিস্ না তুই নিজের দুঃখ ওরে সুখী বালক—তাইত, আছিস সুখে।
বিজ্ঞ আমি, বুঝি সূক্ষ্ম, বুঝি বেশী, তাই এ দুঃখ বেশী বাজে বুকে !

* * * * *

তুইও বুঝবি বড় হলে' মনে পড়বে যখন—ছেলে-বেলার কথা—
মায়ের যত্ন মায়ের সেবা সর্ব্বদা সর্ব্বথা।
নিজের মায়ে আদর করে' ডাকবে যখন কেহ ;
তখন রে তোর মনে পড়বে,— বিশ্ব জগৎ হতে লুপ্ত মাতৃস্নেহ ;
তখন পড়বে মনে—তুই ও একদিন "মা মা বলে" ডাকতিস্ কোন জনে।

* * * * *

বুঝবি তখন পড়বি যখন মাতৃ-স্নেহের গাথা, ইতিহাসে অথবা অন্যথা ;

তখন রে তোর মায়ের কথা স্বপ্নের মত ভেসে আস্‌বে সব ;
তখন বুঝবি মায়ের মূল্য—বুঝ্‌বি, নাই কেউ মায়ের তুল্য।
তখন যাদু মায়ের অভাব কর্ব্বি অনুভব।

* * * * *

হায় যাদু সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই—নিজের দুঃখ বুঝতেও না পারা ;
সেই দুঃখে দুঃখী তুই—ওরে মাতৃহারা!
তাইরে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায় ;
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা—ওরে মাতৃহারা!" (আলেখ্য—মাতৃহারা)

দ্বিজেন্দ্রলালের সরল ও উন্মুক্ত হৃদয়ের এই আত্মপ্রকাশ হইতে আমরা তাঁহার বিপত্নীক-জীবনের দুঃখের গভীরতা এবং মানসিক অবস্থা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই কবিতাদ্বয়ে এবং অপরাপর কবিতায় আত্ম-অভিব্যক্তি কবিজনসুলভ ভাষায় গ্রথিত হইলেও ইহা যে 'ছাঁদা কথা' নহে, তাহা যে পত্নীগত-প্রাণ কবির অন্তরের প্রকৃত কথা, তাহা আমরা তাঁহার স্বভাবের ও পরবর্ত্তী জীবনের কথা স্মরণ করিলেই নিঃসন্দেহ রূপে বুঝিতে পারি। তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু পাঁচকড়ি বাবু যে বলিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র "সারল্যের অবতার" ছিলেন—তাহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। তাঁহার মুখে এক পেটে এক ছিল না। কপটতাকে তিনি এতই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন যে কোনও অপ্রকৃত অনুভূতি তাঁহার মর্ম্মের প্রকৃত কথা বলিয়া ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

এই আত্মপ্রকাশ দ্বিজেন্দ্রের গীতে, নাটকে, কবিতায়, সর্ব্ববিধ রচনাতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। কখনও তিনি মনকে প্রবোধ দিয়া গাহিয়াছেন—

"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে দুদিন পিছে"

কখনও সৈনিকের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের কথার ছলে তিনি পত্নীর সহিত পরলোকে পুনর্মিলনের আশা প্রকাশ করিয়া গায়িয়াছেন—

"বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলন মধুর হাঁসি,
শুনিব বিরহ নীরব কণ্ঠে মিলন মুখর বাণী
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী।"

"সীতা" নাটকের উৎসর্গ পত্রে তিনি স্ত্রীর-উদ্দেশে লিখিয়াছেন—

"এই কাব্য খানি রচনা করিয়া প্রথমে তোমাকেই পড়িয়া শুনাই। পড়িতে পড়িতে আবেগে আমার কণ্ঠস্বর গাঢ় ও গদ্গদ হইয়া আসিত, বাষ্পাভিষিক্ত দৃষ্টির সম্মুখে অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইয়া আসিত; আর বলিতাম "আজ থাক, আজ আর পড়িতে পারিতেছি না।" তুমিও এ কাহিনী শুনিতে শুনিতে অভিভূত হইতে। আমার সকল কাব্যের অপেক্ষা "সীতা" তোমার কাছে সমধিক প্রিয় ছিল। তাই এই "কাব্যখানি" তোমারই স্মৃতি কল্পে উৎসর্গ করিলাম।

"যে নারীকুলে এই চিরস্মরণীয়া সীতাদেবীর জন্ম, সেই কুলেই তোমার জন্ম হইয়াছিল। এই অভাগিনীর অসমসহিষ্ণু পতিনিষ্ঠা প্রত্যেক পতিব্রতা হিন্দু-মহিলার কাছে আদরের, গৌরবের ও পূজার জিনিষ। আর, আমি যাঁহাকে আজ কল্পনার চক্ষে দেখিতেছি, তুমি আজি তাঁহার সহিত একই লোকে বাস করিতেছ, আর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার পূজায় নিরতা আছ। সেই পূজার উপকরণ-স্বরূপ এই কাব্যখানি তোমার হস্তে দিলাম। তোমার প্রেমে ইহাকে অভিষিক্ত করিয়া লইয়া, এই ছন্দোবদ্ধ তাঁহারই চরণে ঢালিয়া দিও।

"এখন আর তোমাকে কি দিতে পারি। তোমার আর আমার

মধ্যে এখন এক গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর নদী কল্লোলিত হইতেছে। সেই নদী আমি এক দীর্ঘ নিশ্বাসের সেতু দ্বারা বাঁধিয়াছি। সেই সেতুবন্ধের উপর দিয়া পুণ্যস্মৃতির হস্তে, এই পুণ্যকাহিনী তোমার কাছে পাঠাইলাম।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমা-মিলন

১৩০৫ হইতে ১৩১২ সাল (খ্রীঃ ১৮৯৮-১৯০৫) প্রায় সাত বর্ষকাল দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মফস্বলে পরিদর্শনে যাইতে হইত, নতুবা অধিকাংশ সময়ই তাঁহার এই রাজধানীতেই অতিবাহিত হইত। তৎকালে তিনি বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে, পরে ঝামাপুকুর লেন—১নং বাটীতে এবং শেষে ১৩১০ সালে, তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের পর, ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসাবাটীতে থাকিতেন। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত বহুতর শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্যিক-দিগের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি বন্ধুসমাজে বেশ 'মজলিসি' সদালাপী লোক ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অনেক সাহিত্যানুরাগী-ও সঙ্গীত-প্রিয় ব্যক্তি তাঁহার ভবনে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভ প্রার্থনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পত্নীবিয়োগের পর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার সেই বন্ধুবর্গ সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিবার জন্য ১৩১১

সালে (১৯০৫ খ্রীঃ) দ্বিজেন্দ্রলাল "পূর্ণিমা-মিলন"এর প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য-সেবকগণকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরিচয়, সম্প্রীতি, ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করাইয়া দেওয়া এই পূর্ণিমা-মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। মিলনস্থলে সাহিত্যিকগণের আনন্দবিধানের এবং মিষ্টমুখে বিদায় লইবার ব্যবস্থা করা হইত। সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাসির গান, Comic sketch, বায়স্কোপ প্রভৃতির আয়োজন হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আদর আপ্যায়নের অভাব হইত না। যাঁহার বাটীতে মিলনের অনুষ্ঠান হইত তিনিই সেই বারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন। এই পূর্ণিমা-মিলনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নিম্নোদ্ধৃত গীতটী রচনা করিয়াছিলেন—

"এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়—এইখানেতে হয়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্ত্তে হবে কাল হরণ।
হোক্‌না, ধনী গরিব বড় ছোট সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবেনাক ঐতিহাসিক গবেষণার কোনও ক্লেশ;
হেথায়, রবেনাক বক্তৃতা কি যুক্তিশূন্য উপদেশ;
আমরা, আসিনিক জারিজুরি, কোর্ত্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসিনিক কর্ত্তে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন;
হেথায়, নাইক করতালির মধ্যে কারো আত্মনিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি মাতৃভাবার প্রতি টান;
তাঁদের, কর্ত্তে হবে পরস্পরে প্রীতিদান ও প্রতিদান।
হেথা, অনত্যুচ্চ কলরবে মেলামেশা কর্ত্তে হবে,
—শুনুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
দোহাই ধর্ব্বেন না কেউ হোল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।"

(১) ১৩১১ সালের (১৯০৫ খ্রীঃ) দোল-পূর্ণিমার দিন, ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে, দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের বাসাবাটীতে পূর্ণিমা-মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে কবীন্দ্র স্যার্ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার স্বরচিত "সে যে আমার জননী" গানটী গায়িয়াছিলেন। সেই মিলনস্থলে ফল্গুৎসব উপলক্ষে ফাগ্ খেলা হয়—রবীন্দ্রনাথের দুগ্ধফেননিভ চাদর ফাগে রঞ্জিত হইয়া শোভাধারণ করে।

পরবর্ত্তী পূর্ণিমা-মিলনের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(২) মধুপূর্ণিমা—১৩১২ সালে 'দীনধামে' বৈশাখী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় পূর্ণিমা-মিলনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্-এ মহাশয় সেই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-কারী। তিনিই প্রথমে পূর্ণচন্দ্রাঙ্কিত নিমন্ত্রণ-পত্র (কার্ড) বাহির করেন। সেই মিলন উপলক্ষে স্থির হয় যে নিমন্ত্রণ-পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম সম্পাদক-রূপে থাকিবে এবং যাঁহার বাটীতে মিলন হইবে তাঁহারও নাম ঐ পত্রে থাকিবে। পরবর্ত্তী মিলন সমূহে সেই প্রথাই অনুসৃত হয়। এই মিলন-স্থলে সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটী আবৃত্তি করেন।

(৩) মাধবী-পূর্ণিমা—১৩১২ সালে, পুষ্পদোলের দিন ১নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে ডাক্তার স্যার্ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে পূর্ণিমা-মিলনের তৃতীয় অনুষ্ঠান হয়। ঐ মিলনোৎসবে গায়িবার জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল উক্ত 'এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ' গীতটী রচনা করেন। কবির বন্ধু শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় মিলনের দিন প্রাতে মিলনস্থলে গায়িবার জন্ত একটি গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন—অপরাহ্নকালে কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া দেখেন দ্বিজেন্দ্রলাল উক্ত গীতটী রচনা

করিয়া রাখিয়াছেন। সে দিন সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ গীতটী গান করেন। ঐ দিবস কবিবর ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মেঘনাদবধ' কাব্য হইতে 'সীতা ও সরমার কথোপকথন' অংশটী আবৃত্তি করেন। স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব জজ সারদাচরণ মিত্র, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন।

(৪) আষাঢ়ী-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। ঐ দিবস ঔপন্যাসিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে পূর্ণিমা-মিলন হয়। এই মিলন-স্থলে দ্বিজেন্দ্রের গুণগ্রাহী ও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন।

(৫) রাখী-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। ষ্টার থিয়েটারে মিলনের অনুষ্ঠান হয়। সকলের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

(৬) ভাদ্র-পূর্ণিমা—১৩১১ সাল। ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের গ্রে ষ্ট্রীটের ভবনে পূর্ণিমা-মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হয়। মিলনস্থলে কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন স্বরচিত গান গাহিয়া সমবেত সাহিত্যিকগণকে মুগ্ধ করেন এবং বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল "মোগল ব্যাঘ্র" ('সাধে কি বাবা বলি') গীতটী গান করেন।

(৭) লক্ষ্মী-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। ঐ দিবস বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপ্যাল গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে পূর্ণিমা-মিলন হয়। ঐ দিন মিলনস্থলে দ্বিজেন্দ্রলালের মহাসঙ্গীত "আমার দেশ" সাহিত্যিকদিগের সমক্ষে প্রথমে গীত হয়।

(৮) রাস-পূর্ণিমা—১২১২ সাল। ঐ দিবস কবির শ্যালক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ভবনে পূর্ণিমা-মিলন হয়।

(৯) রাস-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। ঐ দিবস দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্

কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পূর্ণিমা-মিলন হয়। মিলনস্থলে মহারাজা ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ দিন একটি স্বরচিত ইংরাজি হাসির গান গায়িয়া এবং তদীয় শিশুপুত্র ও কন্যার (মণ্টু ও মায়া) সহযোগে অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাঁহার "ইরাণ দেশের কাজি" ও "সাধে কি বাবা বলি" গীতগুলি গায়িয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রীত করেন।

(১০) পৌষ-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। ঐ দিবস বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারি-সম্পাদক স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বাটীতে পূর্ণিমা মিলন হয়। ঐ দিন সার্থকনামা কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা স্বরচিত 'অনুতাপ' নামক হাসির কবিতাটী আবৃত্তি করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন।

(১১) মাঘী-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে ঐ দিবস পূর্ণিমা-মিলনের অনুষ্ঠান হয়। মিলনস্থলে মহারাজা ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সপুত্র উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটী ৺গঙ্গা-গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় ঐ দিন "বিঘোরে বেহারে চড়িনু একা" গীতটী গায়িয়া এবং হাস্যরসের ব্যঙ্গ করিয়া এবং হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ—রঙ্গরসাত্মক অভিনয় করিয়া মিলনকক্ষ আনন্দ-হাস্যে মুখরিত করিয়া তুলেন।

(১২) দোল-পূর্ণিমা—১৩১২ সাল। ঐ দিবস শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয়ের ভবনে ঐ বৎসরের শেষ পূর্ণিমা-মিলন হয়। উক্ত দিবস দোললীলা উপলক্ষে আবীর খেলা হয়। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের শুভ্রকেশ 'লালে লাল' হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১৩) মধু-পূর্ণিমা—১৩১৩ সাল। ডাঃ স্যার্ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটী—কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল।

এই অনুষ্ঠানের পর ১৯০৫ সালের নবেম্বর মাসে দ্বিজেন্দ্র খুল্‌নায় বদলি হয়েন এবং কিঞ্চিদধিক দুই বর্ষকাল (১৯০৫,৭ই নভেম্বর হইতে ১৯০৮, ২৮ শে এপ্রিল) কলিকাতায় ছিলেন না, মধ্যে মধ্যে কয়েকবার আসিয়াছিলেন মাত্র। সেই দুইবর্ষ দ্বিজেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে নিয়মিত ভাবে প্রতি পূর্ণিমায় আর পূর্ণিমা-মিলনের অনুষ্ঠান হয় নাই, মধ্যে মধ্যে হইত। সেই সময়ে কলিকাতা ইভনিংক্লবে, মিনার্ভা থিয়েটারে, এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতাস্থ বাটীতে, শ্রীযুক্ত রসময় লাহার বাটীতে, দ্বিজেন্দ্রলালের নিজ বাটীতে, ডাক্তার স্যার্‌ কৈলাসচন্দ্র বসুর বাটীতে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্রের বাটীতে, এবং শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর বাটীতে পূর্ণিমা-মিলনের এক একবার অধিবেশন হয়।

সাহিত্য-সম্রাট্‌ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুর্য্যের গলির বসত বাটীতে ৫ই ফাল্গুন (খ্রীঃ ১৯০৫) যে পূর্ণিমা-মিলন হয় সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল "আমার দেশ" সঙ্গীতটী গান করেন।

রসময় বাবুর বাটীতে মিলনের অনুষ্ঠান, ১৩১৫ সালের স্নান-পূর্ণিমার দিন হয়। ঐ দিবস দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে একটি হাস্য-রসাত্মক প্রবন্ধ—'গবেষণা' পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী—দ্বিজেন্দ্রের "দাদা মহাশয়"—ঐ প্রবন্ধের একটি হাস্যরসপূর্ণ 'প্রতিবাদ' পাঠ করেন। ঐ দিনই বেলা দশটার সময় দ্বিজেন্দ্র 'দাদামহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে নিজের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শোনান এবং উহা শুনিয়া 'দাদা মহাশয়' হাসিতে হাসিতে বলেন "এর যে ভারি প্রতিবাদ হবে।" সেই কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র তাঁহাকেই প্রতিবাদটি সেই দিনই লিখিয়া সন্ধ্যার সময় মিলনস্থলে পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলেন। সে দিন ভূতপূর্ব্ব 'প্রয়াস' নামক তৎকালীন: সাহিত্য-সেবক সমিতির মাসিক

পত্রের অন্যতম লেখক ৺ বিপিনবিহারী সেন গুপ্ত বি-এ মহাশয় 'কুড়ান খাতা' নামক একটি পরিহাস-রচনা পাঠ করেন। রসময় বাবু সে দিন যে একটি জলযোগের খাদ্যের তালিকা (Menu) ছাপাইয়া ছিলেন তাহাও হাস্যরসিক কবিরই উপযুক্ত হইয়াছিল, সকলেই সেই খাদ্যের তালিকার হাস্যরস উপভোগ করিয়াছিলেন।

দেবকুমার বাবুর বাটীতে পূর্ণিমা-মিলনের দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠানের দিন হাস্যরসিক 'প্রফেসার চিত্তরঞ্জন' যাত্রাদির নকল করেন, এবং Edward Institution এ পূর্ণিমা-মিলনের সময় দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরচিত "সে যে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" কীর্ত্তন গানটী গায়িয়া অভ্যাগতগণকে মোহিত করেন।

১৯০৭ খ্রীঃ হইতে প্রতিবৎসর রাস-পূর্ণিমায় "দীনধামে" শ্রীযুক্ত ললিত-চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আহ্বানে পূর্ণিমা-মিলন হইতেছে। এই দীনধামেই ১৯০৭ খ্রীঃ পূর্ণিমা-মিলনে হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন এবং ১৯০৮ খ্রীঃ মাষ্টার—মদন সাধারণ্যে স্ব স্ব গুণপনা প্রথমে প্রদর্শন করেন। এবং দীনধামেই একবৎসর পূর্ণিমা-মিলনে দ্বিজেন্দ্র Longfellowর—"Psalm of Life" কবিতাটির হাস্যরসাত্মক 'আঁখর' দিয়া কীর্ত্তনের সুরে Evening Clubএর কয়েকজন সভ্যের সহিত গান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ (১৩১৯ রাস-পূর্ণিমা) পূর্ণিমা-মিলনে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'পতিতোদ্ধারিণি' গঙ্গে, গীতটী গায়িয়া-ছিলেন এবং ঐ মিলনস্থলে ললিত বাবু, দ্বিজেন্দ্রলালকে পূর্ণিমা-মিলনের প্রবর্ত্তক বলিয়া একটি স্বরচিত কবিতা উপাহার দেন এবং কবির গলদেশে পুষ্প-মালা পরাইয়া দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ললিত বাবুর রচিত উক্ত কবিতাটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সাত বৎসরের কথা দোল-পূর্ণিমায়
সাহিত্যিক বন্ধুগণে হইয়া বেষ্টিত,

মধুময় হাসিগানে, ফাগের খেলায়,
মধুর মিলন তুমি কর প্রতিষ্ঠিত।
ভায়ের স্নেহের যেই মন্দাকিনী ধারা,
তব পুণ্য অনুষ্ঠানে ছিল প্রবাহিত,
আজি স্রোতস্বতীরূপে বঙ্গদেশ সারা
ত্রিদিব কল্লোল তানে করে নিনাদিত।
এমনি চাঁদিনী রাতে, চাঁদের কিরণে
বাণী-পুত্রগণ সেবা অতি সুশোভন,
মৃদঙ্গের সুসঙ্গত তাল-লয় সনে
সঙ্গীত গায়ক কণ্ঠে যথা বিমোহন।
ধন্য হ'ক, বঙ্গে তব পবিত্র পার্ব্বণ।
সাহিত্যিক সেবা ব্রত পূর্ণিমা-মিলন।"

পরবৎসর রাসপূর্ণিমার দিন দ্বিজেন্দ্রলাল ইহলোকে ছিলেন না; বাগ্মী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিজেলালের কথা বলিয়া সকলকে অশ্রুবর্ষণ করান।

১৯১২ খ্রীঃ রাসপূর্ণিমায় অধিবেশনের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল Evening Clubএর সভাপতিস্বরূপ তাঁহার "সুরধামে" তদীয় জীবদ্দশায় পূর্ণিমা-মিলনের শেষ অনুষ্ঠান করিয়া যান।

তৎপরে ললিত বাবুই "দীনধামে" তদীয় পিতা নাট্যকার-কুলতিলক দীনবন্ধুর শ্রাদ্ধ-বাসরে বাৎসরিক পূর্ণিমা-মিলন করিয়া ঐ অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং তদুপলক্ষে পরলোকগত কবির সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের স্মৃতি রক্ষা করিয়া সাহিত্যিকগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

——

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—:•:—

অভিনন্দন

স্ত্রী-বিয়োগের দুই বর্ষ পরে ১৩১২ সালে (খ্রীঃ ১৯০৫, নবেম্বর) কলিকাতা হইতে খুল্‌নায় বদলি হইবার সময় দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ একটি বিদায়-ভোজ দেন। সেই বিদায় উৎসবের দিন দ্বিজেন্দ্রও বুঝিতে পারেন তাঁহার গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন এবং দ্বিজেন্দ্রের সুহৃদ্বর্গও সাত বর্ষকাল তাঁহার সাহচর্য্য পাইবার পর তাঁহাকে বিদায় দিতে নিরতিশয় দুঃখিত হয়েন। ১নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে ডাক্তার স্যার্‌ কৈলাসচন্দ্র বসু সি, আই, ই, মহাশয়ের ভবনে, ১৩১২ সালের ৯ই কার্ত্তিক, ঐ বিদায় উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। দ্বিজেন্দ্রের সাহিত্যিক অন্তরঙ্গগণ তদুপলক্ষে তাঁহাকে প্রীতি-উপহার ও বিদায়-অভিনন্দনসূচক যে সকল কবিতা ও গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে দ্বিজেন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সুপ্রকাশ। সেই অভিনন্দন গীতি কবিতাদির প্রত্যুত্তরে দ্বিজেন্দ্র একটি কবিতা রচনা করিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে পাঠ করেন। সেই কবিতায় ও তাঁহার পঠন-ভঙ্গীতে, দ্বিজেন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের সেই স্নেহ-শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাসে কত গভীর ভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রের সেই কবিতাটি সংগ্রহ করিতে পারি-নাই। তাঁহার বন্ধুগণের রচিত গীত ও কবিতাগুলির এস্থলে পরিচয় দিলাম :—

বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত দ্বিজেন্দ্র

—১২৭ পৃঃ।

বামদিক হইতে

পশ্চাতে হরনাথ বসু, ৺মন্মথনাথ সেন, দেবকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বন্দ্যো,

মধ্যে ৺এচ্ বসু, রসময় লাহা, দ্বিজেন্দ্রলাল, ললিতচন্দ্র মিত্র,

মায়াদেবী, দিলীপকুমার,

সম্মুখে অধরচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা (শয়ন করিয়া)

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী নিম্নলিখিত স্বরচিত বিদায়-সঙ্গীতটি গান করেন—

"বিদায় চাও যে ওহে কবি, তোমায় বিদায় দেয় কে আর!
তোমার উদার হৃদয়পুরে, মোদের অবাধ অধিকার।
নও ত শুধু হাসির কবি
তোমার হাতের গভীর ছবি
দীনা বঙ্গভাষার অঙ্গে অবিনাশী অলঙ্কার!
তোমার কাছে আসতাম যদি কালো মুখে ভারি বুকে,
হাসির সুধায় রসের স্রোতে ডুবে ফিরতাম হাসি মুখে
হও না তুমি গুণী জ্ঞানী;
তোমার মধুর হৃদয় খানি,
তুলনা নাই, তুলনা নাই, তুলনা নাই—কোথাও আর।"

কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি পাঠ করেন—

"হে রসিক কবিবর, ওহে দার্শনিক
হে সরল, হে নির্ম্মল, উদার প্রেমিক
হে বন্ধু অন্তরতম আপনার জন,
লহ ভক্তি-পুষ্পহার—তুচ্ছ নিবেদন!"

তৎকালীন উদীয়মান কবি ৺মন্মথনাথ সেন (প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পুত্র) নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি পাঠ করেন—

"তুমি শিখায়েছ কবি! লাঞ্ছিত জীবনে
নির্দ্দোষ সরল হাস্য সঞ্চারে কেমনে
নব-শক্তি, নব-সুখ, প্রীতিফুল্ল প্রাণ
তোমার প্রতিভা-লক্ষ্মী করিয়াছে দান

যে অপূর্ব্ব সম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার
সম্পূর্ণ সার্থক তাহা। অন্তরও তোমার
কি মধুর স্নেহে ভরা কি উচ্চ উদার
সেই জানে, বন্ধু বলি' ডাকি একবার
গৌরবের আলিঙ্গন দিয়াছ যে জনে
প্রণয়ের তীর্থ সম তব পূত মনে।
সেই তুমি দূরে যাবে ক্ষণিকেরও তরে
এ চিন্তায় চিত্ত মাঝে ব্যথা উঠে ভরে'।
হে বরেণ্য! হে সুহৃৎ! স্মরিও প্রবাসে
তোমার অযুত ভক্ত কত ভালবাসে।"

হাস্যরসিক কবিবর শ্রীযুক্ত রসময় লাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি ও তাহার "টীকা" * প্রেরণ করেন।

"হে বিদগ্ধ † কবীশ!

আমি আপনার বিদায় উৎসবের ভোজটুকু হইতে স্বতঃই বঞ্চিত। কিন্তু উৎসবটির সঙ্গে আমার যে আন্তরিক যোগ আছে, তাহার সামান্য নিদর্শন স্বরূপ এই কবিতাটি লিখিলাম :—

আমি, সারা দিন রাত তোমারে লভিতে—রহিব হেলিয়া দেয়ালে;
তুমি, ঘুম ভাঙ্গা চোক মুছিতে মুছিতে—মুখ দেখে যেও খেয়ালে।

কবিতাটী একটু দুর্ব্বোধ হয়ে পড়্‌ল—না? সুতরাং ইহার সহিত টীকাও পাঠাই, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। মনে রাখিবেন কবিরা হৃদয়ের সহিত মুকুরের তুলনা করিয়া থাকেন।

অনুরক্ত, শ্রীরসময় লাহা।"

[* টীকা—একখানি দেওয়ালে টাঙ্গাইবার আরসি।] † বিদগ্ধ—রসিক।

রসময় বাবু বলেন "দ্বিজু বাবু অস্পষ্ট কবিতার উপর চটা ছিলেন বলিয়া এই রসিকতাটি লিখি! দ্বিজু বাবু প্রথমে এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বলেন, 'কিছু বুঝিলাম না।' কিন্তু যখন 'টীকা'টি খুলিয়া দেখেন উহা একখানি দেওয়ালে টাঙ্গাইবার আরসি, তখন তিনি সেই 'দুর্ব্বোধ' পত্রের হাস্যরস উপভোগ করিয়া আমার ভালবাসার অভিজ্ঞানটি পরমানন্দে গ্রহণ করেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন উক্ত বিদায়-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হয়েন, তখনও তাঁহার প্রতাপ সিংহ ব্যতীত গদ্যে লিখিত মহানাটকগুলি অথবা দেশপূজাত্মক মহাসঙ্গীতগুলি রচিত হয় নাই। কেবলমাত্র প্রতাপ সিংহ নাটকখানি সেই সময়ে প্রকাশিত হয়। খুলনায় স্থানান্তরিত হইবার পর তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ, কাঁন্দী, গয়া ও জাহানাবাদে কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতে হয় এবং সেই প্রবাসে অবস্থানকালেই তিনি ক্রমান্বয়ে দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান নাটক চতুষ্টয় ও তাঁহার বিখ্যাত দেশ-প্রেমাত্মক মহাসঙ্গীতগুলি রচনা করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে (১৩১৫ সাল) দ্বিজেন্দ্র গয়া হইতে এক বৎসরের দীর্ঘ অবকাশ লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং ২নং নন্দরাম চৌধুরীর লেনে তদীয় "সুরধাম"—বাসভবনের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করাইয়া গৃহপ্রবেশ করেন। সেই অবকাশান্তে ২৪-পরগণায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া তিনি কলিকাতাতেই ১৩১৫ সাল হইতে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত (১৯০৮—১৯১২) অবস্থান করেন; মধ্যে একবার তাঁহাকে ১৩১৯ সালে (১৯১২ খ্রীঃ) বাঁকুড়ায় বদলি হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু কয়েক দিন পরেই পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এক বৎসরের অবকাশ (ফার্লো) লইতে হয়। সেই বাঁকুড়ায় বদলি হইবার সময় দ্বিজেন্দ্র আর একবার বিদায়-অভিনন্দন প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিজেন্দ্রের সুহৃদ, মিনার্ভা

থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় নিজের থিয়েটার-ভবনেই সেই বিদায়-উৎসবের আয়োজন করেন ; এবং Evening Clubএর সভ্যগণও তাঁহাদের সভাগৃহে স্বতন্ত্রভাবে দ্বিজেন্দ্রকে বিদায়সম্বৰ্দ্ধনা করেন। ইভনিং ক্লাবের বিদায়-সভাস্থলে দ্বিজেন্দ্রের বাল্যবন্ধু, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র, কবিবর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় স্বরচিত "কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি" কবিতাটি পাঠ করেন। সেই কবিতাটির কিয়দংশ "বাল্য-জীবন" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছি—এস্থলে আর তিনটি শ্লোক (বঙ্কিম বাবুর "আকিঞ্চন" কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"আজি ভাই গৌরবের উচ্চ শিখরের পরে,
দাঁড়ায়ে চাহিয়ে দেখ নিম্নে তিলেকের তরে।
ওই দূর তলদেশে আনন্দ আলোক কিবা !
ফুটিয়া উঠেছে তব জীবন তরুণ-দিবা।

* * *

সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই—এ জীবনে ;
কবি-দৃষ্ট কুঞ্জবনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্টমনে ;
আজি নানাবিধ ফুলে সাজি তব ভরিয়াছে
পর্য্যাপ্ত প্রসূন-পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে।
'শিশু মানবের পিতা' নহে শুধু কাব্য কথা
তোমার জীবনে তার আজ পূর্ণ স্বার্থকতা ;
যেই শিশু বালকণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত কেশ
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'তোমার দেশ'।"

এই বিদায়-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে দ্বিজেন্দ্র এক ঘণ্টার মধ্যে যে কবিতাটি

রচনা করেন, সেই কবিতাটির শেষ তিনটি শ্লোক (দ্বিজেন্দ্রের "ত্রিবেণী" কাব্য হইতে) এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"প্রভাতে এ জীবনের, হাসায়েছি বঙ্গভূমি
করিয়াছি তীব্র ব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি ;
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি !

মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্য পাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ !

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক ভাই ;
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি,
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি ।"

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ইণ্ডিয়া ক্লাবে একটী ভোজ দেন। সেই ভোজের দিন দ্বিজেন্দ্র এরূপ বিচলিত হয়েন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গও তাঁহার সহিত আসন্ন-বিচ্ছেদ-দুঃখে এরূপ নিমগ্ন হয়েন যে রসময় বাবু, সে দিনের সেই বিষাদভার দুর্ব্বহতর করিবার আশঙ্কায়, দ্বিজেন্দ্রকে বিদায়সম্ভাষণের একটি স্বরচিত কবিতা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াও পড়িতে পারেন নাই—সে কবিতায় দ্বিজেন্দ্রের পত্নী-বিয়োগের উল্লেখ ছিল।

রাণাঘাটে পাল চৌধুরী মহাশয়দের ভবনে একবার দ্বিজেন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য স্থানীয় Happy Clubএ তাঁহার পাষাণী নাটকের অভিনয় হয়। পাল চৌধুরী মহাশয়েরা বন্ধু বান্ধবের সহিত নিজেরাই

সেই অভিনয় করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বন্ধু অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅধরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীগিরীশচন্দ্র শর্ম্মা অন্তরঙ্গ চতুষ্টয়ের সহিত অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অপ্সরী-বেশে সজ্জিতা একটি বালিকা নিম্নোদ্ধৃত গীতটি গায়িতে গায়িতে আসিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে সম্মুখে দণ্ডায়মান দ্বিজেন্দ্রের গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দেন :—

"এস এস এস রসরাজ !
ধন্য মানি পেয়ে পদধূলি আজ
তোমারই গানে জাগে পরাণে নব আশা ;
তোমারই দানে ভাষা লভিছে নব ভূষা ;
কি মোহ মন্ত্রে গাহিয়া "মন্দ্রে"।
স্বাগত দ্বিজেন্দ্র কবি দ্বিজরাজ !
দেবের স্থজিত কুসুমে গাঁথি হার
দেবতা চরণ পূজার উপচার !
দীন ভক্তের কি আছে আর
নিওনা অপরাধ দিওনা লাজ।"

যে সময়ে দ্বিজেন্দ্রের 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি' মহাসঙ্গীতদ্বয়ের দেশ-প্রেমাত্মক উন্মাদনা বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে অনুভূত হইতেছিল, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রকে অভিনন্দন দিবার উদ্দেশে উত্তরপাড়ায় একটি মহতী সভা হয়। সভাস্থলে দ্বিজেন্দ্রের গুণগ্রামের স্তুতিবন্দনা করিয়া একটি হাস্যরস-সিক্ত অভিনন্দনপত্র দ্বিজেন্দ্রকে প্রদান করা হয়।

প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই দ্বিজেন্দ্র স্বাভাবিক সরল ব্যবহারে ও বন্ধুপ্রীতিতে তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বিদায়-উৎসবের

বহুপূর্ব্বে কবি রসময় বাবু দ্বিজেন্দ্রকে একটি কবিতা উপহার দেন ; সেই কবিতা পাঠ করিলে আমরা দ্বিজেন্দ্রের প্রতি তদীয় সুহৃদ্‌বর্গের অনুরাগ উপলব্ধি করিতে পারি। রসময় বাবুর ('আমোদ' কাব্য হইতে) সেই কবিতাটির দুইটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বন্ধু তোমার দীপ্ত প্রতিভায়—আলোকিত হচ্ছে বটে দেশ,
ব্যঙ্গ-ভরা তোমার রচনায়—আমোদ-প্রমোদ পাচ্চি আমরা বেশ ;
নওত তুমি সুখী চিরদিন, কৌতুক হাস্তে দিচ্চ তবু ছেয়ে ;
রসিক হওয়া দেখছি সুকঠিন—বিজ্ঞ কিম্বা অজ্ঞ হওয়ার চেয়ে।

* * *

কইছ তুমি, সহজ কথা সরস, ভাবছে লোকে রহস্যময় ঠাট্টা ;
যখন তুমি দিচ্ছ ঢেলে পায়স, ভাবছে বুঝি পেলেম এবার খাট্টা ;
নির্ম্মল তুমি, চাঁদের মতন তুমি, তোমায় জ্যোতিঃ নিষ্কলঙ্ক রাকা,
সুধাসিক্ত করছ চিত্তভূমি, তোমার চিত্ত উদার,—নয় ক ঢাকা।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নাটক

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গাব্দ ১৩০৫ হইতে ১৩১২ পর্য্যন্ত প্রায় সাত বর্ষকাল দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। সেই সময়েই তিনি ৯ম হইতে ১৩শ পরিচ্ছেদে বিবৃত গ্রন্থনিচয় রচনা করেন। তৎপরে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনাতেও একটি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ সহচর মনস্বী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রৌঢ়তার শীর্ষে আরোহণ করিতে না করিতে তিনি সতী সাধ্বী পত্নীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন। * * * জীবননাট্যের হাসির অঙ্ক ফুরাইল, ভাবের অঙ্ক আরব্ধ হইল।

"পত্নী-বিয়োগের পূর্ব্ব হইতে যে ভাবের লহর আইসে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। "সীতা" "পাষাণী" প্রভৃতি নাটক ভাব সূচনার প্রথম যুগের লেখা। এ লেখায় ভাব আছে; সে ভাবাভিব্যঞ্জনায় যথেষ্ট কারিকরীও আছে। * * পরন্তু পত্নীবিয়োগের পর সে ভাব উদ্দাম প্রবাহতরঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যকে যেন ডুবাইয়া পরিস্নাত করিয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে দেশ-হিতৈষণার সোণার কমল, বিশ্বমানবতার পারিজাতমালা, জাতিপ্রীতির নন্দনকুসুম-পরম্পরা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" (মানসী, আষাঢ়, ১৩২০)।

দ্বিজেন্দ্রের রচনার ধারায় এই পরিবর্ত্তন তাঁহার জ্ঞাতসারে আরম্ভ হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না, কিন্তু তিনি নিজে সে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য এবং বাঞ্ছনীয় বলিয়াই জীবন-সায়াহ্নে আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩২০ সালের সাহিত্য পত্রে 'প্রবাসে' নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

"হাস্য শুধু আমার সখা! অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে' অর্দ্ধজীবন করেছি ত অপচয়।
চলে যারে সুখের রাজ্য দুঃখের রাজ্য নেমে আয়!
গলাধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ।"

দ্বিজেন্দ্রের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদিন

দ্বিজেন্দ্রলালকে জিজ্ঞাসা করেন "এখন আর আপনি হাসির গান লেখেন না কেন?" তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন "এখন হাস্‌তে গেলে কান্না আসে।" এরূপ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন।

পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রমান্বয়ে দশখানি নাটক রচনা করেন:—প্রতাপসিংহ (১৩১২—পূর্ব্বের রচিত), দুর্গাদাস (১৩১৩), নূরজাহান, (১৩১৩), মেবারপতন (১৩১৫), সাজাহান (১৩১৫), চন্দ্রগুপ্ত (১৩১৬), বঙ্গনারী (১৩১৭) পরপারে (১৩১৮), ভীষ্ম (১৩১৯), সিংহলবিজয় (১৩২০)। ইহা ব্যতীত তিনি সোরাব রুস্তাম (১৩১৫) নামক একখানি নাটক-রসক, পুনর্জ্জন্ম (১৩১৭) নামে একখানি প্রহসন এবং আনন্দবিদায় (১৩২০) নামে একখানি প্যারডি-নাট্য রচনা করেন। প্রথমোক্ত নাটক দশখানির মধ্যে বঙ্গনারী ও পরপারে (সামাজিক) এবং ভীষ্ম (পৌরাণিক) ব্যতীত অপর সাতখানি নাটকই ঐতিহাসিক, এবং ভীষ্ম ও সিংহলবিজয় ব্যতীত সকলগুলিই গদ্যে রচিত। চন্দ্রগুপ্ত ও সিংহল-বিজয় নাটকের আখ্যান-বস্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের ইতিহাস হইতে, নূরজাহান ও সাজাহান মোগল সম্রাট্‌দিগের ইতিহাস হইতে এবং প্রতাপ-সিংহ, দুর্গাদাস ও মেবারপতন রাজস্থানের ইতিহাস হইতে গৃহীত। তারাবাই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের রাজপুত-বীরপূজার সূচনা, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস ও মেবারপতন নাটকে তাহার পরিণতি।

নাটক-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখিয়াছেন—"বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakes-peare বার বার পড়িতাম এবং শেষোক্ত কবির যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

"বিলাত যাইবার পূর্ব্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন

অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addisionএর Cato এবং Shakespeareএর Julius Caesarএর আংশিক অভিনয় দেখি, সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয়ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়। * * *

"(প্রহসন রচনার) সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতেছিল। মৎপ্রণীত "সীতা" নাট্যকাব্য নবপ্রভায় প্রকাশিত হয়। পরে "পাষাণী" নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি "তারাবাই" নাটক প্রকাশ করি।

"যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যেও স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু-গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"প্রথমে Shakespeare'এর অনুকরণে Blankverseএ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। "তারাবাই" প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কাপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন

চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespearএর অমিত্রাক্ষর Miltonএর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক্। "Of man's disobedience" ইত্যাদির একটা ঝঙ্কার আছে। কিন্তু "To be or not to be that is the question"—ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্তু তৎপরেই "Who would bear the whips and scorns of time" কিংবা "For in that sleep of death what dreams may come" ইহা দস্তুরমত কবিতা। দেখিলাম যে Shakespeareএ খানিক গদ্য খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা যাবো" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু একত্রে উভয়ই চলে, গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

"Carlyleএর মতে সামান্য হইতে গম্ভীরতম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতর রূপ প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই।

"বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller, Lessing, Ibsen, Moliere ইত্যাদি মহানাট্যকারগণের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schillerএর গদ্যের ভাষাও রূপক অনুপ্রাসে পদ্যের চৌদ্দপুরুষ।

"তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (অবশ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়ঃ। লোকে কথা বার্ত্তা

পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তি-গুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

"এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেই জন্য আমি আমার—তারাবাইয়ের পরবর্ত্তী নাটকগুলি (রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার-পতন ও ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

"যখন উক্ত পদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম তখন একখানি অপেরা (সোরাব রুস্তাম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি। কারণ 'অপেরা'র কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি অনেক স্থলে Shelleyর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়া ছিলাম। বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই?"—("আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ"—নাট্যমন্দির—শ্রাবণ, ১৩১৭)

এই সকল নাটক রচনায় বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন করা দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনে ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় তাঁহার সহযোগী ও প্রধান সহায় হয়েন। মহেন্দ্র বাবু এম্-এ পরীক্ষার সময় Drama বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে নাটক রচনায় তিনি উৎসাহ দিতেন এবং

তাঁহার আগ্রহে ও সহৃদয় সহযোগিতায় এবং গুণগ্রাহিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রচনার উদ্দেশ্য যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছিল সে কথা নাট্যামোদী মাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন—"এমন এক সময় ছিল যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুই একখানি নাটক ছাড়া, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে ভদ্রব্যক্তিরা সেখানে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের এই হাওয়া যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। * * যাঁহারা বাঙ্গালা থিয়েটারে যাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন এমন অনেক ব্যক্তিও ডি, এল্, রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন জানি।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাঁহার (দ্বিজেন্দ্রলালের) নাটকগুলি পাঠ করিলে মোটামুটি যে কথাটা মনে উদয় হয় তাহা এই—মানব-হৃদয়ের বিবিধ ভাব, সেন্টিমেন্ট, প্রবৃত্তি যেন আকার পাইয়া তাঁহার নাটকে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা নাটকে সেন্টিমেন্টের এমন লীলা দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে কোন নাট্যকারই স্বীয় নাটকে দেখাইতে পারেন নাই। তাহার উপর * * তাঁহার নাটক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চসমূহের নাটক রচনার প্রণালীতে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। থিয়েটারী ঢং হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চের নাটক চেষ্টা পাইতেছে। * * থিয়েটারী সাহিত্যে একটা intllectual আবহাওয়াও যে সম্প্রতি প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসংসর্গের ফল।" (ভারতী, আষাঢ়, ১৩২০)

এস্থলে দ্বিজেন্দ্রের উক্ত নাটকসমূহের ইতিহাস একে একে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রতাপ সিংহ।—এই নাটকখানি প্রথমে 'নবপ্রভা' পত্রিকায় পরে, ১৩১২ সালে ১লা বৈশাখ, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে দ্বিজেন্দ্র লিখিয়াছেন "বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের গুরু রসিক উদার ও ভাবুক চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের স্মৃতিস্তম্ভোপরি প্রীতি-মাল্য স্বরূপ সভক্তি সম্মানে অর্পণ করিলাম।"

এই নাটকে কবি স্বদেশ-প্রাণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই প্রতাপ-চরিত্র লইয়াই বঙ্গবাণীর অক্লান্ত সেবক সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "অশ্রুমতী নাটক" রচনা করেন। নটকুলেশ্বর ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর ভাষায় আমরা বলিতে পারি 'অশ্রুমতী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু প্রতাপ-চরিত্র "জ্বালাইয়া" দিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে অপর কাহারও সেই চরিত্র লইয়া নাটক লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা সহজ-সাধ্য নহে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভা সেই পরিচিত চরিত্রকেও নূতন করিয়া আঁকিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অঙ্কিত প্রতাপ-চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের প্রতাপ সিংহের মিল আছে, অথচ সে চিত্র মহান্‌ও উজ্জ্বল। আকবরের চরিত্রের একটা দিক্ দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা মুসলমানদের লিখিত সাধারণের সুপরিচিত ইতিহাস সমর্থন করে না বলিয়া প্রথমতঃ পাঠকের মনে অসন্তোষের উদ্রেক করে বটে, কিন্তু ঘটনার প্রবল প্রমাণ অনুসারে দ্বিজেন্দ্রলালের অঙ্কিত চিত্র যথাযথ বলিয়াই বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থের ভূমিকায় একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট্ আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায় রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐ রূপই বুঝিয়াছি। স্বর্গীয়

বঙ্কিম বাবুও ঐ রূপই বুঝিয়াছিলেন।" দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন, আকবর দূরদর্শী—রাজনৈতিক সম্রাট্—"রিপুর অধীন হইলে তিনি অযথা কার্য্য করিতে পারিতেন।"

এই নাটকে কবি "যোশী"র মুখ দিয়া একটি কামনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয় তিনি নিজের জীবনে সেই কামনা সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"যোশী—এমন কবিতা লেখো, যা পড়ে ভাই ভাইএর জন্যে কাঁদে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে।"

অন্যত্র—"এমন কবিতা লেখো যার গম্ভীর সঙ্গীত বিরাট্ বন্যার মত আর্য্যাবর্ত্তে ছেয়ে পড়ে ?"

কবি এই নাটকে একটি নীতির নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যাহার সাধনা মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি অন্যান্য গ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন—

"ইরা—না বাবা এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যে দিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যে দিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থ লাভ হবে।"

অনত্র—"ইরা—সম্রাট্ মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন, হোন ; তাঁকেও যেতে হ'বে! চিতোর তাঁর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু মনুষ্যত্ব টুকু সঙ্গে যেতো। আমার দেশ—আমার নিয়ে দিবারাত্র এ ভাবনা, এ দ্বন্দ্ব কেন মা ? পৃথিবীতে 'আমার' কি আছে বাবা ?"

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন "কবি তাঁহার প্রতাপ সিংহ নাটকে মুখ্যতঃ এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যদি আদর্শ উচ্চ না হয়, তবে প্রতাপ সিংহের দৃঢ়

প্রতিজ্ঞা এবং বীরত্বও ফলদায়ক হইতে পারে না। প্রতাপ সিংহ যত বড় দেবতা হউন না কেন, তিনি বংশ-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলেন। বংশগৌরব অপেক্ষা যে স্বদেশ অনেক গুণে বড় এবং স্বদেশ বলিতে যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বুঝায় না, একথাও নাটকের দুই তিন স্থলে কবি বুঝাইয়া গিয়াছেন। * * * "প্রতাপ বলিলেন—"শক্ত তুমি আমার ভাই নহ, কেননা তুমি যবনী বিবাহ করিয়াছিলে।" কবি দেখাইলেন যে প্রতাপের মত মহাত্মাও মনের সঙ্কীর্ণতার ফলে ক্ষুদ্র হইয়া গেলেন এবং প্রতাপ-প্রত্যাখ্যাত শক্তসিংহ সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী এড়াইয়া বিশ্বজনের ভাই হইয়া দাঁড়াইলেন।" (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০)

এই নাটকের শক্তসিংহের চরিত্র এবং মেহেরুন্নিসার চরিত্র দ্বিজেন্দ্র-লালের নিজের সৃষ্টি এবং এই দুইটি চরিত্রের উপর তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল। খুলনায় অবস্থান কালে তাঁহার গুণগ্রাহীরা একবার প্রতাপসিংহের অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্র নিজে শক্তসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিনয়ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই নাটকে কবির সুপ্রসিদ্ধ হাসির গান "সাধে কি বাবা বলি"—স্থান পাইয়াছে।

এই নাটকখানি ষ্টার ও মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হইয়া এত জনপ্রিয় হয় যে, ইহা হইতেই দ্বিজেন্দ্রের নাট্যজগতে যশের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাটকখানি প্রথমে ষ্টার-থিয়েটারে পরে মিনার্ভা-থিয়েটার অভিনীত হয়। ষ্টার-থিয়েটারকে অভিনয় করিতে দিয়া প্রথম অভিনয়রজনীর পরের শনিবারই মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতে দিবার দুইটি বিভিন্ন কারণ শুনা যায়। দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, ষ্টার-থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের রজনীতে দ্বিজেন্দ্র বন্ধুবর্গের সহিত অভিনয় দেখিতে যাইবেন বলিয়া উক্ত রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে দুইটি বক্স নির্দ্দিষ্ট রাখিতে বলেন। উক্ত থিয়েটারের

কর্তৃপক্ষগণ কিন্তু সে বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই। ফলে অধর বাবু প্রমুখ দ্বিজেন্দ্রের কয়েক জন বন্ধু বসিবার সুবিধাজনক স্থান না পাওয়ায় বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন ;—অধর বাবু বলেন যে তিনি আর ষ্টার-থিয়েটারে যাইবেন না, এবং দ্বিজেন্দ্রের নিকট ঐ নাটক মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনয় করিতে দিবার প্রস্তাব করেন। মিনার্ভা-থিয়েটারের তৎকালীন অন্যতম স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিত্র এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া পরের শনিবারই ঐ নাটক অভিনয় করিতে স্বীকৃত হয়েন। দ্বিজেন্দ্র প্রথমে বলেন যে ষ্টারে অমৃত মিত্র (এক্ষণে পরলোকগত—অসামান্য প্রতিভাবান্ অভিনেতা) যেমন প্রতাপসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন মিনার্ভা-থিয়েটারের কোনও অভিনেতা সেরূপ পারিবেন না। তদুত্তরে অধর বাবু বলেন, যে দ্বিজেন্দ্র শিক্ষা দিলে 'দানীবাবু' (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—বাঙ্গালার 'গ্যারিক্' গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র) পারিবেন। শেষে দ্বিজেন্দ্র সম্মত হইলে পরের শনিবারই মিনার্ভা থিয়েটারে ঐ নাটক অভিনীত হয়।

ষ্টার-থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে উক্ত ঘটনার কথা বলিলে তিনি বলেন যে ওরূপ ঘটনা হইতেই পারে না এবং হয় নাই। অমৃত বাবু প্রতাপসিংহ নাটক মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনয় করিতে দিবার অন্য একটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন, তিনি শুনিয়াছিলেন যে 'প্রতাপসিংহ' নাটকের অভিনয় কালে তিনি ঐ নাটকের কিয়দংশ বাদ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ৺কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'হলদীঘাট যুদ্ধ' কবিতাটি বসাইয়া দেন, তাহাতেই দ্বিজেন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ নাটক মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনয় করিতে দেন।

দ্বিজেন্দ্রের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র বলেন, অমৃত

বাবুর কথাই ঠিক—"হলদীঘাট যুদ্ধ" প্রতাপসিংহ নাটকের অন্তর্ভুক্ত করাতেই দ্বিজেন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ নাটক মিনার্ভায় অভিনয় করিতে দিয়াছিলেন। একথা তিনি দ্বিজেন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছিলেন। অধর বাবুর কথিত ঘটনা একটি আনুষঙ্গিক কারণ হইতে পারে। পক্ষান্তরে অধর বাবু বলেন যে গিরিশ বাবুর উক্ত "হলদীঘাট যুদ্ধ" কবিতাটির দ্বিজেন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং গিরিশ বাবুর উপরও দ্বিজেন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল—তিনি বলিতেন গিরিশ বাবুর কাছে আমরা অনেক জিনিস শিখিয়াছি।

অমৃত বাবু বলেন, একদিন দ্বিজেন্দ্রকে 'সাধে কি বাবা বলি' গীতটি গাহিতে শুনিয়া তিনি প্রীতি প্রকাশ করেন, এবং অবগত হয়েন যে দ্বিজেন্দ্র একখানি নাটক লিখিয়াছেন তাহাতে ঐ গীতটী আছে। সেই কথা শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অমৃত বাবু ঐ নাটকখানি ষ্টার-থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য লইয়া আসেন। অমৃত বাবু বলেন, তৎকালে দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি হয় নাই, দ্বিজেন্দ্রকে উৎসাহ দিবার জন্যই তিনি নাটকখানি গ্রহণ করেন, এবং ষ্টার-থিয়েটারে 'বিরহ' ও 'প্রতাপসিংহ' অভিনীত হইয়াই দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকার বলিয়া খ্যাতির প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—'প্রতাপসিংহ' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে তিনি নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন "কেমন দেখিতেছেন?" ক্ষীরোদ বাবু উত্তর দেন, "কি আর বলিব, তিন অঙ্কেই দেখি নাটক শেষ হইয়া যায়, কিন্তু শক্ত-সিংহকে একটা লাথি মারিতেই আর দুই অঙ্ক বাড়িয়া গেল, অদ্ভুত ক্ষমতা!" অধর বাবু বলেন, নাট্যাচার্য্য ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দুর্গাদাস—এই নাটকখানি ১৩১৩ সালে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। কান্দীতে অবস্থান কালে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পিতার "দেবচরিত্র" সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে কবি এই নাটকখানি রচনা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই গ্রন্থখানি কবি তাঁহার "চিরারাধ্য পিতৃদেব ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্ম্মার চরণকমলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন," এবং সেই উৎসর্গ-পত্রে ইহাও প্রকাশ করেন যে, তাঁহার পিতৃদেবের চরিত্রের আদর্শেই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কিত।

দুর্গাদাস নিঃস্বার্থ প্রভুপরায়ণতার ও কর্ত্তব্য-পালনের আদর্শ চিত্র। জনৈক সমালোচক (শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল্, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) বলেন, "দুর্গাদাস ও সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। দুর্গাদাসে তিনি এমন একটি চরিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ।" পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ মনস্বী ৺লোকেন পালিত (আই, সি, এস্—ব্যারিষ্টার) মহাশয় "দুর্গাদাস"কে "bundle of qualities"—দোষত্রুটীহীন সদ্‌গুণাবলীর সমষ্টি বলিতেন। সেই ত্রুটী—যদি তাহাকে ত্রুটী বলিতে হয়—দ্বিজেন্দ্রের ইচ্ছাকৃত; দুর্গাদাস আদর্শ চরিত্র। এই নাটকে দুর্গাদাস, দিলীর, কাসিম, ভীমসিংহ এবং যশোবন্ত-মহিষীর উন্নত চরিত্র, শ্যামসিংহ ও শম্ভুজির নীচ—নিকৃষ্ট চরিত্রের পার্শ্বে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই নাটকে দিলীরের মুখে কবি অরণ্যে রোদন করিয়াছেন—"হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট্।" ইত্যাদি।

এই নাটকে কবির প্রসিদ্ধ শ্লেষাত্মক গীত "পাঁচশ বছর এমনি করে" স্থান পাইয়াছে, এবং এই নাটকের "এস প্রাণসখা এস প্রাণে" গীতটির সুললিত শব্দৈশ্বর্য্য উল্লেখযোগ্য।

এই নাটকখানি প্রথমে মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র বলেন, মিনার্ভা-থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ কবিবর ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐ নাটক মিনার্ভায় অভিনয় করিতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে তিনি অধ্যক্ষ ও নাট্যকার থাকিতে বাহিরের লোকের নাটক অভিনীত হওয়া উচিত নয়; তিনিই না হয় একখানি নূতন নাটক লিখিয়া দিবেন। কিন্তু ঐ থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্র বাবু গিরিশ বাবুর সে আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। কিশোরী বাবু বলেন,—গিরিশ বাবু যে মিনার্ভা পরিত্যাগ করিয়া "কোহিনুর" থিয়েটারে যোগদান করেন, এই মতান্তর তাহার অন্যতম কারণ।

দুর্গাদাস নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতে দ্বিজেন্দ্র রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "Here is the author" বলিয়া দর্শকবৃন্দের সমক্ষে দ্বিজেন্দ্রকে দেখাইয়া দেন এবং দর্শকমণ্ডলী দ্বিজেন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে, মিলিতকণ্ঠে তাঁহার নাট্য-প্রতিভার জয়ধ্বনি ঘোষণা করে।

তৎকালে নব্যভারত ও অন্যান্য পত্রে দুর্গাদাস নাটকের প্রশংসাসূচক সমালোচনা বাহির হয়। নব্যভারত মুক্তকণ্ঠে দুর্গাদাসের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"* * * দ্বিজেন্দ্রলাল আজ মানববেশে আমাদের নিকট উপস্থিত নন, তাঁহার লেখনীদ্বারা আজ এক স্বর্গীয় প্রভা বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়াছে। দুর্গাদাস সেই স্বর্গীয় প্রভা। * * * পুস্তক দেশে অনেক হইয়াছে, আরো হইবে; * * যত পুস্তকের কথাই বল—অনেকেই মৃত মানুষের পূতিগন্ধময় কথায় পূর্ণ। প্রেমের কাহিনী, প্রণয়ের গাথা,—

রিপুর উত্তেজনা—বাঙ্গালা সাহিত্য ব্যাপিয়া কেবল পরাধীনতা ও কাপুরুষতার ছবি—কেবল অসার ছবি। * * * এতদিন পরে দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রাণে স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। * * দ্বিজেন্দ্রলাল রুশো ও ভল্টেয়ারের ন্যায় বঙ্গে দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য।

"কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কোন দোষ কি পুস্তকে নাই? "গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বাহুলীন হইলেন"—সমস্ত পুস্তকে দোষের কথা থাকিলে এই একস্থানে আছে। * * আর সর্ব্বত্রই রুচি-মার্জ্জিত, ভাববিশুদ্ধ, লিপিচাতুর্য্য সুন্দর, কবিত্ব অসাধারণ—পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেছি; মনে হয় যেন আত্মত্যাগ মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি; মনে হয় যেন স্বদেশভক্তির এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি। পড়িয়া শেষ করিলাম যখন—মনে হইল কি আশ্চর্য্য কাহিনী পড়িলাম, কি মধুর চিত্র দেখিলাম! এমন তেজঃপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক বাঙ্গালাভাষায় এ জীবনে আর পড়ি নাই, আর পড়িব কি না তাহাও জানি না। * * *

"পুস্তকখানি কি কবিত্ব, কি স্বদেশপ্রাণতা, কি নিঃস্বার্থতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা—এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই তাহা পাইয়াছি। বাস্তবিকই বলিতেছি—দ্বিজেন্দ্রলাল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। * * * (নব্যভারত, চৈত্র, ১৩১৩)

বিরুদ্ধ সমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। জনৈক মুসলমান সমালোচক এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া, ইহাতে মুসলমানদের খর্ব্ব করিয়া হিন্দুদের বড় করা হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দুর্গাদাস নাটকের বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর গ্রন্থকার নিজেই এই পুস্তকের "ভূমিকায়" লিখিয়া গিয়াছেন—

"গত বৎসর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে রাঠোর বীর দুর্গাদাসের বিষয়ে নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি তাহার পরে রাজস্থানে বর্ণিত দুর্গাদাসের জীবনী পুনরায় পাঠ করি। পাঠ করিয়া দেখিলাম যে সে চরিত্র দেবদুর্লভ—স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার জিনিষ। আমি সেই মুহূর্ত্তেই দুর্গাদাস-চরিত লিখিবার সঙ্কল্প করিলাম।"

"বঙ্গীয় ঐতিহাসিক ট্রাজিডি যাহা আছে—তাহার ভিত্তি বিজাতীয়ের হস্তে স্বজাতীয় বীরের পরাজয় ও মৃত্যু। দুর্গাদাস সে শ্রেণীর 'ট্রাজিডি' নহেন। দুর্গাদাস ঔরংজীবের সহিত প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন; এবং রাজসিংহ ও তিনি সম্রাট্‌কে কার্য্যতঃ রাজস্থান হইতে শৃগালের ন্যায় প্রতাড়িত করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের 'ট্রাজিডি'ত্ব (যদি ইহাকে ট্রাজিডি আখ্যা দেওয়া যায়) যবন-রাজার হস্তে হিন্দু বীরের নিগ্রহে নয়; ইহার ট্রাজিডিত্ব কোন হিন্দু রাজার নিকট তাঁহার কোন ভক্ত বীরের নিগ্রহেও নয়; কারণ অজিত সিংহের অকৃতজ্ঞতা দুর্গাদাসকে বিশেষ আঘাত করে নাই। ইহার 'ট্রাজিডি'ত্ব চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার 'ট্রাজিডি'ত্ব ঐ এক কথায়—"ব্যর্থ হয়েছে—পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে।"

"আজ পর্য্যন্ত হিন্দু পাঠক নাটক নভেলে (রাজসিংহ ভিন্ন) কেবল বিজাতীয়ের কাছে স্বজাতীয়ের পরাজয়-বার্ত্তাই পড়িয়া আসিতেছেন। এতদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর এই দুর্গাদাসের বিজয়-দুন্দুভি তাঁহাদের কর্ণে সঙ্গীত বর্ষণ করিবে না কি? রাজস্থানের এই পরিচ্ছেদে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় রাজপুতের বীর্য্যগরিমার উজ্জ্বলতম বিকাশ। রাজস্থানের এই পরিচ্ছেদ লইয়া 'দুর্গাদাস' রচিত। নাটক যেরূপই

হোক না কেন—বিষয় মহৎ। ইহাই বঙ্গীয় পাঠকের উপর আমার দুর্গাদাসের প্রধান দাবী।

"মূল ঘটনার বৃত্তান্ত আমি কেবল রাজস্থান হইতেই লই নাই, অর্ম্মাদির ইতিহাস হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

"ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড্ ও অর্ম্ম্ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে 'সরল ধার্ম্মিক মুসলমান' রূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের দৃঢ় সংকল্প-প্রসূত।" * * *

মিনার্ভা-থিয়েটারে যে সময় দুর্গাদাস অভিনয় হইতেছিল, সেই সময়ে, দ্বিজেন্দ্রলালের মুদ্রিত গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই, তৎকালীন ন্যাশন্যাল থিয়েটারেও "দুর্গাদাস" নামে একখানি নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্র তৎকালে গয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয়কে নিম্নোদ্ধৃত লিপি প্রেরণ করেন—

"পরমাত্মীয়েষু—একটা কাজ করুন। একটি টাকা খরচ করে আগামী শনিবার রাত্রে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে গিয়ে "দুর্গাদাস" অভিনয় দেখে এসে আমায় লিখুন সে দুর্গাদাস আর আমার দুর্গাদাসের মধ্যে প্রভেদ কি? দেখি Plagiarismএর নালিশ চলে কি না। ভয়ঙ্কর চটিয়াছি।

আঃ

গয়া, ২১।১১।০৬ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও উক্তরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটারে "দুর্গাদাস" অভিনয় দেখিয়া আসেন। অধর বাবু বলেন দ্বিজেন্দ্রের পুস্তক যখন ছাপাখানায় মুদ্রিত হইতেছিল, সেই সময়ে উক্ত থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ সেই পুস্তকের

ছাপা ফর্ম্মাগুলি কোনও উপায়ে হস্তগত করেন এবং দৃশ্যের সামান্য অদল বদল করিয়া নাটকখানি অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। যাহা হউক, দ্বিজেন্দ্র আদালতের সাহায্যে উক্ত থিয়েটারকে দণ্ডিত করিতে প্রয়াস পান নাই।

সোরাব রুস্তাম—১৩১৫ সালে রচিত এই নাট্যরঙ্গ (Opera) খানি দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় "বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় (Mr. A. K. Roy, Dy. Magist.) এর করকমলে" উৎসর্গ করেন।

একদিন মিনার্ভা-থিয়েটারে "হিন্দা-হাফেজ" নামক অপেরা দেখিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও তদীয় বন্ধুবর্গ সেই অপেরার কুরুচি দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তৎকালে মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী নাট্যরসিক ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এ, মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলে, দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহাকে বলেন, এমন অশ্লীল অপেরা আপনারা অভিনয় করেন কেন। তদুত্তরে মহেন্দ্রবাবু বলেন যে থিয়েটারের দর্শকগণ এইরূপ না হইলে "নেয় না"। তাহাতে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুগণ প্রত্যুত্তর দেন 'আপনারা যেমন দেবেন তাহারা তেমনই নেবে।' তাহাতে মহেন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলেন "তা'হলে রায় সাহেবকে একখানা সুরুচি-সঙ্গত অপেরা লিখিতে বলুন না।" অধর বাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে সেই কথা বলিলে, তিনি বলেন, "হইতে পারে, ম্যাথু আর্ণল্ডের "সোরাব রুস্তাম" হইতে একখানা অপেরা সহজেই লিখিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে একখানি নাটক নষ্ট হইয়া যায়।" শেষে সোরাব রুস্তাম লিখাই স্থির হয় এবং দ্বিজেন্দ্র ৪।৫ দিনের মধ্যে সেই অপেরা খানি লিখিয়া দেন। কিন্তু মহেন্দ্র বাবু হিন্দা-হাফেজ অপেরার অভিনয় বন্ধ করিতে ইতস্ততঃ করায় (তিনি বলেন ঐ অপেরার অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া অভিনয়

করিবেন), দ্বিজেন্দ্র বলেন তাহা হইলে তিনি সোরাব রুস্তাম মিনার্ভায় না দিয়া কোহিনুরে অভিনয় করিতে দিবেন, এবং কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই ঐ অপেরাখানি দ্বিজেন্দ্র রচনা করেন। কিন্তু পুস্তক রচিত হইলে মহেন্দ্র বাবু হিন্দা-হাফেজের অভিনয় বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরবর্ত্তী শনিবারেই, ১৩১৫ সালের ৩রা আশ্বিন, ঐ নাটিকা খানি মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হয়।

এই নাটিকার দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রিতে রঙ্গালয়ে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। খ্যাতনামা অভিনেতা মিঃ পালিত রুস্তামের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করেন। নাটিকার শেষ দৃশ্যে আছে, রুস্তাম ভ্রম-বশতঃ নিজের পুত্রকে স্বহস্তে সংহার করিয়া শেষে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, মর্ম্মান্তিক শোকে, পাষাণ-মূর্ত্তির মত তিন দিন তিন রাত্রি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। ভাগ্যচক্রে এই নাটিকার দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতে মিঃ পালিতের একমাত্র বালিকা-কন্যার বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া জীবনাবসান হয়। সেই শোচনীয় ঘটনার পর মিঃ পালিত আর রুস্তামের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।

এই নাটিকার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—"এই নাটকের গল্পটি আমি ফর্ডাউসির শাহনামা নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি। ইংরাজ কবি Mathew Arnold এ বিষয়ে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

"এ পুস্তকখানি রচনা করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছু দিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল "হাব-ভাব"সমন্বিত গ্রাম্যরসিকতা শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন, এবং সুরুচি-সঙ্গত নাটক বা নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে সুরুচি-সঙ্গত অপেরা এখন চলে কি না।

"কুরুচি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। ইংলণ্ডেও অভিনেত্রীগণের নগ্নবৎ অবস্থা দেখিবার জন্য Music Hall গুলি প্রতি রাত্রে জনাকীর্ণ হয়। কিন্তু কোন গণ্য থিয়েটারে এরূপ দেখিলে শ্রোতৃবর্গ ব্যঙ্গচ্ছলে হাততালি দেয় ও শিষ্ দেয়। আমাদের দেশে যে দিন শ্রোতৃবর্গ সেইরূপ কুৎসিৎ রসিকতা, বা হাবভাবের প্রতি বিদ্বেষ না দেখাইবে ততদিন সংস্কৃত রুচির দিকে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের অত্যধিক লক্ষ্য প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কারণ শ্রোতৃবর্গকে আদিরস প্রচুর পরিমাণে দিতে পারিলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগের প্রচুর লাভ হয়, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। আর রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের স্বভাবতঃই সাধারণের রুচি-সংস্কারের প্রতি অপেক্ষা নিজের আয়ের দিকে অধিক লক্ষ্য হইবেই। কিন্তু সাহিত্যিকদিগের এ বিষয়ে একটি কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি জাতীয় চরিত্র ও রুচিগঠন করিতে চেষ্টা না করেন, ত বাঙ্গালা সাহিত্য লুপ্ত হইয়া যাউক।

"সোরাব রুস্তাম দস্তুর মত অপেরা নয়—অপেরায় কতকগুলি নাচ গান জোড়া দিবার জন্য যে টুকু কথা বার্ত্তার দরকার হয়, সেইটুকু কথাবার্ত্তাই থাকে। কিন্তু এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ। নাচগান তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আবার এ নাটিকায় প্রথম অঙ্কে যেরূপ নাচগানের প্রাচুর্য্য আছে, কোন নাটকে তাহা থাকে না। অতএব ইহা নাটকও নহে। এক কথায় ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।"

বস্তুতঃ সোরাব রুস্তামের বিয়োগান্ত আখ্যানবস্তু নাটক রচনারই উপযুক্ত, নাট্যরঙ্গের নহে। কবি এই গ্রন্থের প্রথমাংশে হাস্তরসের ও নৃত্যগীতের অবতারণা করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু পরে যখন সেই করুণ-কাহিনীর গভীর আবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন

আর রঙ্গরসের অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই—শেষে নাটক খানিকে চূড়ান্ত ট্র্যাজিডি ভাবেই সমাপন করিয়াছেন।

নূরজাহান—এই নাটক খানি দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় অবস্থান কালে, ১৩১৩ সালে, রচনা করেন এবং ঐ বৎসরই উহা মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কবি লিখিয়াছিলেন "গন্ত সাহিত্যের গুরু, হিন্দুর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাজ্ঞ, মনীষী, দেশব্রত, স্বধর্ম্মরত, ভারতের গৌরব ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি, আই, ইর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে এই নূরজাহান নাটক উৎসর্গীকৃত হইল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন –

"মৎপ্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নূরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দেব-চরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণসমন্বিত মনুষ্য-চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি। তৃতীয় প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি। একজনের এরূপ চীৎকার করিয়া স্বগতোক্তি যাহা সমস্ত শ্রোতৃগণ শুনিতে পাইতেছেন কেবল তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান নট-নটীই শুনিতে পাইতেছেন না, এ অনিবার্য্য ব্যাপার আমার কাছে একটু হাস্তকর ঠেকে।"

প্রথম প্রভেদটির একটু ইতিহাস আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের, 'দুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধু মনস্বী ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত (আই, সি, এস্,) মহাশয় বলেন, যে দুর্গাদাস-চরিত্র "bundle of qualities"—(সদ্‌গুণের সমষ্টি) হইয়াছে, যদি গুণের সঙ্গে weakness এর উল্লেখ

থাকিত তাহা হইলে চরিত্র আরও ফুটিত। পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রকে নির্দ্দোষ বা আদর্শ চরিত্র ছাড়িয়া দোষে গুণে মিশ্রিত বাস্তব চরিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। সেই উপদেশ বা অনুরোধের ফলেই নূর-জাহান চরিত্রের সৃষ্টি। নূরজাহান নাটক রচিত হইলে পালিত মহাশয় বলেন, "দ্বিজু, এই বার তুমি ঠিক নাটক লিখিয়াছ।"

তৃতীয় প্রভেদটির সম্বন্ধে কবির বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই নাটকের সমালোচনায় লিখিয়াছেন—"এ দৃশ্য কাব্যে "স্বগত" নাই। শ্রাব্য কাব্যে অনেক কথা বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চলে, শ্রাব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য রচনা একটু শক্ত; তাহার উপর স্বগত অবলম্বনে যে সাহায্য টুকু পাওয়া যায় তাহাও যদি না থাকে, তবে সুকৌশলের প্রয়োজন খুব অধিক হইয়া পড়ে। কবি যে এই সুকৌশল সম্পূর্ণরূপেই দেখাইয়াছেন তাহা কাব্য না পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে না।" (প্রবাসী ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।)

দ্বিতীয় প্রভেদ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীয় বক্তব্য স্ফুটতর করিয়া লিখিয়াছেন—"এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি। পূর্ব্বে যে তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাই নাই তাহা নহে, অহল্যায়, সূর্য্যমল্লে, শক্তসিংহে, মেহেরুন্নিসার ও ঔরংজীবে সে অন্তর্বিরোধ বোধ হয় কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি। কিন্তু নূরজাহানে সেটি দেখাইবার যতখানি প্রয়াস পাইয়াছি, ততখানি প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই। নূরজাহানের মনের উপর দিয়া প্রবৃত্তির উপর প্রবৃত্তির ঢেউ চলিয়া যাইতেছে, পাঁচ ছয় প্রকার ভাব আসিয়া উপর্য্যুপরি তাহাকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য চরিত্রটি বিশেষ জটিল হইয়াছে। জনসাধারণের কাছে, বিশেষতঃ

কোনও কোনও সমালোচকের এ চরিত্রটি বোধ হয় একেবারে দুর্ব্বোধ ঠেকিবে।”

কবির আশঙ্কা ভিত্তিহীন না হইলেও, নূরজাহান-চরিত্র রসগ্রাহী পাঠকের নিকট উপভোগের যোগ্য বলিয়া উচ্চসমাদর পাইয়াছে এবং এই নাটক রচনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া সাহিত্য-সংসারে অভিনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “নূরজাহান মনস্তত্ত্বের সুগভীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম সুনিপুণ বিশ্লেষণ নূরজাহান-চরিত্রকে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছে—বাঙ্গালায় আর কোনও নাটকে এভাবের চরিত্র বিকাশ দেখি নাই।” (ভারতী, আষাঢ়, ১৩২০)

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—“নূরজাহান-চিত্রে কবি যে চরিত্র-জটিলতা আঁকিয়াছেন তাহার প্রতি-রেখা বর্ণ-বৈচিত্র্যে এবং ভাবের উদ্বোধনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে।” বিজয় বাবু তাঁহার এই কথা বুঝাইবার জন্য নূরজাহান-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া যে সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—“প্রথম দৃশ্যে নূরজাহান অথবা মেহেরউন্নিসাকে দেখিতে পাই স্বামী কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী লইয়া “অতুল চিত্তবিমোহন সুরধামে।” মেহেরের মনে যে তখন কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বীজ ছিল * * তাহা গভীর প্রণিধান না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। * নূরজাহানের মনে দুঃস্বপ্ন ছিল, তাই সে অত সুখ সহিবে না ভাবিতে ছিল। তাই জোর করিয়া আপনার পারিবারিক সুখের কথা অত করিয়া আলোচনা করিতেছিল। * * আগ্রার নামে চমকটুকু ঠিক এই দৃশ্যে না থাকিলেও চলিত। * * * মেহেরের পতি শের খাঁ সরল-স্বভাব, উদার-প্রকৃতি, সাহসী, বীর ও ধর্ম্মভীরু। মেহের সেই দেব-

প্রীতি সাধনায়, স্বপ্ন ও ছায়াশূন্য সমাধিলাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কোন্ ছিদ্র দিয়া আসিয়া শনি স্কন্ধে চাপে তাহা কেহই জানে না। * * বালিকা সৌন্দর্য্যের দম্ভে ও যৌবনের খেয়ালে একটুখানি রঙ্গলীলা করিয়াছিল বইত নয়। কিন্তু * * * শনির দৃষ্টি একবার পড়িলে, না পোড়াইয়া ছাড়ে না। লালসা এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার হুতাশন হইতে চিত্রিত পতঙ্গটি বহুদূরে ছিল, নিয়তির বাত্যাতাড়নে সে আগ্রায় গেল।

"শের খাঁর মত বীরের পত্নীর মনের মধ্যে ছায়া লুকাইয়া ছিল, একথা—মেহেরের পক্ষে ঘুণাক্ষরে কাহারো কাছে প্রকাশ করা অসম্ভব। * * তবুও মেহেরউন্নিসা আগ্রায় এক সখীকে ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সদ্‌বুদ্ধির উপদেশ চাহিল। এই ক্ষুদ্র দৃশ্যটির কৌশলময় অবতারণায় কবি বুঝাইয়া দিলেন, যে সুন্দরীর অন্তরের মধ্যে এমন ঝড় বহিতেছিল, যে সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছিল না। * * চতুর্থ দৃশ্যটি পড়িয়া দেখ, উহার একটি কথায় কোন জোর নাই * * কিন্তু নূরজাহান বাহ্যিক স্থিরতা দেখাইলেও তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল।

"শের খাঁ বুঝিয়া ফেলিলেন তাঁহার সুখ গিয়াছে; তিনি তখন মৃত্যুর আহ্বানে অগ্রসর হইলেন। * * উহার পর যখন শের খাঁ মরিয়া গেলেন, তখনো নূরজাহানের অন্তর্বিরোধ ছিল। কেননা লয়লার মুখে শুনিতে পাই—যে মেহের পোষা পাখীটির মত ধরা দিয়াছিল। লয়লার সন্দেহের কারণ ছিল; নচেৎ সে হ্যামলেটের মত ক্রমাগতই হতভাগিনীর মনে পিতৃস্মৃতি জাগাইয়া দিতে আসিত কেন? কিন্তু যখন নূরজাহান পিতা ও ভ্রাতার সুখসম্পদের কথায়ও বিবাহে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু শেষে প্রতিহিংসার কথায় নূতন আলোক পাইয়া উৎসাহিতা হইয়া উঠিল, তখন কি বালিকা লয়লার অনুমান অস্বীকার করিতে হইবে?—

না। * * নূরজাহান অবশ্য বলিয়াছিল যে, সে শয়তানীর প্রভাব প্রায় দমন করিয়া আনিয়াছিল, * * কিন্তু কেবল প্রতিহিংসার জন্য নুরজাহান বিবাহ করে নাই, মুখে যাহাই বলুক, কথা তাহা নয়। * * বুদ্ধিমতী নূরজাহান, উদ্‌ভ্রান্ত জাহাঙ্গীরের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, যে সম্রাটের ক্ষমতা তাহার পদতলে। * * কেবল কি সেই ক্ষমতার পিপাসায় সে উত্তেজিতা? মূলে কি ভোগ-লালসা ছিল না? * * একটু লালসার বাতাস না বহিলে, শুধু যৌবনগর্ব্বে, শুধু খেয়ালে, মুখের কাপড় উড়িয়া যাইত না। কিন্তু নূরজাহান যে-সে মেয়ের মত চপলা নয়, তাহার আত্মসম্মান বোধ ছিল, সে বুদ্ধিমতী ছিল। * * তাই সে প্রাণপণে দেবতা লইয়া ঘর-সংসার করিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যথেষ্ট যুদ্ধ করিয়ছিল; কিন্তু ঘটনা তাহার অনুকূল হয় নাই। সে দেখিয়াছিল যে ক্রমাগতই নিয়তির তাড়নায় সে যেন ফাঁদে পড়িতেছিল। * * প্রবল আত্মসম্মান বোধ, এবং লয়লার তিরস্কার চারি বৎসর তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। * * নূরজাহান যে লয়লার একদিনকার হঠাৎ রাগের কথায় বড় একটা পাপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা নয়। * * অতি ক্ষুদ্র লুকানো, নিস্তেজ পাপও একবার প্রশ্রয় পাইলে সকল পুণ্য গ্রাস করিতে পারে; তাই নূরজাহান বিষম আবর্ত্তে পড়িয়াছিল। * * আপনার সুখের মাত্রা চড়াইতে গিয়া, আপনার ক্ষমতা অটুট রাখিতে গিয়া, যে যত পাপ করিয়াছিল, তাহাতে সে নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী যে দিন মদমত্ততার আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূরজাহান, তুমি দেবী না মানবী?" সে দিন নূরজাহান বিকৃতকণ্ঠে বলিয়াছিল "আমি পিশাচী!" এই রকমের গোটাকতক কথা, নূরজাহান-চরিত্রের অসীম সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জাগিয়া উঠিয়া সমুদ্রের প্রসার দেখাইয়া দিতেছে।

"নূরজাহান যদি প্রতিহিংসার জন্যই কাজ করিতেছিল এবং গৌরবের জন্যই লালায়িত ছিল, তাহা হইলে মহাবতের কাছে পরাজিতা হইয়া সে কাঁদিয়া কাটিয়া প্রাণরক্ষা করিত না। যাহারা ক্ষমতার জন্য পাগল এবং প্রতিহিংসায় উত্তেজিত, তাহারা অতি যৎসামান্য পরাজয়েই আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। নূরজাহান সুন্দরী, নূরজাহান মোহিনী, তাহার রূপ-মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য ঘূর্ণিত হইয়াছিল। যে দিন নিয়তির নির্ম্মম ফুৎকারে সে ভেল্‌কি উড়িয়া গেল, সে দিন সে পাগল হইয়া গেল। তীব্র লালসার এই শেষ ফল, তাহার ঐরূপ পরিণাম মড্‌সলের মস্তিষ্করোগ প্রবন্ধেও দেখিতে পাই। * * এই গ্রন্থে মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে কবি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শিল্পের সহিত মিলিয়া মণিকাঞ্চন-যোগ হইয়াছে।" (প্রবাসী, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু কবিবর ৺বরদাচরণ মিত্র (সি এস্) মহাশয় বলিতেন, "দ্বিজুর মত সরল প্রকৃতির লোক জটিল দুর্ব্বোধ চরিত্র আঁকিতেই পারেন না। দ্বিজু যে তাঁহার নূরজাহান-চরিত্র জটিল ও দুর্ব্বোধ বলেন, সেটি তাঁহার ভ্রম। নূরজাহান-চরিত্র দুর্ব্বোধ হয় নাই—সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ বিজয় বাবু নূরজাহান-চরিত্রের যে জটিলতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা গভীরভাবে প্রণিধান করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় না; নূরজাহান নিজ মুখে বলিলেও—আত্ম-প্রতারণা করিলেও—তিনি যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সম্রাট্‌কে বিবাহ করেন নাই, তাঁহার মনের মধ্যে ক্ষমতার ও গৌরবের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে ভোগ-লালসাই প্রচ্ছন্নভাবে বলবতী ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দ্বিজেন্দ্রের সারল্য ও কলা-কৌশল সে কথা বুঝিবার পথ সর্ব্বত্র সুগম করিয়া দিয়াছে।" বিজয় বাবু বলিয়াছেন "এই নাটকে 'স্বগত' নাই।

সেটি বিজয় বাবুর ভ্রম। এই নাটকে "দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারো স্বগতোক্তি নাই" কিন্তু একাকী স্বগতোক্তি আছে, এবং সেই স্বগতোক্তি অনেক স্থলে বহুভাবাক্রান্ত নূরজাহান-চরিত্রের তথাকথিত জটিলতা সরল করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নূরজাহানের "এও একটা নেশা। ক্ষমতার প্রায় শিখরে উঠেছি, তবু আরও উঠতে চাই" ইত্যাদি এই স্বগতোক্তিটি মাত্র এস্থলে উল্লেখ করিলাম। এরূপ অনেক আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটক খানির সহিত তাঁহার অপরাপর নাটকের যে তিনটি প্রভেদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত এই নূরজাহান নাটকের আর একটি নূতনত্ব আছে—ইহার ভাষা। কবি গদ্যে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া যে কবিত্বময়ী ভাষার সৃষ্টি করিতেছিলেন, নূর-জাহান নাটকে তাহার চরম বিকাশ। তাঁহার সেই গদ্যে কাব্য-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির এস্থলে কয়েকটি নমুনা দিলাম—

"শের। হাঁ, অন্যায় আমার! তবু আমায় দূষো না মেহের! মনে ক'রে দেখো সে কি প্রলোভন! যে দিন তুমি আমার উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টিপথে উদয় হয়েছিলে—হে সুন্দরি! যখন আমার উন্মুখ বাসনার মাঝখান দিয়ে তোমার রূপের শকট চালিয়ে দিলে, যখন জীবনের ধ্যান শরীরী হয়ে আমার জাগ্রত স্বপ্নে এসে দেখা দিলে, আমি আপনার মধ্যে আপনাকে ধরে রাখতে পার্লাম না। আমি মানুষ! দুর্ব্বল মানুষ মাত্র। আর সে আমার প্রথম যৌবন মেহের! প্রথম যৌবন! যখন আকাশ বড়ই নীল, পৃথিবী বড়ই শ্যামল, যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার স্ফুলিঙ্গ, গোলাপ ফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত, যখন কোকিলের গান একটা স্মৃতি, মলয়-সমীরণ একটা স্বপ্ন, যখন প্রণয়ীর দর্শন উষার উদয়, চুম্বন সজল বিদ্যুৎ, আলিঙ্গন আত্মার প্রলয়।"

"জাহাঙ্গীর—সেদিন গবাক্ষপথে দেখলাম কি মূর্ত্তি! যেন তুষারের

উপর উষার উদয়, যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত! সে একটা নিঃসঙ্গসুখের মত নয়, একটা মধুর রাগিণীর মত নয়, একটা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নয়! সে যেন একটা আনন্দের উদ্যান, একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ—কল্লোল, একটা মহিমার সমারোহ। সে যেন ভারতের নয়, ইরাণের নয়, আরবের নয়, ভূত ভবিষ্যৎ কি বর্ত্তমানের নয়; স্বর্গের নয়, মর্ত্ত্যের নয়। সে যেন সব দেশের, সব কালের, স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের উভয়েরই দেখবার জন্য উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক্ সৃষ্টি! যেন দেবতার প্রেরণা, কবির সফল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়! কি সে মূর্ত্তি!"

"শারিয়ার—চেয়ে দেখ এই বিশ্বজগৎ! চেয়ে দেখ ঐ হিরণ্ময়ী সন্ধ্যা আকাশের নীল হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ হিন্দোলিত পবন শ্যামা ধরিত্রীকে আলিঙ্গন করছে। ঐ ভ্রমর চম্পক-কলিকার মুখ চুম্বন করছে —বিশ্বজগতে কে একলা আছে লয়লা?"

"জাহাঙ্গীর—কি মধুর এই সঙ্গীত নূরজাহান! সে বাসনা জাগিয়ে তোলে অথচ পূর্ণ করে না। নন্দনের সৌরভ এনেই তাকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়; সৌন্দর্য্যের আবরণ খুলেই অমনি একটা ঘন নীল মেঘ দিয়ে তাকে ঘিরে নিয়ে চলে যায়! হাউয়ের মত উঠে হাহা করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।"

এ নাটকে যদিও কবি কোনও নীতি প্রচার করিতে বা উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই, তথাপি স্বজাতির ও স্বদেশের উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায়ের কথা তাঁহার হৃদয়ে সদাই বাধা দিত, সে সকল কথার প্রসঙ্গক্রমে কবির লেখনী হইতে পাত্র ও পাত্রিগণের মুখে স্বতঃই নিঃসৃত হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দিলাম:—

"কর্ণসিংহ—যখন মনে হয় মহাবৎ খাঁর মত ধর্ম্মভীরু কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে

গুটিকত আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার বলে' জাতির মধ্যে আলিঙ্গন করে নিতে পারি না, তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে জীবন সেখানে বাহিরের জিনিস টেনে নিজের করে নেয়। আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হয়ে নিজেই গলে খসে পড়ে।"

"কর্ণ—এ সাম্রাজ্য আমরা যদিও পুনরধিকার করি, তা রাখতে পার্ব্বো না। কারণ আমি ভেবে দেখছি যে যতদিন আমরা হিন্দু জাতি আবার মানুষ হতে না পারি, ততদিন হিন্দুর সাম্রাজ্য বিকারের স্বপ্ন।"

পাত্র পাত্রীর মুখ দিয়া কবি দুই চারিটা সরল সত্য ও নীতি কথাও এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—

"খাদিজা—সাম্রাজ্য! বাহিরের সম্পত্তির জন্য মানুষ এত লালায়িত! যখন প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর একটি অতুল সম্পত্তি অনাদৃত ভাবে পড়ে রয়েছে।"

"রেবা—আমরা হিন্দু জাতি, বিলিয়ে দিতেই জন্মেছি। বল দেখি এই ভারতবর্ষই কি এই রকমেই আমরা তোমাদের হাতে বিলিয়ে দিই নি। আমাদের আশা এখানে নয় মেহের—আমাদের আশা ভরসা (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) ঐখানে।"

এই রেবা (মানসিংহের ভগ্নী, জাহাঙ্গীরের হিন্দু মহিষী) চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। প্রতাপসিংহ নাটকে আমরা রেবার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। সেই নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যকার অমর তুলিকার কয়েকটি মাত্র রেখাপাতে রেবার চিত্র এরূপ সুন্দর ও উজ্জ্বল ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, সেরূপ চরিত্র-বিকাশ সর্ব্বোত্তম নাট্য-শিল্পীর শ্লাঘার বিষয় বলিয়া অভিনন্দিত হইতে পারে। নূরজাহান নাটকে রেবা-চরিত্রের সেই রেখা-চিত্র চিত্তহারী বর্ণসম্পাতে উজ্জ্বলতর ভাবে বিকশিত

হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম হইতেই, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আমরা রেবা-চরিত্রের মহিমময় স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যাই। নাটকের সর্ব্বত্রই রেবা-চরিত্রের সেই গৌরব ও তেজোময় মাধুর্য্য দেদীপ্যমান।

মেবার পতন—এই নাটকখানি ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। কবি এই নাটকখানি "অমিত-প্রভাব, অক্ষয় কীর্ত্তি, অমর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবির উদ্দেশে" উৎসর্গ করিয়াছেন। এইখানি তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য-মূলক নাটক।

কবি যৎকালে দুর্গাদাস নাটক রচনা করিতেছিলেন সেই সময়েই "মেবার পতন" নাটক রচনারও আনুষঙ্গিক ভাবে সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য-ঋষি Tolstoi এর উপর দ্বিজেন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। টলষ্টয় যে বিশ্বপ্রেমের প্রচার করিয়া গিয়াছেন—দ্বিজেন্দ্র এই নাটকে সেই বিশ্বপ্রেমের নীতির সহিত তাঁহার হৃদয়ের সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।

কবি ভূমিকায় বলিয়াছেন "মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটি পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়-চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ-চরিত্র, এবং সীতাতে আদর্শ নারী-চরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাই ও নূরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য-চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সে নাটকগুলিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য-প্রেম, জাতীয়-প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের

মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই—নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক। * *"

এই নাটকে কবি ইহাই বুঝাইয়াছেন যে জাতিকে উন্নত করিতে হইলে মনের সঙ্কীর্ণ ভাব ঘুচাইতে হইবে—দেশপ্রীতির নামে মনকে খর্ব্ব করিলে চলিবে না—হৃদয়কে উদার করিতে হইবে—মানবতা লাভ করিতে হইবে। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে মনের সমস্ত শক্তি, প্রাণের গভীর আবেগ দিয়া বলিয়াছেন—'আবার তোরা মানুষ হ'—এবং কি করিয়া সেই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে তাহার পথও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—তিনি বিশ্বপ্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছেন—

"মানসী—যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড় তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্। দেশস্বাধীনতা ডুবে যাক্, এ জাতি আবার মানুষ হোক।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না! আমাদের সেই সাধনা হোক। উচ্চ সাধনা কখন নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যে দিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজে আবার ভাবতে শিখবে, যে দিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে, যে দিন তারা যা উচিত—যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে

তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না, যে দিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে নবধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী!

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালোবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালোবাস্‌তে শিখতে হবে। তারপরে আর তাদের নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়া নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। * * * শত্রু মিত্র জ্ঞান ভুলে গিয়ে। বিদ্বেষ বর্জ্জন করে। নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে' দিয়ে।—গাও চারণীগণ * * *

কিসের শোক করিস ভাই!—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ'॥
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর, আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক,—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে;
সবার বাড়া শত্রু সে; আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎজুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পর রাঙায় চোখ,
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক্;
ধর্ম্ম যথা সেথায় থাক্; ঈশ্বরের মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক, আবার তোরা মানুষ হ'।"

এই গীতটিকে আমরা দ্বিজেন্দ্রের "আমার দেশ" মহাসঙ্গীতের টীকা-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। দ্বিজেন্দ্রের উপদেশ আগে "মানুষ হও," তাহার পর দেশের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার অধিকারী হইবে।

এই নাটকেও কতকগুলি উচ্চকথা, ভাবিবার কথা, শিক্ষা কথা আছে। যেমন—"মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে যায়, ত তারা আবার গোটা কতক হিন্দুকে মুসলমান করে আবার লড়্‌বে। হিন্দুরা * * মুসলমানকে হিন্দু কর্ব্বে কি! যারা একবার কারে পড়ে মুসলমান হয় তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না।"

"যাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশে আছে তারা পরস্পরকে ভাল না বেসে ঘৃণা করতে পারে?"

"পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এতদিন স্বার্থের রাজ্যে বাস করছিলাম। সে দিন ত্যাগের রাজ্য দেখলাম। সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ; সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুকম্পা, পুরস্কার বলিদান। আমি সে দিন থেকে সেই রাজ্যের প্রজা হ'লাম—যে হস্তে কখন তরবারি ধরি নাই সে হস্তে আর্ত্তরক্ষার্থে তরবারি ধর্লাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত কুসুমের মত কোমল বোধ হোল। * * আগে মর্ত্তে ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু আর ভয় করি না।"

এই নাটকের জন্যই কবি "মেবার পাহাড়" নামে বিখ্যাত সঙ্গীত-দ্বয় ও "জাগো জাগো পুরনারী" হৃদয়োন্মাদনকারী সঙ্গীতটি রচনা করেন। গয়ায় অবস্থান কালে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। কবির অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল

সময়ে (গয়ায় অবস্থান কালে ও তাঁহার মহাসঙ্গীত 'আমার দেশ' রচনার সময়ে) তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক 'নূরজাহান' মুদ্রিত করিয়া "মেবার পতন" রচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। * * কবিবর "মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উর্দ্ধ শির" ইত্যাদি যে গানটি লেখেন, এই হতভাগ্য তখন তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। গীতটি গ্রথিত হইলে, আমি মেবারের পতন বিষয়ে আর একটি যোগ্য গান রচনা করিতে বলিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় আর একটি গান লিখিত হইল—

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত নিশান ওড়ে না আর।"

সুর সংযোগ করিয়া সঙ্গীত দুইটি আমায় গাহিয়া শুনাইলেন।

এই নাটকখানি মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হয়, এবং নাট্যামোদী জনসমাজে যেমন সমাদৃত, সাহিত্য-সংসারেও সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই নাটকের মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনয় প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ যোগ্য। এই নাটকে গোবিন্দসিংহের সঙ্গে তাঁহার কন্যা কল্যাণীর যে বাদানুবাদ ও শেষে বিধর্ম্মী পতি মহাবৎখাঁর সঙ্গলাভের জন্য পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিবার কথা আছে, তাহা শুনিয়া উক্ত থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের পিতা বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ওরূপ দৃশ্য এদেশে কুশিক্ষা ও কুফলপ্রদ এবং তিনি ঐ নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার পরামর্শ দেন। অবশ্য সে পরামর্শ গ্রাহ্য হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রের স্বপক্ষগণ এই প্রসঙ্গে দক্ষালয়ে পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ঘটনার নজির দিতে পারিতেন—যদিও সাদৃশ্যটি ক্ষীণ—সতী পিতার গৃহ ত্যাগ না করিয়া নিজের প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ তদীয় "বঙ্গবাণী" পুস্তকে

লিখিয়াছেন (১৫১ পৃঃ)—"স্থায়ী সাহিত্যের রীতি কিংবা আদর্শে নিষ্ঠা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র, শীলারের সমকক্ষ না হইলেও, পরিব্যপ্ত মহত্ব এবং পরিপ্লাবী হৃদয়োচ্ছ্বাসের ঘটনায় স্বদেশের এবং জাতীয়ত্ব সাধনার ক্ষেত্রে তিনি শীলারকেও অতিক্রম করিয়াছেন; এবং এই বিষয়ে, তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'মেবার পতন' যে অতুলনীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই কাব্যের "মেবার পাহাড়" হইতে আরম্ভ করিয়া, 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস, এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে পাকে এমন অপরূপ অলোক মধুর তরঙ্গভঙ্গ, এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটা সুমার্জ্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতীয় জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক্ বিবেচনা করিলে, উহাকে তাঁহার এই যুগের সর্ব্বগুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়! আমাদের জাতীয় জীবন সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়।"

সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলালের মোগল-ঐতিহাসিক নূরজাহান ও সাজাহান নাটক দুইখানিতেই তাঁহার নাট্যপ্রতিভার চরমবিকাশ হইয়াছে বলিয়া রসজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন। এই নাটকদ্বয়ে নাটকীয় সৌন্দর্য্য ও চরিত্র-বিকাশ ব্যতীত তিনি কোনও নীতির প্রচার করিতে প্রয়াস পান নাই, এবং সে হিসাবে এই দুইখানি নাটককে উদ্দেশ্যহীন বলা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা সুকুমার-শিল্পকলার মূলে কোনও উদ্দেশ্য থাকিলে শিল্প-সৌন্দর্য্যের সর্ব্বোত্তম বিকাশ হয় না; Art for art's sake হইলে কলা-প্রতিভা যেরূপ পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তিপায়, উদ্দেশ্য থাকিলে সেরূপ পায় না। সাহিত্যক্ষেত্রেও এরূপ ধারণা সমর্থন করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল ও

বিষবৃক্ষকেই সাহিত্যরসিকেরা তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ;—সেই দুইখানি উপন্যাসই দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ প্রভৃতির মত উদ্দেশ্য-মূলক নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটিয়া যায়। হয়ত ইহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, কিন্তু ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। এই নাটকদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌খানি শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; এ বিষয়ে পাঠকের বিভিন্ন রুচি অনুসারে মতভেদ আছে। একদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে নূরজাহানকেই দ্বিজেন্দ্রের "শ্রেষ্ঠ নাটক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আর একদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল্, মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) লিখিয়াছিলেন, "সাজাহানকে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না ; জগতের সমক্ষে দেখাইবার মত বাঙ্গালা সাহিত্যে যে দুই একটি বস্তু আছে তাহার মধ্যে এই একটি।" যাহা হউক, এই মতভেদের মীমাংসা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না—আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' উভয় নাটকই নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রের অতুলকীর্ত্তি।

"সাজাহান" ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। কবি এই নাটকখানির উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন—"মহাপুরুষ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে এই সামান্য নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।" এই "সামান্য" নাটকখানি মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চবিলাসী জনগণের নিকট ইহা এরূপ স্থায়ী সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিল যে, কবির অপর কোনও নাটকই বোধ হয় সেরূপ আদর পায় নাই। কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের "প্রহ্লাদচরিত্র" যেরূপ বঙ্গরঙ্গভূমির প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল—গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা ও বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" যেরূপ ষ্টার-

থিয়েটারের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—'ডি-এল, রায়ের সাজাহান'ও সেইরূপ মিনার্ভা-থিয়েটারের গৌরব ও সুনাম বর্দ্ধন করে। খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, যথাক্রমে ঔরঙ্গজেবের এবং সাজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েন। ছাত্র-সমাজে এবং সখের থিয়েটারেও অভিনীত হইয়া সাজাহান নাট্যামোদী জনগণের নিকট অভূতপূর্ব্ব আদর প্রাপ্ত হয়। মৃজাপুর ফিনিক্স ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যবৃন্দের অনুষ্ঠিত অভিনয়ে স্বর্গীয় অমূল্যরতন সিংহ সাজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উচ্চ নট-প্রতিভায় দর্শকগণকে বিমুগ্ধ করেন। অচিরকাল মধ্যে সাহিত্য-সংসারেও সাজাহান, কবির শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। সেই খ্যাতি এখনও অটুট আছে। কবির কোনও পরবর্ত্তী রচনা সাজাহানের সে গৌরব হরণ করিতে পারে নাই। সকল দিক্ দিয়া দেখিলে প্রফুল্লকুমার বাবুর উক্ত অভিমত অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না—সম্ভবতঃ কালের বিচারে এই নাটকখানিই কবির শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বরিত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে এই মহানাটকের একটি অনতি-বিস্তারিত সমালোচনা লিখিয়া আমি ১৩১৭ সালের 'সাহিত্য'পত্রে (মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায়) প্রকাশ করি। সেই সমালোচনায় আমি সাধারণ ভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা কবির অপরাপর ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সেই সমালোচনাটির সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

ঐতিহাসিক নাটকের রচনা উভয় সঙ্কটের কথা। ইতিহাস রক্ষা করিতে গেলে কল্পনাকে খর্ব্ব করিতে হয়; অথচ কল্পনার গতি অবারিত না রাখিলে নাটক উৎকৃষ্ট হয় না। সেই জন্য সুপরিচিত ঐতিহাসিক-চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর নাটক রচনা করা এক প্রকার

অসম্ভব। সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটক হ্যামলেট্, লীয়ার, ওথেলো, বা ম্যাকবেথের উপাদান যে ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, সে ইতিহাস প্রবাদের অন্ধকারে মিশিয়া আছে। পরন্তু নাটকের প্রধান চরিত্র যদি পবিত্র বা উন্নত না হয়, তাহা হইলে সে নাটক উচ্চ অঙ্গের হয় না। কারণ, নাটকের প্রধান চরিত্রের কণ্ঠেই কবি তাঁহার নিজের কথা—অন্তর্জীবনের গভীর তত্ত্ব—প্রতিভাদীপ্ত ভাষায় ধ্বনিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সে চরিত্র অপকৃষ্ট হইলে কবি সেই সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন না, অপাত্রে ন্যস্ত হইলে কবির উক্তি অস্বাভাবিক শুনায়। ভাবুক হ্যামলেটের, বা উন্মাদ লীয়ারের মুখে সেক্সপীয়র মনোরাজ্যের যে সকল উচ্চ কথা বা মানব-হৃদয়ের গভীর তত্ত্ব উচ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, কৃতঘ্ন ও ঘাতক ম্যাকবেথের কণ্ঠে সেরূপ পারেন নাই। ম্যাকবেথ, জীবনের যে হত্যা-কলুষিত ও পাপপঙ্কিল স্তরে বিচরণ করিয়াছেন, সে স্থান হইতে মনের উন্নত বা পবিত্র স্তরে তাঁহাকে উত্তোলন করিবার ক্ষমতা সেক্‌সপীয়রেরও সাধ্যাতীত। বারত্রয়মাত্র ম্যাকবেথের বিভ্রম-ত্রস্ত, শোকতপ্ত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া কবি যেন অতর্কিতভাবে নিজের কণ্ঠ ধ্বনিত করিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত কারণে ম্যাকবেথ নাটক লীয়ার বা হ্যামলেট্ নাটকের সহিত তুলনায় উচ্চ অঙ্গের নাটকের হিসাবে নিকৃষ্ট; অথচ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী নাটকের (Stage play) হিসাবে ম্যাকবেথ্ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

সাজাহান সুপরিচিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তাঁহার জীবন-কাহিনী মহৎ, পবিত্র, বা আদর্শ চরিত্রের অনুকূলও নহে। এ কথা নাট্যকারের অবিদিত ছিল না। তিনি সাজাহান নাটক উচ্চাঙ্গের শ্রাব্য নাট্যকাব্য ভাবে রচনা করেন নাই,—দৃশ্য নাটকভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যই লিখিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাউক, সাজাহান নাটকের চরিত্রগুলিকে

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করিতে গিয়া কবি ইতিহাসের বাধা অতিক্রম করিতে কত দূর সক্ষম হইয়াছেন।

নাট্যকার সাজাহানকে স্থবির, সন্তান-স্নেহ-প্রবণ, কোমলপ্রাণ, শান্তি-প্রয়াসী ও ক্ষমাশীল রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃশ্যেই সাজাহানের চরিত্র কবির ইচ্ছানুরূপ আকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ছবি সর্ব্বত্রই নিপুণ বর্ণরাগে উজ্জ্বল, কোমল তুলিকা-স্পর্শে সুন্দর। সাজাহান যখন বিদ্রোহী পুত্রগণকে শাসন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন,—"বেচারী মাতৃহারা পুত্র-কন্যারা আমার। তাদের শাসন করবো কোন্ প্রাণে জাহানারা। ঐ চেয়ে দেখ, ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস-ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ, তার পর বলিস্ শাসন কর্ত্তে।" তখন তাঁহার অপত্য-স্নেহের গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, তাঁহার চতুর্দ্দশ সন্তানের জননী, প্রিয়তমা বেগম মমতাজের উপর জীবনব্যাপিনী মমতার কথা মনে পড়ে, তাজমহলের মন্ত্রপূত নামোচ্চারণে তাঁহার অক্ষয় ও অপূর্ব্ব স্থাপত্যকীর্ত্তি-কলাপের কথা মনে পড়ে,—আর মনে পড়ে তাঁহার কবিত্বময় মৃত্যুকাহিনী,—আগ্রা দুর্গের অতুল-শোভাময় অলিন্দ হইতে বক্রগতি যমুনা-তটে তাজের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চিরনিদ্রাভিগমন। যখন ঔরঙ্গজীবের আজ্ঞায় বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া সাজাহান নিষ্ফল-ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া উঠেন, "আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান। এই কে আছো! নিয়ে আয় আমার বর্ম্ম আর তরবারি।" তখন তাঁহার আমেদনগর বিজয়াদি বীরত্ব-কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হয়, এবং পিঞ্জরাবদ্ধ জরাহত কেশরীর ব্যর্থ গর্জ্জনে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। আবার যখন দারার পরাজয় ও ঔরঙ্গজীবের দিল্লীর তক্তাউসে আরোহণবার্ত্তা-শ্রবণে সাজাহান একবার দুর্গের বাহিরে যাইয়া প্রজাগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ব্যগ্র

হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার সুশাসনের কথা, প্রজাবাৎসল্যের কথা, ন্যায়বিচারের কথা, দস্যু-তস্করাদি বিরহিত রাজ্যে অভূতপূর্ব্ব শান্তি-স্থাপনের কথা মনে পড়ে, আর তাঁহার দুরবস্থায় মন করুণার্দ্র হইয়া উঠে। দারার হত্যা-নিবারণের জন্য তিনি যখন আগ্রা দুর্গের উচ্চ কক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হয়েন, এবং পরে দারার হত্যা-সংবাদে উন্মত্তবৎ হইয়া সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার দুর্ব্বহ শোক হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রাণ মুহ্যমান হইয়া আসে। পরিশেষে যখন তাঁহার সকল দুঃখের কারণ ঔরঙ্গজীবকে অনুতাপক্লিষ্ট ও বিশীর্ণদেহ দেখিয়া পুত্রের সমস্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে সন্তান-স্নেহের প্রাবল্য দেখিয়া বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়া যায়।

কিন্তু ইতিহাসের কথা স্মরণ করিলে সাজাহানের এই সুন্দর ছবি-খানি মলিন হইয়া যায়। পিতৃদ্রোহিতা ও সিংহাসন-লাভের জন্য ভ্রাতৃযুদ্ধ মোগলসম্রাট্‌দিগের বংশানুক্রমিক আচরণ। উহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। সাজাহান নিজে দুইবার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরও মৃত্যুশয্যায় শায়িত আকবরের বিপক্ষে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া পুত্রদের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই সাজাহান কেবল দারাকে নিকটে রাখিয়া অপর পুত্রত্রয়কে সুবাদারীর বা রাজ-প্রতিনিধিত্বের ব্যপদেশে দূরদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা স্মরণ করিলে পুত্রগণের বিদ্রোহ-বার্ত্তা শুনিয়া সাজাহানের মুখে "এ রকম কখন ভাবিনি। অভ্যস্ত নই।" প্রভৃতি বাক্য অসঙ্গত ও ভাণমাত্র বলিয়া মনে হয়। বিদ্রোহী পুত্রদের দমন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি যখন বলেন, "ঈশ্বর পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়াছিলে

কেন ?" তখন, যৌবনে কেন তাঁহার এ জ্ঞান হয় নাই ভাবিয়া, তাঁহার প্রতি অনুকম্পার উদয় হয়। যখন মনে পড়ে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র দোয়ার সেকোকে কৌশলে প্রতারিত করিয়া, এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, তাঁহাদের সকলকেই নির্ব্বিচারে হত্যা করিয়া, সেই আত্মীয়-শোণিত-রঞ্জিত-হস্তে দিল্লীর রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাঁহার মুখে "আমি এমন কি পাপ করিয়াছি খোদা" উক্তি জগদীশ্বরের নিকট নিতান্ত নির্লজ্জ অনুযোগের মত শুনায়। মেনুসীর (Signor Manouici) কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাজাহানের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মেনুসী বলেন, সাজাহান তাঁহার ভ্রাতা সাহারিয়ার ও তাঁহার দুই নিরীহ পুত্রকে একটি কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, ঐ কক্ষের দ্বার গ্রথিত করিয়া তাহাদের অনাহারে হত্যা করেন। মেনুসী সাজাহানের ব্যভিচার, গুপ্তহত্যা ও ইন্দ্রিয়-সেবা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সাজাহানের বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক, কারাবাস প্রভৃতি ক্লেশ তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

সাজাহানের ইতিবৃত্তের সহিত লীয়ারের কাহিনীর একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই রাজা, জরাগ্রস্ত, রাজ্যভ্রষ্ট, এবং সন্তানগণের নিষ্ঠুর আচরণে মর্ম্মাহত। সাজাহানকেও নাট্যকার লীয়ারের অবস্থায় ফেলিয়াছেন, এবং সাজাহানের হৃদয়ও লীয়ারের মত কোমল ও সহজে বিক্ষোভপ্রবণ করিয়া গড়িয়াছেন। কিন্তু লীয়ারের আদর্শে সাজাহান পঁহুছিতে পারেন নাই। ইহাতে নাট্যকারের গুণপনার অভাব নাই। প্রতিবন্ধক ইতিহাস। বিদ্রোহী পুত্রগণের, বিশেষতঃ ঔরঙ্গজীবের, দুর্ব্যবহারে ও দারার হত্যায় সাজাহানের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়া-

ছিল সত্য, কিন্তু কালবশে তাঁহার হৃদয়ের সে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়, এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েন। কিন্তু কৃতঘ্ন কন্যাদ্বয়ের পৈশাচিক আচরণে লীয়ারের হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা আর যুক্ত হয় নাই, কর্ডিলিয়ার মৃত্যুর চরম আঘাতে তাহা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। লীয়ার নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের যে মহাদৃশ্যগুলি ক্ষোভ, রোষ, বিস্ময়, অনুতাপ করুণাদির আলোড়নবিলোড়নে মনকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, সাজাহান নাটকে সেরূপ কোনও দৃশ্যের সমাবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। মহম্মদ ব্যতীত বিদ্রোহী পুত্রদের পক্ষের অন্য কাহারও সহিত সাজাহানের সাক্ষাৎই হয় নাই। আর মহম্মদ, পিতার আজ্ঞায় তিনি বন্দী, সাজাহানকে শিষ্ট বাক্যে এই সংবাদ দান ব্যতীত তাঁহার প্রতি কোনরূপ কুবচন প্রয়োগ বা নিষ্ঠুর ব্যবহারও করেন নাই। শেষ দৃশ্যে নাট্যকার, সাজাহানের সহিত ঔরঙ্গজীবের যে কাল্পনিক সাক্ষাৎ করাইয়াছেন, সে সাক্ষাৎ বিদ্রোহ, হত্যা প্রভৃতি ঘটনার বহুবর্ষ পরের কথা, তখন সাজাহানের মনের তাপ শীতল হইয়া গিয়াছে। লীয়ার, কর্ডিলিয়াকে বঞ্চিত করিয়া, অত্যাচারী কন্যাদ্বয়কে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সাজাহান দারাকে বঞ্চিত করিয়া ঔরঙ্গজীবকে সর্ব্বস্ব দান করেন নাই। সুতরাং ঔরঙ্গজীবের উপর আদান-প্রদান সম্বন্ধে কৃতঘ্নতা-দোষ আসে না। পরন্তু ঔরঙ্গজীব, রিগান ও গনেরিল-এর মত, পিতার উপর মর্ম্মভেদ বাক্যবাণ বর্ষণ বা উৎপীড়নও করেন নাই। তাহার উপর সেক্সপীয়র গণেরিল্ ও রিগানের কাল্পনিক চরিত্রের কালিমা নাটকোচিত ভাবে গাঢ়তর করিয়া দেখাইয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ঔরঙ্গজীবের ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর সেরূপ ইচ্ছামত মসীলেপন করিতে পারেন নাই—প্রত্যুত সেরূপ করিলে ইতিহাসের অপলাপ ও ঔরঙ্গজীবের প্রকৃত চরিত্রের প্রতি অবিচার করা হইত। কিন্তু ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, উৎপীড়কের

প্রতি বিতৃষ্ণা না জন্মিয়া সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছে; উৎপীড়িত সাজাহানের নির্য্যাতনের তীব্রতা লঘু হইয়া গিয়াছে। সাজাহানকে নাট্যকার লীয়ারের মত বহির্জ্জগতের ঝটিকার সহিত অন্তরের ঝঞ্ঝাবাতের প্রকোপ মিলাইবার অবসর দিয়াছেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, রজনীর ঘনান্ধকারে নিরাশ্রয় ও পথহারা লীয়ারের মস্তকের উপর দিয়া ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল; আর সাজাহান আগ্রার প্রাসাদের মর্ম্মর-পাষাণে জালিকাটা বাতায়ন-পথে যমুনার উপর ঝড়বৃষ্টির খেলা দেখিয়া-ছিলেন! উভয়ের বংশগত ও শিক্ষাগত চরিত্রের মধ্যেও তুল্যরূপ ব্যবধান! নাট্যকার নিরুপায়। ইতিহাস তাঁহার কবিকল্পনাকে শত-রজ্জুবন্ধনে টানিয়া রাখিয়াছে, ঊর্দ্ধগামী হইতে দেয় নাই।

লীয়ার নাটকে নির্য্যাতন প্রধানতঃ লীয়ার একাকীই ভোগ করিয়া-ছেন, কিন্তু সাজাহান নাটকের উৎপীড়নটা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। দারাই বোধ হয় উহার চরম ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের উপরই মনোযোগ ও সহানুভূতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। দারা ধর্ম্মমতে উদার, অকপট ও বীর; কিন্তু কূটবুদ্ধিতে ও কর্ম্মপটুতায় ঔরঙ্গজীবের সহিত তাঁহার তুলনাই হয় না। ইতিহাসের এই চিত্র নাটকেও স্থান পাইয়াছে। পরন্তু দারার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ছবি নাট্য-কার বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। দারাকেও নাট্যকার পত্নীগতপ্রাণ ও সন্তান-স্নেহ-বিগলিত-হৃদয় রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে স্ত্রীপুত্রগণের অসহ্য কষ্ট দর্শনে তিনি যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার প্রিয়পত্নী নাদিরাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত হয়েন, সে চিত্র ভীষণ হইলেও, তাঁহার চরিত্রে সঙ্গত। ইতিহাস বলে যে, তিনি অধীর ও অসহিষ্ণু ছিলেন। নাদিরার মৃত্যুকক্ষে, নীচ জিহন খাঁর সম্মুখে সিপারকে কাঁদিতে দেখিয়া দারা যখন রুক্ষভাবে "সিপার"!

বলিয়া ডাকিয়া বালকের দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দেন, তখন দারার আত্মসম্মানজ্ঞানের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে।

দারা উৎপীড়িত; ঔরঙ্গজীব উৎপীড়ক। দারার দুঃখে সহানুভূতি উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের উপর বিতৃষ্ণা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকে ঔরঙ্গজীবের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সে বিতৃষ্ণা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না। দারার মৃত্যুদণ্ড দিবার সময় ইতস্ততঃ করণ, দারার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ, জিহন খাঁ নিহত হইলে সন্তোষপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা ইতিহাস-সঙ্গত কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু নাটকে সেগুলি ঔরঙ্গজীবের আন্তরিক অনুভূতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ফলে নাটকীয় সৌন্দর্য্যের ক্ষতি হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নাট্যকার দারা-চরিত্রের দোষগুলি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দারার প্রতি সহানুভূতি-উদ্রেকের সহায়তা করিয়াছেন। দারা দাম্ভিক ছিলেন; বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া ক্ষমতার আস্বাদে তাঁহার ঔদ্ধত্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি প্রতি-বাদ আদৌ সহিতে পারিতেন না। আমীর ওমরাহগণকে অকারণে অবমাননা করিতেন। মেনুসী বলেন, দারা তাঁহার এক ক্রীতদাস 'আরাব খাঁর' সহিত সকল বিষয়ে তাঁহাদের তুলনা করিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। সঙ্গীতকলানুরাগী অম্বর-রাজ জয় সিংহকে তিনি "ওস্তাদজী" সম্বোধনে উপহাস করিতেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী উপপত্নীদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত ছিলেন, এবং সাজাহানের বর্দ্ধিতপ্রতাপ মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন, এরূপ দুর্নামের কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল। এই সকল কারণেই তিনি বিপৎকালে আমীর ওমরাহ-গণের সহায়তা প্রাপ্ত হয়েন নাই। নাট্যকার এ সকল কথার উল্লেখ না করিয়া ভালই করিয়াছেন।

নাট্যকার ঔরঙ্গজীবের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে এক বিরাট্

পুরুষকারের চিত্র। নাট্যকার অতি সন্তর্পণে ও আন্তরিক সহানুভূতির সহিত এই চরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন, এবং তাঁহার যত্ন যে সর্ব্বতোভাবে সফল হইয়াছে, এ কথা রসজ্ঞমাত্রই স্বীকার করিবেন। ঔরঙ্গজীবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুরদর্শিতা, কার্য্যতৎপরতা, বিপদে স্থৈর্য্য, আত্মদমনে ক্ষমতা স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ঔরঙ্গজীবের মহান্ চরিত্রের সহিত তুলনায় তাঁহার ভ্রাতাদিগের চরিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়; তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তাঁহারা যে শিশুর মতই অক্ষম, তাহাও নাটকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাপর চরিত্রের ন্যায় ঔরঙ্গজীব-চরিত্রেরও দোষগুলি নাট্যকার যত দুর সম্ভব অন্তরালে রাখিয়াছেন। কিন্তু দোষগুলি এতই গুরুতর যে, শত চেষ্টাতেও তাহাদের কালিমা ধৌত হইবার নহে। ঔরঙ্গজীব যে কেবল "শঠের সহিত শাঠ্য করিতেন" তাহা নহে, নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন বুঝিলেই করিতেন, তাহা নাটকেই প্রকাশ পাইয়াছে। জাহানারার প্ররোচনায় মোরাদ তাঁহাকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি মোরাদকে সম্রাট্ সম্বোধন করিয়া ও নিজে মক্কায় যাইবার ভাণ করিয়া প্রতারিত করিয়াছিলেন। তিনি যে নিষ্ঠুর ছিলেন, তাহার আভাষও নাটকেই আছে। তিনি দারা ও সিপারকে কঙ্কালসার হস্তীর পৃষ্ঠে মলিনবস্ত্রে দিল্লী প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা। বার্ণিয়ার বলেন, দারার মৃত্যুর আদেশ দিবার সময় দুঃখ প্রকাশটা কূটবুদ্ধির অভিনয়মাত্র। মেনুসী বলেন, দারার মুণ্ড পাইলে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া, দারার চক্ষে যে একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ ছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া, সাজাহানের আহারের সময় ঐ মুণ্ড একটি বাক্সে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ঔরঙ্গজীব-চরিত্রের এই অন্ধকার

দিক্‌টি কুহেলিকাচ্ছন্ন রাখিয়া নাট্যকার ভালই করিয়াছেন। অপরাপর চরিত্রেরও তিনি গুণের দিক্‌টাতেই আলোকপাত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ঔরঙ্গজীব-চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ কোনও বিশেষ পক্ষপাত করেন নাই। পরন্তু তিনি ঔরঙ্গজীবের জটিল চরিত্রের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবগুলির স্বভাবোচিত ভাবে সমন্বয় করিয়াছেন। ঔরঙ্গজীব, যে রাজনীতিক প্রতিভাবলে ভারতের সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে, এবং তিনি মনের যে সঙ্কীর্ণতার দোষে ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও নীহারিকার আকারে, নাটকে বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিলে মনে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বুঝি বা নাটকে ঔরঙ্গজীবের শুধু রাজর্ষি মূর্ত্তিতেই সাক্ষাৎ পাইব! নাটক পড়িলে সে ভ্রম থাকে না। ভূমিকাটি না লিখিলেই হইত!

মোরাদকে নাট্যকার সাহসী, বীর, সুরাপ্রিয় ও গণিকাসক্ত রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইতিহাসও তাহাই বলে। মোরাদের উদরসর্ব্বস্ব মৃগয়ানুরক্ত বলিয়াও খ্যাতি ছিল, এবং তিনি সম্রাট্ হইলে মুসলমান-ধর্ম্মের কোনও ক্ষতি হইত না। তিনি মুসলমানধর্ম্মে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন, এ কথাও ইতিহাসে আছে। তিনি ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ঔরঙ্গজীবের মত প্রখর ছিল না, ইহা নিশ্চিত। নাট্যকার যদি মোরাদের নির্বুদ্ধিতার রং কিছু বেশী করিয়া ফলাইয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

সুজা যে সাহসী ও সমরপ্রিয় ছিলেন, এবং রণক্ষেত্রের বিভীষিকার মধ্যেও নৃত্যগীতে মত্ত হইতেন, এ কথা ইতিহাসে আছে। ঐতিহাসিক-গণ বলেন, তিনি ঘোর বিলাসী ও অত্যধিক ব্যসনাসক্ত ছিলেন। নাট্য-

কার তাহাকে পত্নীগতপ্রাণ, সরলচেতা, উন্নতমনা ও ভাবুক ভাবে কল্পনা করিয়াছেন।

মহম্মদ প্রথমে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, পরে বংশানুক্রমিক প্রথা-মত তিনিও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি সাজাহানের নিকট সিংহাসন-লাভের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ঐ স্বার্থত্যাগের কারণ পিতৃভক্তি, কি পিতৃরোষের বিভীষিকা, তাহা তিনিই জানিতেন। মতিভ্রান্ত জরাতুর সাজাহান যে তাঁহাকে ঔরঙ্গজীবের বিজয়দৃপ্ত খড়্গ হইতে রক্ষা করিতে নিতান্তই অক্ষম, ইহা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার নিশ্চয়ই ছিল। তিনি ঔরঙ্গজীবের পুত্র! নাট্যকার কিন্তু মহম্মদ-চরিত্রের এই আত্মত্যাগের ও পরে পিতৃপক্ষ পরিত্যাগের যে সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মহম্মদ-চরিত্রের উৎকর্ষসাধন হইয়াছে, পরন্তু নাটকের সাধারণ সৌন্দর্য্যও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোলেমান বীর ও সুবুদ্ধি ছিলেন। মেনুসী বলেন, সাজাহান; দারার অপেক্ষা সোলেমানের বুদ্ধি ও ক্ষমতায় অধিকতর আস্থাবান্ ছিলেন। সে চরিত্রকে আদর্শ চরিত্রে পরিণত করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের অমর্য্যাদা করেন নাই।

সাজাহান নাটক স্ত্রী-চরিত্রে ভাগ্যবান্। নাদিরার কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও পতিভক্তি, হিন্দুকুল-লক্ষ্মীরও আদর্শস্থানীয়। মহামায়ার কাহিনী, যে কুলের ললনাগণ পতি ও পুত্রকে জন্মভূমি-রক্ষার জন্য মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া সহাস্যবদনে জহরব্রত পালন করিত, সেই রাজপুত-কুলেরই উপযুক্ত। পিতার প্রতি ভক্তিমতী তেজস্বিনী জহরৎকে প্রতিহিংসা-সাধন-পরায়ণা ও অভিসম্পাতমুখরা করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের সহিত চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহার এক পুত্রের সহিত জহরৎএর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে জহরৎ একখানি ছুরিকা দিবারাত্র সঙ্গে রাখিয়াছিল,

এবং বলিত, পিতৃঘাতীর পুত্রের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে সে ঐ ছুরিকা নিজের বক্ষে বিদ্ধ করিবে। আর জাহানারা! সেই বিদুষী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, অলোকসামান্যরূপবতী বেগম সাহেবা! যাঁহার ইঙ্গিতে সাজাহানের শেষ জীবনের রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, যিনি স্বেচ্ছায় বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষার জন্য তাঁহার কারাবাসের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, যাঁহার সমাধির উপর পাষাণসৌধ নির্ম্মিত না হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে, উন্মুক্ত নীলাম্বরতলে, শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই ইতিহাসবিশ্রুত চরিত্রের যোগ্য চিত্রই নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন। জাহানারা যেন সাজাহানকে বিপদে বুদ্ধি ও দুঃখে সান্ত্বনা দিবার জন্য, দারা ও নাদিরাকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, ঔরঙ্গজীবকে নিয়তির মত কঠিন বিচারে তাঁহার পাপের গভীরতা, মনের নিগূঢ় কথা, আত্মপ্রবঞ্চনা তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বাদশাহের অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই জাহানারা-চরিত্রের শুভ্র সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকলার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছেন।

পিয়ারার চরিত্র কাল্পনিক। সুজার দ্বিতীয়া পত্নীর অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহেন, এবং সুজার যে পত্নী পারস্যরাজের কন্যা ছিলেন, পিয়ারা যে তিনিই, নাটকে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং পিয়ারাকে নাট্যকারের ইচ্ছানুরূপ চরিত্র দিবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। কবি তাঁহাকে মনের মত করিয়াই গড়িয়াছেন। পিয়ারা পরিহাসরসিকা, পতিপ্রাণা ললনার এক অপূর্ব্ব চিত্র। পিয়ারা রহস্যের ফোয়ারা—বিমলানন্দের স্ফটিকধারা। তিনি পতির বিপদে সহায়, সমস্যায় মন্ত্রী, বীরত্বে বল। ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসারিণী, এবং রণে মৃত্যুর আহ্বানে তিনি পতির সঙ্গিনী। পিয়ারার পরিহাস-রসিকতা একটা করুণ কাহিনী। তাঁহার "মুখে হাসি, চোখে

জল।" স্বামীর আসন্ন বিপচ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় রুধিরাক্ত, কিন্তু তিনি মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রহস্যের স্নিগ্ধ ধারায় পতির দুশ্চিন্তাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে, কৌতুকের তরঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ-স্পৃহা ভাসাইয়া দিতে, এবং হাস্যোজ্জ্বল নয়ন-তড়িতের আলোকে স্বামীর তিমিরাচ্ছন্ন বক্ষুর পথ আলোকিত করিতে চাহেন। বুদ্ধিমতী পিয়ারার রহস্যালোকে সুজার সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পিয়ারার পরিহাসরসিকতায় কিন্তু একটা ত্রুটীও আছে। পরমাত্মীয়-গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার মত দুঃসময়ে সমদুঃখভাগিনী স্ত্রীর স্বামীর সহিত পরিহাস, কালবিরুদ্ধ ও সম্পর্কবিরুদ্ধ—পিয়ারার সুন্দর চরিত্রে যেন একটা হৃদয়হীনতার ছায়া আনিয়া দেয়। নাট্যকার নিজেই এ ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি পিয়ারার স্বগতোক্তিতে, স্বামীর সহিত সহজ কথোপকথনে, এবং "যা আমার জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি রহস্য কচ্ছ"—সুজার এই অনুযোগ বাক্যে, সেই অনুচিত ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। এ পরিহাস মৌখিক—অন্তরের কথা নহে।

দিলদারের রহস্যে কিন্তু এরূপ দোষস্পর্শ ঘটে নাই। কারণ, দিলদার সম্রাট্‌বংশের অসম্পর্কীয়, এবং তাঁহার ব্যবসায়ই রসিকতা। দিলদার নামে, ছদ্মবেশী জ্ঞানী দানেশমন্দ হইলেও, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন; তিনি নাট্যকারের সৃষ্টি। লীয়ারের যেমন 'ফুল' (Fool), মোরাদের তেমনই দিলদার। 'ফুল' যেমন লীয়ারকে তাঁহার দুষ্টা-কন্যাদ্বয়ের কপটতা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, দিলদারও তেমনই মোরাদকে পিতৃদ্রোহিতার মহাপাপ হইতে এবং ঔরঙ্গজীবের সাংঘাতিক ছলনা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শুনে কে? লীয়ার মতিচ্ছন্ন; মোরাদ নির্ব্বোধ। মোগলবাদশাহগণের দরবারে বিদূষকের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সুতরাং দিলদার-চরিত্র ইতিহাসসঙ্গত, এবং

সাজাহান নাটকে সে চরিত্রের সার্থকতা দেদীপ্যমান। দিলদারের ব্যঙ্গোক্তি, পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃহত্যার চক্রান্তকলুষিত ঘটনা হইতে মনকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দেয়, এবং মোরাদ-চরিত্রের ত্রুটীগুলি স্পষ্টতর করিয়া, তাহার নির্ব্বোধ সরলতায় করুণার উদ্রেক করে!

দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসে সুরসিক, এবং তাঁহার বিমল পরিহাস-রসিকতা শুধু একটা হাস্যের তরঙ্গ, আমোদের বুদ্বুদ সৃষ্টি করিয়াই মন হইতে উধাও হইয়া যায় না। সে রহস্যালাপের মধ্যে একটা তীব্র শ্লেষ আছে, যাহা মানসপটে বেশ একটা চিহ্ন রাখিয়া যায়। পিয়ারা যখন "সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে" ইত্যাদি উপমা দিবার পর বলেন,—"বাঙ্গালীর বল পিঠে", জয়সিংহ যখন "ঔরঙ্গজীবের প্রভুত্ব মানতে পারি, কিন্তু রাজ-সিংহের প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারি না"—এ কথা বলিলে, তদুত্তরে যশোবন্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন মহারাজ, তিনি স্বজাতি বলে'? এবং পিয়ারা যখন "আমি মুক্তি চাই না, এ আমার মধুর দাসত্ব" এ কথা বলিলে, সুজা উত্তর দেন, "ছিঃ পিয়ারা! তুমি বাঙ্গালীরও অধম!" তখন কৌতুকের হাসিটা ওষ্ঠেই মিলাইয়া যায়, এবং প্রাণ যেন একটা তীক্ষ্ণ কশাঘাতে শিহরিয়া উঠে।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই, সাজাহান নাটকের প্রধান অপ্রধান সকল চরিত্রই সুপরিস্ফুট। বিপরীতপ্রকৃতি-বিশিষ্ট চরিত্রগুলির চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া নাট্যকার একের সাহায্যে অপরের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। জয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার পার্শ্বে দিলীরের ধর্ম্মজ্ঞান, জিহন খাঁর নীচতার পার্শ্বে সাহানাবাজের উদারতা, যশোবন্তের মনের সঙ্কীর্ণতার পার্শ্বে মহামায়ার মনের মহত্ব, কৃষ্ণবর্ণ যবনিকার উপর শ্বেতবর্ণের ছবির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত স্ত্রীপুত্রগণের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কার দ্বারা যখন

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই গোরক্ষক দম্পতীর আবির্ভাব ও জলদান, জয়সিংহের নিকট সৈন্যপ্রার্থনায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া সোলেমান যখন দিলীর খাঁর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন, তখন "উঠুন সাহাজাদা, মহারাজ আজ্ঞা না দেন, আমি দিচ্ছি, আমি দারার নিমক খেয়েছি, মুসলমান জাত নেমকহারামের জাত নহে।"—দিলীর খাঁর এই সতেজ ও অপ্রত্যাশিত উক্তি, মহম্মদের সাজাহান-প্রদত্ত রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা ও যশোবন্ত রাজ্যে ফিরিলে মহামায়ার দুর্গদ্বার রুদ্ধ করণ, পিয়ারার রণক্ষেত্রে মরণের সঙ্কল্প, শেষ দৃশ্যে সাজাহানের পদতলে রাজমুকুট স্থাপন করিয়া ঔরঙ্গজীবের ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ঘটনা-গুলি নাট্যকার নিপুণভাবে নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সিপারের নিকট দারার শেষবিদায় গ্রহণের চিত্র বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। আর যে দৃশ্যে ঔরঙ্গজীব স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলকেই বক্তৃতার ও অভিনয়ের মোহে মুগ্ধ করিয়া "জয় ঔরঙ্গজীবের জয়" ধ্বনি উচ্চারিত করাইয়াছেন, সে দৃশ্যটি যথার্থই,—জাহানারার কথায়,—"চমৎকার!" সে বক্তৃতা পড়িলে Richard IIIএর লেডি অ্যান্‌কে ও বিধবা রাণীকে ভুলাইবার বাক্-চাতুরীর কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে সাজাহানের অতিরিক্ত ধনরত্ন-লিপ্সার কথা, তাঁহার নিকট ঔরঙ্গজীবের বাদশাহী রত্নাভরণ চাহিবার ঐতিহাসিক কথা, সাজাহানের সহিত ঔরঙ্গজীবের সাক্ষাতের কাল্পনিক দৃশ্যে, প্রথম সম্ভাষণে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে;—ঔরঙ্গজীব ডাকিলেন, "পিতা!" সাজাহান উত্তর দিলেন, "আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ? দেবো না, দেবো না; এখনই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে ফেল্‌বো।"

সাজাহান নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, প্রত্যেক দৃশ্যের

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহল সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। বক্তৃতা দীর্ঘ হইলেও অতৃপ্তি আসে না। ইহা সামান্য লিপিকৌশলের পরিচায়ক নহে। রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী আড়ম্বরের সহিত দারার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না করিয়া, উহা যে যবনিকান্তরালে সাধিত করিয়াছেন, সে জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবু নাট্যামোদিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

কবির বঙ্গবিখ্যাত জাতীয়-সঙ্গীত-সমূহের অন্যতম "আমার জন্মভূমি" এই সাজাহান নাটককেই গৌরবান্বিত করিয়াছে। নাটকের অন্যান্য সঙ্গীতগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। দ্বিজেন্দ্র বাবু একাধারে সুকবি ও সুগায়ক। তাঁহার প্রেমাদিবিষয়ক সঙ্গীতসমূহের কথাগুলি এতই মধুর ও সুকোমল যে, সেগুলি ব্রজবুলির মত সুরে লয়ে একীভূত হইয়া প্রাণের মধ্যে যেন সত্যই—

"ভেসে আসে কুসুমিত উপবনসৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।"

বঙ্গের সুবাদার-পত্নীর কণ্ঠে সাজাহানের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বাঙ্গালার প্রাচীন কবিচূড়ামণি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের দুইটি অমূল্য গীতপদ বড়ই উপযোগী হইয়াছে।

এই নাটক-রচনায় নাট্যকার যে শিল্প-জ্ঞান ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিলাম না। অথচ কয়েকটি ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিতেই হইবে, নহিলে সমালোচনা অঙ্গহীন থাকিয়া যায়।

দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজিডি—চূড়ান্ত ঘটনা। দারার জীবনাবসানের সহিত নাটকের শেষ যবনিকা পতিত হওয়া উচিত

ছিল। সাজাহান বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন। দারাই সিংহাসন ও জীবন—উভয়ই হারাইলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উপরই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত, এবং তাঁহার মৃত্যুঘটনায় মন এরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় যে, নাট্যকারের প্রভূত গুণপনা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী দৃশ্যগুলিতে অবহিত হইবার আর ধৈর্য্য থাকে না।

নাটকের চরিত্রগুলির কথার ভঙ্গিমায় ব্যক্তিগত বৈষম্য রক্ষা করিলে নাটকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইত। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির প্রায় সকলেরই মুখে কবি নিজে কথা কহিয়াছেন; সাজাহান, জাহানারা, সুজা, পিয়ারা, নাদিরা, সোলেমান, দিলদার, প্রত্যেকেই এক একটি কবি। এমন কি, তরুণী জহরতের বাক্যেও কবিজনসুলভ ভাবুকতা জাজ্বল্যমান। ভাষার এই বৈচিত্র্যহীনতার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

দিল্লীর বাদশাহের পরিবারবর্গ যখন বাঙ্গালায় কথা কহিতেছেন, তখন তাঁহাদের মুখে কোনও প্রাদেশিক বা গ্রাম্যভাষা না দিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মত ভাষা দেওয়া উচিত। চলিত কথোপকথনের যখন কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষা নাই, তখন শ্রুতিমধুর বা ব্যাকরণশুদ্ধ না হইলেও, রাজধানীর ভাষা প্রয়োগ করাই প্রশস্ত। নাট্যকার লিখিয়াছেন,—"দেইগে যাই", "করিস না", "চল্লাম", "চোক বৌঁজ", "চোক বুঁজে, হাঁই তুলতে পারি"। কলিকাতার ভাষা, "দিইগে যাই", "করিস নি", "চল্লুম", "চোক বোজা", "চোক বুজে", "হাই তুলতে পারি"। ইহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন যে কৃষ্ণনগর-(নদীয়া)-ই পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। সুতরাং কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক ভাষাই সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষা বলিয়া সকলের মানিয়া লওয়া উচিত—কলিকাতার ভাষা নহে।

সুতরাং তাঁহার ঐ কথাগুলিতে গ্রাম্যতাদোষ ধরিলে চলিবে না। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার আমি 'সবুজ-পত্র'-সম্পাদক মহাশয়ের এবং তদীয় প্রতিপক্ষদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত—এই নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় অবস্থান কালে, ১৩১৬ সালে, রচনা করেন এবং "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে" উৎসর্গ করেন।

মিনার্ভা-থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় (যিনি সাজাহান নাটকে সাজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন) একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন "রায় সাহেব, এতদিন পিঁয়াজ রসুন খাইয়ে গায়ে গন্ধ করে দিয়েছেন, এইবার একটু ঘি আলোচাল খাইয়ে দিন না।" দ্বিজেন্দ্র উত্তর দেন, "আচ্ছা, এইবার তাই হবে।" দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—চন্দ্রগুপ্ত নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল।

এই নাটকখানিও মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রের শিক্ষায় প্রথিতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু) চাণক্যের অভিনয় করিয়া অসামান্য যশোলাভ করিয়াছিলেন। নাটকখানি প্রকাশিত হইলে কলিকাতা ইভনিং ক্লবের (দ্বিজেন্দ্র ঐ ক্লবের নেতা ছিলেন) সভ্যগণ কর্তৃক একদিন অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে কলিকাতার খ্যাতনামা পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস বাবু চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী ইনষ্টিটুটের সভ্যগণও এই নাটকের অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্ত স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাটকখানি পাঠ করিয়া উহার কোনও কোনও অংশ বাদ দিয়া অভিনয় করিতে উপদেশ দেন এবং তদনুযায়ী আংশিক

পরিবর্জ্জিত আকারে নাটকের অভিনয় দেখিয়া গুরুদাস বাবু নিরতিশয় প্রীত হয়েন। গুরুদাস বাবু বলেন—"আমি বলিয়াছিলাম, এ ভাবে অভিনীত হইলে নাটকখানি অপূর্ব্ব—চমৎকার।" সেই অভিনয়ে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী চাণক্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

কোনও সমালোচক অনুমান করিয়া লইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল মুদ্রারাক্ষস হইতে এই নাটকের ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন—(বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১৩২০)। মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তের কথা আছে সুতরাং দ্বিজেন্দ্রকে ঐ নাটক পাঠ করিতে হয় এবং তিনি মেগাস্থিনিসের বিবরণ—Greeks in India, প্রভৃতি ইতিহাস হইতেও উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইতিহাস বা মুদ্রারাক্ষস হইতে তিনি ঐ নাটক রচনায়, বিশেষতঃ চরিত্র-সৃষ্টি বিষয়ে, সামান্যই সাহায্য পাইয়াছিলেন। চরিত্রগুলি কবির নিজেরই সৃষ্টি। ছায়ার চরিত্র 'আয়েষা' বা 'রেবেকা'র প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু একই ছাঁচে ঢালা হইলেও প্রভেদ আছে।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"হিন্দুরাজত্ব-কালীন নাটক এই আমার প্রথম। এতদিন মুসলমান-কাল সম্বন্ধেই নাটক লিখিতেছিলাম, কেন—পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণ নিজের পরাজয়গুলি গোপন করিলেও নাটক লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ইতিহাসকারগণ আপনাদের বিজয়কাহিনী পর্য্যন্ত গোপন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণভেদ লইয়াই ব্যস্ত। সেইজন্য বর্ণভেদকেই বর্ত্তমান নাটকের ভিত্তিস্বরূপ করা হইয়াছে।

"হিন্দুনাটককার ও ইতিহাসকারগণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ চাণক্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। চাণক্যের শ্লোক এখনো ছাত্রদিগের পাঠ্য। ইংরাজ ইতিহাসকারগণ চাণক্যকে ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও কূট ছিলেন। আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।

কবি ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন "চন্দ্রগুপ্তের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পুরাণমতে তিনি মহাপদ্মের শূদ্রাণী পত্নী-গর্ভজাত পুত্র ও নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি বাহুবলে নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন এবং মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ এবং সেলুকসের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ এই দুই ব্যাপারের উল্লেখমাত্র পুরাণে নাই। গ্রীক-ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা এ বৃত্তান্ত অবগত হই। * * *

এই বৃত্তান্ত লইয়া বর্ত্তমান নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইতিহাস হইতে কোন সাহায্য পাই নাই। অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি।"

এই নাটকের মূলমন্ত্র চাণক্যের নিম্নোদ্ধৃত স্বগতোক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে :—

"চাণক্য— * * * ওঃ ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ যদি আজ থাকতো ?

"কাত্যায়ন—নাই কেন ব্রাহ্মণ ? * * *

"চাণক্য—(আপন মনে) তার নিজের দোষ। জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা, আত্মসাৎ করে নিজে বাড়বে ? শরীরকে অনশনে রেখে, মস্তিষ্ক বড় হবে ? তা কি সয় ? সয় না। তাই এই পতন।"

নির্ব্বোধ বাচালের কথায়, কাত্যায়নের সকল বিষয়ে পাণিনীর quotationএ এবং সেলুকসের মুখে Aristotle প্রভৃতির গ্রীকদার্শনিক-গণের উক্তি বলিয়া তাঁহাদের অকথিত বচনের উদ্ধারে, কবি হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছেন।

কোনও কোনও স্থলে হাস্যরসের মধ্যে যে শ্লেষ আছে তাহাতে চাই কি কোনও খেতাবী সাহিত্যিকেরও শিক্ষা হইতে পারে। যেমন—

"সেলুকস। তুমি অত পড় কেন? পড়ে পড়ে তোমার মৌলিকত্ব নষ্ট হচ্ছে।"

"হেলেন। মৌলিকত্ব নষ্ট হয় পড়লে? আর না পড়লেই মৌলিক হয়। বাবা, তা হ'লে সবার চেয়ে মৌলিক হচ্ছে ঐ—ঐ গাধাটা।"

নিম্নলিখিত কথোপকথনটির ভিতর দিয়া আমরা কবির নিজের অন্তরে ফল্গুনদীর মত যে মাতৃভক্তির অযাচিত ধারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত হইত, তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

"চাণক্য। * * কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চিনে না!—জানে না যে জগতে যত পবিত্র জিনিস আছে মায়ের কাছে কেউ নয়।

"চন্দ্রগুপ্ত। তা জানি গুরুদেব!

"চাণক্য। তা জানো না। নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগ নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তারপর পৃথক্ হ'য়ে এলো—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত; মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে, বক্ষের কটাহে চড়িয়ে, স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে, সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিস্-চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়ে ছিল, মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্যে যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ-মন্দাকিনী, এই

শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে, মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাতসূর্য্যের মত কিরণ দেয়,—বিতরণে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না, উন্মুক্ত উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায় ;—এ সেই মা ?"

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে দেশ বর্ণনা আছে তাহার একটু ইতিহাস আছে। দ্বিজেন্দ্রের সহিত স্বর্গীয় কবিবর বরদাচরণ মিত্র সি এস্ মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। উভয়েই উভয়ের রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন। বরদা বাবু যেমন দ্বিজেন্দ্রকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, দ্বিজেন্দ্রও তেমনি বরদা বাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন। যে সময়ে বাঙ্গালায় জাতীয় সঙ্গীত রচনার বন্যা আসিয়াছিল সেই সময়ে বরদাচরণ একটি দেশ-প্রেমাত্মক উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা—"মানুষ মেষ"—রচনা করেন। বরদা বাবু বলিতেন, দ্বিজেন্দ্রের "আমার দেশ" সঙ্গীতের 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' পংক্তিটি হইতেই উক্ত কবিতার মূল সূত্র "মানুষ মেষ" কথাটি তাঁহার মনে উদিত হয়। বরদা বাবু ঐ কবিতাটি বন্ধুগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন. কিন্তু মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই। একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্র, বরদাচরণকে বলেন "আপনি ঐ কবিতাটি ছাপাইতেছেন না—তা'হলে কিন্তু আমি উহা চুরী করিব, লোভ সামলাইতে পারিতেছি না।' দ্বিজেন্দ্রলালের যে কথা সেই কাজ। তিনি তৎকালে "চন্দ্রগুপ্ত" লিখিতেছিলেন। তিনি বরদাচরণের কবিতায় যে দেশ-মহিমা বর্ণনা আছে সেই মর্ম্মে সেকেন্দারের মুখে ভারতবর্ষের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি করিলেন :—

"সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ়নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুভ্রচন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল

জ্যোতিঃপুঞ্জ যখন এর আকাশে ঝল্‌মল্‌ করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষারমৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কচ্ছে। * * * কোথাও দেখি তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উচু করে' দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিবাট্ বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বত সম মন্থরগমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে, কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে ব্যত্যায় সাহস।"

এই বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্র বরদা বাবুর দেশ বর্ণনার ভাবটুকু মাত্র লইয়াছিলেন, শেষে যে ব্রাহ্মণদের বর্ণনা আছে তাহার সহিত বরদা বাবুর কবিতার কোন সংস্রব নাই। এইরূপে দ্বিজেন্দ্র কবিতা ভাঙ্গিয়া (নিজের কবিতাও তিনি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন) গদ্যের ভাষায় কাব্যের আভাস দিতেছিলেন। সেই গদ্য দ্বিজেন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

পুনর্জ্জন্ম।—ইহা একখানি প্রহসন—নাটক নহে। ইহা ১৩১৭ সালে প্রকাশিত এবং মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই প্রহসনখানি দ্বিজেন্দ্রলাল "বঙ্গভাষার উপন্যাস সাহিত্যের গুরু দার্শনিক কবি ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে" উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—"ডীন সুইফট্ সত্য

সত্যই একজন জীবিত জ্যোতিষী পঞ্জিকাকারকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া পঞ্জিকাকার শেষে আপনাকে জীবিত প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীল নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে তথাপি ঐ পঞ্জিকাকার স্বীয় অস্তিত্ব সন্তোষকর রূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সেই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে।"

এই প্রহসনখানি অনাবিল হাস্যরসের উৎস এবং ইহাতে শিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। ইহাতে কল্কি-অবতারের মত সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নাই—কিন্তু ইহা বিমল আনন্দপ্রদ ও উপাদেয়। এই প্রহসনে নির্ম্মল রঙ্গরসে ভরপুর "প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত" গীতটি স্থান পাইয়াছে।

পরপারে।—এই নাটকখানি ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়। কবি তাঁহার অন্তরঙ্গ-শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী "দাদা মহাশয়কে" উৎসর্গ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—"পরপারে" আমার প্রথম সামাজিক নাটক।" * * *

"নাটকে শান্তার চরিত্র একটু অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেশ্যা এরূপ হয় কি না তাহা জানি না। বেশ্যার স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়াছি। যদি সে কথা সত্য হয়, হোক, একথা ভাবিতেও আমার আনন্দ হয়। এ চিত্র যদি কাল্পনিক হয় হোক। কাল্পনিক বীভৎসতা অঙ্কিত করায় লাভ নাই; কিন্তু কাল্পনিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করায় সমূহ উপকার আছে। এরূপ চিত্র জগতের সমস্ত 'আর্ট গ্যালারিতে" সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এরূপ চিত্রাঙ্কণে জগতের সৌন্দর্য্য-রাজ্য সমৃদ্ধ হয়। জগতে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি প্রসারিত হয়।"

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—"আধুনিক সমাজে নীতির ধারা কোন্ পথে ছুটিয়াছে, এই নাটকে তাহাই দেখাইবার তিনি চেষ্টা পাইয়াছেন। পরপারে নাটকের ideaটি সুন্দর, কিন্তু তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।" (ভারতী)

এই নাটকে কবি সাধক ভবানীপ্রসাদের মুখে শ্যামা-বিষয়ক যে গীতগুলি ("এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!" "চরণ ধরে' আছি পড়ে' একবার চেয়ে দেখিস না মা।" প্রভৃতি) দিয়াছেন, সেগুলি যে শুধু বিলেত ফেরত কবি'র কথার কথা নয়—তাহার মধ্যে যে যথার্থ ভক্তির উন্মেষের ধ্বনি আছে সে কথার অন্য পরিচ্ছেদে অবতারণা করিব।

কবি এই নাটকের নাম দিয়াছেন "পরপারে"; "পরপারে"র সম্বন্ধে কবির ধারণা কিরূপ ছিল সে কথার আভাষ আমরা নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে অনুমান করিতে পারি—

"সরযূ—আমি বিশ্বাস করি যে পরকাল আছে, সে এই পৃথিবীতেই হোক কিংবা অন্য পৃথিবীতেই হউক! এ বুদ্ধি, এ বিবেক, এ অনুভূতি এত বড় আয়োজনের কি এইখানেই—এই ষাট বৎসরেই শেষ? এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই রক্ত-মাংসে অস্থি-মজ্জায় আবৃত হয়ে আবার মূর্ত্তিমতী হয়ে আসবে। ঐ স্বর্ণাভ নীল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এই হাস্যময়ী ধরণীর দিকে চেয়ে দেখ, ঐ বিহঙ্গের ঝঙ্কার শুন, ঐ গাভীর গভীর আহ্বান শুন, ঐ মানুষের স্বর্গীয় কণ্ঠধ্বনি শুন, এই অনুপমা সৃষ্টির অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা মনে ভেবে দেখ দেখি! এ কি কারো ছেলেখেলা! এ কি উন্মাদের প্রলাপ! এ কি মদোন্মত্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির অট্টহাস্য! এর একটি মহত্তর পরিণাম আছেই আছে!"

মনস্বী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কবির জীবিতকালে এই

নাটকের একটি বিস্তারিত সমালোচনা সাহিত্যপত্রে (মাঘ, ১৩১৯) প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহা হইতে অংশবিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"* * * কয়েকটি সামাজিক কথা লইয়া কবির এই প্রকরণখানি রচিত ; এবং ইহার প্রাণ বা কেন্দ্র দাদা মহাশয় বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধুপুরুষ, দয়াময় দাতা ও অগাধ স্নেহময় পিতা। মেয়েরা বিবাহিতা হইয়াই সুখী হয়, তাই দাদা মহাশয়ও সরযূকে সুখী করিবার প্রয়াসে যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু সরযূকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল, তিনি যেন আপনার চক্ষু দুটি উপড়াইয়া ফেলিতেছেন, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন। যে দিন সরযূ আপনার কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া পাপিষ্ঠ স্বামীর পিছু পিছু ছুটিতে চাহিল, সে দিন কর্ত্তব্যের খাতিরে সরযূকে ত্যাগ করিতে গিয়া বিশ্বেশ্বর যেন একটা জড়যন্ত্রের মত চালিত হইয়া নিজের চক্ষু নিজে উপড়াইতে যাইতেছিলেন। হয়ত এ গভীর ভালবাসার মূলে একটুখানি ভীমরথীধরা ক্ষিপ্ততা ছিল! থাকুক, কিন্তু এই dotageটুকু বড় মধুর, বড় প্রাণস্পর্শী। সরযূ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিত যে, তাহার দাদা মহাশয়ের ভালবাসার গভীরতা কত! তাহার বিদায়ের কথায় বিশ্বেশ্বরকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখিয়া সরযূ কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি চলে গেলে আত্মহত্যা করবেন না কি ?" বিশ্বেশ্বর সরযূর আশঙ্কার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন। নিজের প্রাণের নিভৃত স্পন্দনটুকু সরযূ অনুভব করিতেছিল দেখিয়া আনন্দের ভাষায় উত্তর দিয়া বলিলেন, "ইস্ ? তোর জন্ত আমি আত্মহত্যা করব! ভারি গুমর!" সরযূ বলিল—"তবে কি করবেন ?" বিশ্বেশ্বর ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—"সঙ্গিহীন বিড়াল-ছানার মত আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেলা করব।" এই ক্ষুদ্র কথা-টুকুর মধ্যে ভাবের যে গভীরতা, তাহা অনুভব করা যায় ; বুঝাইয়া বলা

চলে না। পারিবারিক স্নেহের এমন সুপরিস্ফুট মধুর চিত্র সাহিত্যে অতি বিরল। * * *

"* * * দাদা মহাশয় পরহিতব্রতে অকাতরে দান করিয়া ফতুর হইয়া গিয়াছিলেন; * * * জুয়াচোরেরা তাঁহার দয়ায় অযাচিত দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঠকাইয়া যখন তাঁহার সর্ব্বনাশ করিত, তখনও কেহ তাঁহাকে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী করিতে পারে নাই। পরেশ বলিলেন—"মানুষকে অত বিশ্বাস করিবেন না, তাওয়াই মহাশয়!" বিশ্বেশ্বর তাহার উত্তরে বলিলেন—"সে কি! মানুষকে বিশ্বাস করব না! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার, যে রূপে আমরা দেব-দেবীর কল্পনা করি, তাকে বিশ্বাস করব না! জগতের প্রভু, সমাজের নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের গুরু, ত্যাগের শিষ্য, স্নেহের দাস, মানুষকে বিশ্বাস করব না! বল কি পরেশ! তবে কি পশুকে বিশ্বাস করব?"

"কিন্তু হায়! মানুষ তাঁহাকে বড় দাগা দিয়াছে। * * * তাঁহার প্রাণের পুতলী সরযূ তাঁহার প্রদত্ত টাকা পাপিষ্ঠ স্বামীকে দিয়া স্বামীর উৎপীড়নে অন্ধকার কুটীরে যক্ষ্মারোগীর মত তিলে তিলে শুকাইয়া যাইতেছিল; যাঁহার টাকায় শত পাপিষ্ঠ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পৌত্রীর পুত্র দারিদ্র্যের কশাঘাতে অন্ধকার কুটীরে শুকাইয়া মরিল। * * * এতখানি দুঃখ সহ্য করিয়াও তিনি বাঁচিয়াছিলেন। যখন সরযূকে বাঁচাইতে পারিলেন না, এবং যখন নিশ্চিত জানিলেন যে সরযূ ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরিয়াছে তখনও এই পিশাচ-পাদপিষ্ট দেবতা মরেন নাই। * * * যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ তিনি আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন সরযূ সত্য সত্যই বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছিল, তখন তাঁহার স্নায়ুচক্র একেবারে মুশড়িয়া

ভাঙ্গিয়া গেল। এ প্রাকৃতিক কি না, একথা পাঠকেরা যে কোনও বড় বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। * * * পরপারের পথে যাইবার জন্য উৎসুক বৃদ্ধের কাছে তাঁহার অতিজর্জ্জর শরীরখানি একটু ক্ষুদ্র বাধা ছিল। সেই অতি ক্ষুদ্র বাধাটুকু দূর করিবার জন্য তিনি ছুরীর একটি ঘা দিয়াছিলেন। * * *"

বিজয় বাবুর উক্ত সমালোচনায় বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের আত্মহত্যার তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বেশ্বর আত্মনাশের যে উপায়টি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা স্বভাব-সঙ্গত কি না সে বিষয়ে মতভেদ হইবার সমূহ সম্ভাবনা। বিষপানে, উদ্বন্ধনে, জলে নিমজ্জনে আত্মহত্যা করাই (কেরোসিন তৈলে পুড়িয়া মরাটা নবাবিষ্কৃত) এদেশে প্রচলিত উপায়—কিন্তু বাঙ্গালী বৃদ্ধের হস্তে ছুরিকা—ঐ খানেই গোল! মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরাও আত্মহত্যার উপায় অবলম্বনে প্রচলিত প্রথাই অনুসরণ করিয়া থাকে। জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ্ ভিষক্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনিও এই কথাই বলেন। হস্তের নিকট ছুরিকা পাইয়াছিলেন বলিয়া তাহাই বুকে বসাইয়াছিলেন এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, ইহা সামান্য কথা।

বিজয় বাবু উক্ত সমালোচনায় লিখিয়াছেন "আমাদের সামাজিক দুর্গতি দেখিয়া কবি দুঃখিত; এবং যাহাতে এই পতিত জাতি সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কবি এই নবরচিত প্রকরণশ্রেণীর দৃশ্য-কাব্যখানি একালের সমাজের উপাদান লইয়া রচনা করিয়াছেন।" কবির সেই উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। বঙ্গ সমাজের সেরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিবার অবস্থা হইলে অমৃত-লালের 'বিবাহ বিভ্রাটের' এবং গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের

অভিনয় এবং দেশব্যাপী প্রচারের পর বঙ্গদেশ হইতে বরপণ-প্রথা উঠিয়া যাইত।

দ্বিজেন্দ্রলালের উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক বা নাই হউক বিলাত-ফেরত কবি যে এই গ্রন্থে হিন্দুভক্তের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার সূত্র ধরিতে পারিয়াছেন—তিনি যে এই পুস্তকে তাঁহার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া "মা-মা" বলিয়া কালীসাধকের প্রেমানুভূতির প্রতিধ্বনি তুলিতে পারিয়াছেন—তাহাতে আমরা কবিকে ধন্য জ্ঞান করি। তিনি যে এই যুক্তি-তর্ক-মূলক ধর্ম্মজ্ঞানের ও ইহসর্ব্বস্বময় পাশ্চাত্যশিক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া সরলভক্তিমূলক ভগবৎ সাধনার উদার মুক্তাকাশের সন্ধান পাইয়াছিলেন—তাহা নিতান্ত অভাবনীয় বলিয়া বোধ হয়। বিজয় বাবুর সুচিন্তিত সমালোচনায় সে কথার উল্লেখ নাই—কিন্তু সেই কথাই এই নাটকে একটি বলিবার কথা বলিয়া আমরা বিজয় বাবুর সমালোচনার সেই অভাব পূরণ করিয়া দিলাম। বিজয় বাবু উক্ত সমালোচনায় প্রাচীন হিন্দু-সমাজের দোষ ত্রুটীর উপর দুই একটি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কবি যে সামাজিক-ব্যাধির নিরাকরণের জন্য এই নাটক লিখিয়াছিলেন (যদি সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য তাঁহার থাকে !) সে ব্যাধি প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজে আবদ্ধ নহে—নব্য উন্নতিশীল সমাজেও অনুসন্ধান করিলে সে ব্যাধির প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত 'মা-মা' ধ্বনি যে কেবল কবিজনসুলভ বাক্‌পটুতা নহে; এই নাটকখানি রচনা কালে কবির হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, তাঁহার জীবনেতিহাসে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। বিলাত ফেরত কবির মুখে স্বরচিত শ্যামা-বিষয়ক গীত শুনিয়া তাঁহার ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করিতেন না। কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ ও অনুযোগও করিতেন। কিন্তু

তাহা সত্ত্বেও নিম্নোদ্ধৃত গীতটি গায়িবার সময় কবি আত্মস্থ থাকিতে পারিতেন না—তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে ভক্তির আবেশ লক্ষিত হইত—

"চরণ ধরে' আছি পড়ে' একবার চেয়ে দেখিস্ না মা,
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়—আপন ভাবে বিভোর বামা!
এ কি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভরে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে' ডাকে মা-মা
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হাঃ হাঃ অট্টহাসি, অঙ্গবেয়ে রক্তধারা,
এত দিন ত কালী-ভীমা, তারই পূজা করেছি মা—
পূজা আমার সাঙ্গ হোল এখন মা তোর অসি নামা।
আয় মা অভয়া রূপে স্মিত মুখে শুভ্র-বাসে;—
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে।
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা, অভয়ে অভয় দে মা—
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।"

মহিমের চরিত্রের প্রথমাংশ অনুশীলন করিয়া কবিবর স্বর্গীয় বরদা-চরণ মিত্র মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'এই জঘন্য চরিত্রটা আঁকিবার সার্থকতা কি?' দ্বিজেন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন 'তাঁহার পতন দেখাইবার জন্য।' তদুত্তরে বরদা বাবু বলিয়াছিলেন—'সে উঠল কবে ত'—পড়বে? যে উচ্চে থাকে তাহারই পতন হয়।' ইহার প্রত্যুত্তরে দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয় ও সাহিত্যরসজ্ঞ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে বলেন—'মহিম প্রথমে মাতৃভক্ত ছিল—সেই মাতৃভক্তি হারাইতেই তাহার পতন হয়।' অধর বাবু "পরপারে" নাটকের একটি সুচিন্তিত এবং মনোজ্ঞ আলোচনা লিখিয়া তাহার প্রথমাংশ 'নায়ক'

পত্রে প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'পরপারে'র দ্বিতীয় সংস্করণে সেই আলোচনাটি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনস্বরূপ মুদ্রিত করিয়া কৈফিয়ৎ: দিয়াছিলেন, তাঁহার "উদ্দেশ্য আত্মপ্রশংসা প্রকাশ করা নহে. উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে এক খানি "মানের বহি" প্রকাশ করা।" অধর বাবুর সেই 'আলোচনা'র কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"সামাজিক নাটক বলিলে লোকের মনে স্বভাবতঃই সরলা, প্রফুল্ল ও বলিদানের কথাই উদিত হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, যে সমাজে যৌবন-বিবাহ অপ্রচলিত ও স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব, সে দেশে ভ্রাতৃ-বিরোধ, কন্যার বিবাহ এবং বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী ভিন্ন সামাজিক নাটকের উপাদান আর কি আছে? "পরপারে" সে শ্রেণীর নাটক নহে। ইহা কবিপ্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। শিল্পচাতুর্য্যে, সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণে ও পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে একখানি উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য রচিত হইয়াছে। * * স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ক্ষমা, ত্যাগ একদিকে; কৃতঘ্নতা, অত্যাচার, কপটতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা অন্য-দিকে। স্বর্গের সঙ্গে নরকের এরূপ তুমুল সংগ্রাম বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা—জানি না।

* * *

"সরযূর এক একটি বাক্যের মূল্য লক্ষ মুদ্রার অধিক। * * * মহিম যখন ব্যঙ্গ-সহকারে কহিল "ভারি আমার সতীরে!" তখন সরযূ কহিল, "দেখ আমি সতী কি অসতী সে কথার বিচার একজন মাতালের মুখে, একজন বেশ্যাসক্তের মুখে শুনিতে চাই না। আমার সতীত্ব আমার ধর্ম্ম—তোমার নয়।" তাহার পরেই সে বলিতেছে "সতীত্ব আমার দেবতা;—তুমিত সে দেবতার পূজার বিল্বদল মাত্র।" বঙ্গসতী যে সতী, তাহার কারণ পতিভক্তি নহে, তাহার কারণ সতীত্বই সতীর

ধর্ম্ম—সতীর দেবতা। শ্যামাভক্ত ব্যক্তি যেমন মায়ের পূজার উপকরণ বলিয়া বিল্বদলকে পবিত্র চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সতীও সেইরূপ সতীধর্ম্ম আচরণের আধার বলিয়া স্বামীকে ভক্তি করে। কারণ কেবল পতিরূপ বিল্বদল দিয়া সে দেবতার পূজা হয়। কিন্তু পতির চেয়ে সতীর সেই দেবতা বড়। সেই জন্যই মহিম যখন সরযূকে তাহার সতীত্ব লইয়া ব্যঙ্গ করিলেন; তখন সরযূর আর সহ্য হইল না। সতী পতির সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে—নিজের অসতীত্ববাদ পতির মুখেও কখন সহ্য করে না। কারণ সতীর ধর্ম্ম পতি নহে, সতীর ধর্ম্ম সতীত্ব। এত বড় কথা পূর্ব্বে কেহ দাম্পত্য-সাহিত্যে শুনিয়াছিলেন কি?

* * *

"এই নাটকের ট্রাজিডি বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুতে নহে। এই নাটকের ট্রাজিডি বিশ্বেশ্বরের বিবেকের বিলোপে। এত বড় আদর্শ মনুষ্য হইয়াও অত্যধিক স্নেহ দুর্ব্বলতায় জ্ঞান হারাইয়া শেষে আত্মহত্যা করিল। ইহাই ট্রাজিডি! Too much sail and no ballast হইলে যাহা হয় তাহাই ঘটিল। তরী ডুবিল ইহাই ট্রাজিডি। এবং তাহা শরীরের ধ্বংসে নহে, মনুষ্যত্বের ধ্বংসে।

* * *

"মহিমের যদি মাতৃভক্তি থাকিত, তাহার সর্ব্বনাশ হইত না। যেই সে মাতৃভক্তি হারাইল, সেই সে পড়িতে আরম্ভ করিল। সে পতন দ্রুত ও গভীর। গ্রন্থকার মহিমের চরিত্রে মাতৃভক্তির ও কর্ত্তব্যহীন অন্ধ রূপজ লালসার ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন।

* * *

"কালীচরণের চরিত্র নূতন সৃষ্টি। প্রথম দেখিতে গেলে মনে হয় কালীচরণ যেন নিমচাঁদের দ্বিতীয় সংস্করণ, কিন্তু চরিত্রটি সম্বন্ধে একটু-

খানি আলোচনা করিলেই শীঘ্রই সে ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। কালীচরণ যদিও নিমচাঁদের মত মদ খায় ও full of quotations, তথাপি সে একজন সৎব্যক্তি। অসৎ-সঙ্গে মদ খায় কিন্তু অসৎ-সঙ্গে মেশে না; কাহারও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না; কোন আচরণ দ্বারা বিচলিত হয় না। * * * কালীচরণ দর্শক ও দার্শনিক। নিমচাঁদ পতিত। কালীচরণ একবারও পড়েন নাই। চরিত্রগত বিভিন্নতায়—কালীচরণ নিমচাঁদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

"প্রাক্তনের ফলে ও অদৃষ্টবিড়ম্বনায় পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও শান্তা বেশ্যা। * * ওস্তাদজির একটি কথায় সে বেশ্যা-বৃত্তি ছাড়িয়া দিল ও গান বেচিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। * * তৃতীয় অঙ্কে দেখি যে সে মহিমের প্রণয়িনী হইয়াছে। তাহার সমস্ত আবেগময় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সে মহিমকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু ওস্তাদজির হাতুড়ির একটি ঘা'তে সে স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। মহিমের যে স্ত্রী আছে! মহিমের ভালবাসা তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য। শান্তা বাহির হইতে আসিয়া তাহা গ্রাস করে কেন?—সেই মর্ম্মন্তুদ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য সে মহিমের স্ত্রীর কাছে ছুটিল। রামের দর্শনে অহল্যার শাপ মুক্তির মত সেই সতীর দর্শন মাত্রেই শান্তার মুক্তি হইল। এক মুহূর্ত্তে একটা মহা নৈতিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়া গেল! সতী-মহিমা এত উজ্জ্বল-ভাবে আর কেহ অঙ্কিত করিয়াছেন কিনা জানি না।

"নাটকে কেবল আদর্শ-চরিত্রই যে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির নায়ক কেহই আদর্শ-চরিত্র নহে। শকুন্তলার দুষ্মন্ত, কি উত্তরচরিতের রামও আদর্শ-চরিত্র নহে। উৎকৃষ্ট নাটকে ঘটনার সংঘাতে চরিত্রের আন্দোলন দেখান হয়। আদর্শ-চরিত্র কিন্তু অনেকটা নির্ব্বিকার। তবে অধম-চরিত্রকে

নায়ক করিয়া নাটক হয় না। বিশ্বেশ্বর মানবজাতির আদর্শরূপে চিত্রিত হন নাই। তিনি একজন ভাল লোক এই মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতা দেশপ্রসিদ্ধ। তবে—পরপারেতে যে রসিকতার অবতারণা করা হইয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। * * * হাস্য ও অশ্রু ; সরল ও গম্ভীর, মধুর ও করুণ মিশাইতে তাঁহার সমকক্ষ বঙ্গ-সাহিত্যে আর কেহ নাই—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু করুণ গভীর রসিকতা তাঁহার মত আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। পরপারে এই রসিকতার চরম বিকাশ!'' * * *

"পুত্রহারা, পতি-পরিত্যক্তা, হত্যাপরাধী ফেরারী আসামীর স্ত্রী (সরযূ) * * আবার দাদামহাশয়ের গৃহে আসিয়াছে। কিন্তু এ যেন সে পূর্ব্বপরিচিত সরযূ ও দাদামহাশয় নয়। যেন দুইটি রুদ্ধ আগ্নেয়-গিরি। বাহিরে নবজাত তৃণকুঞ্জে হরিৎ হাস্য খেলিতেছে বটে, কিন্তু অন্তর দারুণ জ্বালায় অহর্নিশ জ্বলিয়া যাইতেছে! সর্ব্বদা আশঙ্কা, কোন্ মুহূর্ত্তে, কোন্ রন্ধ্র দিয়া সে অন্তর্বহ্নি প্রবলবেগে বাহির হইয়া পড়ে। তাই রন্ধ্রমুখে রসিকতার দ্বারা চাপা দিবার চেষ্টায় ক্রমাগত উভয়ের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। এ দৃশ্য কি করুণ, কি প্রাণস্পর্শী! এমন গভীর দুঃখে এইরূপ সমবেদনার পরিহাস কেবল এক King Learএই দেখিতে পাই। * * * দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে নূতন বিবাহের পর নাতিনীর সঙ্গে দাদামহাশয়ের রসিকতার পাঁজর ভাঙ্গিয়া হাসি আপনিই ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু এ রসিকতায় সে হাসি আসে না, অনুকম্পারও উদ্রেক হয় না। প্রাণ যেন মস্তিষ্কচালনা বন্ধ করিয়া কোন গূঢ় রহস্যময় তথ্যের আবিষ্কার প্রত্যাশায় পলকহীন নেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। * * * ধধূপ দীপ্তমুখে ঝটিকা সন্তাড়িত ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় শ্রাবণের

নভোমণ্ডলের ভীষণ অবস্থা যেমন দ্বিগুণতর ভীষণ দেখায়, ম্লান হাস্যো-ভাসিত হইয়া সরযূ ও বিশ্বেশ্বরের তৎকালীন মনের অবস্থাও সেইরূপ স্পষ্ট দেখাইতেছে। এ রসিকতা বিদ্যুতের ব্যঙ্গ হাস্য—মথিত সমুদ্রের ফেনরাশি।"

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তদীয় "বঙ্গবাণী" (১৪৬ পৃঃ) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে মনুষ্যচরিত্রের কেবল মহনীয় অংশে এবং মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়াই বিভোর! দ্বিজেন্দ্রের প্রথম সামাজিক নাটক 'পরপারে' সমাজ-আদর্শকে সম্মুখে রাখিলেও, উহা ইয়োরোপীয় নিয়মের (ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারগণের) সমস্যামূলক নাটক বা problem drama নহে; উহার সমাধান কোনরূপ প্রতিজ্ঞা কিংবা প্রতিপাদ্য লইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। বঙ্গের আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতি এবঞ্চ দম্পতির মিলনসমস্যা প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিলেও, উহার ফল-শ্রুতির মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-প্রতিপাদক অভিসন্ধি যথোচিত মতে প্রবল হয় নাই। হয়ত, প্রথম রচনা বলিয়াই, তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় সমাজ-সমস্যার কোনরূপ গভীর ধারণা ও বিশিষ্টতা লাভ করে নাই। এই সমস্ত সর্ব্বতোভাবে কেবল ভাবপ্রধান আদর্শের নাটক (passion drama), পাত্রগণকে বিশেষ বিশেষ ঘটনাচক্রে এবং ভাবাবেগ-বশে পরি-চালিত করিয়া, পাঠকের রসানন্দ বিধান করাই উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে নানাদিকে অতুলনীয় ভাব সিদ্ধ করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গের আধুনিক নাট্যরসিকের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন।"

ইব্‌সেনের আদর্শে রচিত না হইলেও, পরপারে যে সমাজ-সমস্যামূলক তাহা নাটকখানি যিনি একটু অবহিত হইয়া পাঠ করিয়াছেন তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। উক্তরূপ সূক্ষ্ম সমালোচনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল পরপারের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

স্বরূপ নাটকের "মানের বহি" মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেই "মানের বহি" হইতে এবং বিজয় বাবুর লিখিত সমালোচনা হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাই শশাঙ্ক বাবুর মন্তব্যের পর্য্যাপ্ত প্রতিবাদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পরপারে নাটকখানিও ষ্টার-থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহা দ্বিজেন্দ্রের অপরাপর নাটকের ন্যায় রঙ্গালয়দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। জনসাধারণের অভিমত—নাটকখানি বুঝিবার পক্ষে কিছু শক্ত ঠেকিয়াছিল। কিন্তু উত্তরোত্তর ইহার আদর হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়।

আনন্দ-বিদায়—এই নাটিকাখানি (প্যারডি) দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ রঙ্গ-রচনা। এই পুস্তকখানি ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। কবি "বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গ-প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা রসিকপ্রবর কবি শ্রীযুক্ত অমৃত-লাল বসু মহাশয়ের করকমলে" এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। অমৃত বাবুকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহাকে 'ঠাকুরদা' সম্ভাষণ করিতেন এবং অমৃত বাবুই প্রথমে দ্বিজেন্দ্রের 'বিরহ' নাটক ষ্টারে অভিনয় করিয়া বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে দর্শকসমাজে দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকার খ্যাতি লাভের সহায় হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—"এই নাটিকা বহু বর্ষ পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আকারে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম প্যারডি নাটিকা। ইয়ুরোপীয় অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে প্যারডি নাটিকার অস্তিত্ব আমি অবগত নহি। প্যারডি কবিতা ও গান সর্ব্ব সাহিত্যেই প্রচলিত আছে।

"প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ। তাহাতে কাহারো ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবার কথা। কারণ বিখ্যাত রচনার প্যারডিই

লোকে করিয়া থাকে। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট', মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ', হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপ', ঠাকুর দেবতা বিষয়ক বহু গানও এই নকলের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মদ্রচিত কয়েকটি গানও এই সম্মান লাভ করিয়াছে।

"এই নাটিকা যে প্রতিভাবান্ কবির শ্রেষ্ঠ নাটিকার প্যারডি, তিনি সম্প্রতি ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হোক। এবং যে নাটিকার ইহা প্যারডি রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্যে তাহা অমর হোক।"

এস্থলে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বর্গীয় কবি অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের "নন্দবিদায়" গীতি-নাট্যখানির উল্লেখ করিয়াছেন!

দ্বিজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই।" রঙ্গালয়ের দর্শকেরা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের এই আশ্বাসবাক্যে আস্থা স্থাপন করে নাই। ষ্টার-থিয়েটারে এই নাটিকার প্রথম ও শেষ অভিনয় রজনীতে দর্শকেরা ইহাকে কবিবর রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহা পরিচ্ছেদান্তরে উত্থাপন করিব।

এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের, গিরিশচন্দ্রের, ক্ষীরোদপ্রসাদের এবং অতুলকৃষ্ণের গীতগুলির যে প্যারডি আছে তাহার রঙ্গরস অধিকাংশ স্থলে উপভোগ্য, কিন্তু এই নাটিকার আখ্যান-বস্তু সুরুচিসঙ্গত নহে এবং ব্যঙ্গ সর্ব্বত্র অনাবিল নহে।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরক্ত সুহৃদ্ দেবকুমার বাবু আভাষ দিয়াছেন যে দ্বিজেন্দ্র এই পুস্তকে একটা গর্হিত আদর্শের প্রতিবাদ করিয়াছেন—কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

"দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়, চরিত্র ও আচরণে সর্ব্বত্রই পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েলি ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই তিনি লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুলরাখা, নাকি সুরে কথা বলা, মন্থর পাদক্ষেপে গমন, অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর চিরদিন 'হাড়ে চটা' ছিলেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকের মত হইবে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার আনন্দ-বিদায় নামক (Parody) অনুকৃতি-কৌতুকে তিনি যেন কতকটা আত্মবিস্মৃত হইয়া অশোভন রূপে ও অন্যায় ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়া-ছিলেন।" (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২২)

দ্বিজেন্দ্রলাল যে আদর্শের প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া যিনি এক সময়ে খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণ্যে তাঁহারই বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলিয়া 'আনন্দ-বিদায়' পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিরুদ্ধবাদী সমালোচকগণের মুখপাত্রস্বরূপ অর্চ্চনা-পত্রে (পৌষ, ১৩১৯) সাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় এই পুস্তকের যে তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকটি ছত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"আনন্দ-বিদায় নাটিকাও প্রধানতঃ সেই (রবীন্দ্রনাথের দর্পহরণ) উদ্দেশ্যে চরিত। * * * রস পরিচালনায় লেখক ইহাতে আদৌ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। * * * বটতলার যে রসের তরঙ্গ আমরা কাটাইয়া উঠিতে ছিলাম, আজ দেখিতেছি সেই রসের ভাঁড় হাতে করিয়া দ্বিজেন বাবু মাতৃমন্দিরে উপস্থিত। * * * গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন বটে 'এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই।' কিন্তু পাঠক সাধারণে একথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাহারা বলে যে আনন্দ-বিদায় নাটিকার ৪২ পৃষ্ঠায় রাজা * * * ও মহাত্মা * *র প্রতি

কটাক্ষ আছে। * * এই নাটিকার প্রথম অভিনয়-রজনীতে দর্শকগণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হওয়ায় দ্বিজেন বাবু দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে 'বাঙ্গালা দেশে প্যারডি বুঝিবার এখনো সময় আসে নাই।' আমাদের কিন্তু মনে হয় বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, সেইজন্যই এই নাটিকার আর দ্বিতীয় অভিনয়-রজনী হইল না।"

ভীষ্ম।—এই নাটকখানি কবির পরলোকগমনের পর ১৩২০ সালে প্রকাশিত হয় এবং এ পর্য্যন্ত কোনও প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই। ষ্টার-থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনপ্রিয় অভিনেতা ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই নাটকখানি উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিতে গ্রহণ করিয়া কালক্ষেপ করায় নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় মুদ্রিত হইয়াও বহুদিন পড়িয়াছিল—নাট্যকারের জীবনাবসানের পর তদীয় পুত্র ইহা প্রকাশ করেন। ষ্টার-থিয়েটারের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, তিনি অমরেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিয়াছিলেন (অমৃত বাবু তৎকালে কাশীতে ছিলেন) যে দ্বিজেন্দ্র দুই সহস্র মুদ্রার কমে ঐ নাটক অভিনয় করিতে দিতে রাজি ছিলেন না বলিয়াই এই বিলম্ব ঘটে—অমরেন্দ্র বাবু এক হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পুস্তক না দেখাইয়া দুই হাজার টাকা দিতে সম্মত হইতে পারেন নাই—ভাবিয়া দেখিবেন বলিয়াছিলেন, পুস্তকখানি গ্রহণ করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই; দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু টাকা না লইয়া পুস্তক ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়েন নাই। দ্বিজেন্দ্রের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র মহাশয় বলেন—যে শেষে অমরেন্দ্র বাবু নাটকখানি ষ্টারে অভিনয় করিবার প্রতিশ্রুতিই দিয়াছিলেন এবং টাকার গোলযোগও মিটিয়া গিয়াছিল—দ্বিজেন্দ্র এক সহস্র টাকা লইয়াই পুস্তক দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পরপারে নাটক অর্থাগমের হিসাবে আশানুযায়ী

সাফল্য লাভ না করাতে অধিক মূল্যে ভীষ্ম নাটক লইতে অমরেন্দ্র বাবু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক, দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, এই বিলম্বের জন্য জীবনের শেষ কয়েকমাস দ্বিজেন্দ্রলাল নিরতিশয় মনক্ষুণ্ণ হইয়া ছিলেন।

ঘটনাক্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রথম ও শেষ নাটক দুইখানি—বিরহ ও ভীষ্ম—(ভীষ্মকেই শেষ নাটক বলিলাম, কারণ বঙ্গনারী ও সিংহল-বিজয়, দ্বিজেন্দ্রলাল অসংশোধিত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন) ষ্টার-থিয়েটারকে অভিনয় করিতে দেন—এবং ভাগ্যচক্রে প্রথমোক্ত নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হয়;—অমৃত বাবু বলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল দেড়বর্ষকাল তাঁহার নিকট যাতায়াত করিলে তবে তিনি 'বিরহ' নাটিকা গ্রহণ করেন;—তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলাল নূতন লেখক—তাঁহার 'বিরহের' নূতনত্ব রঙ্গালয়ে 'লাগিবে' কি না, তাহা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়াই অমৃত বাবু কালহরণ করিয়াছিলেন। আর দ্বিজেন্দ্রের শেষোক্ত নাটকখানির দুর্গতির কারণ উপরে উক্ত হইয়াছে। শেষে দ্বিজেন্দ্র-লালের ও অমরেন্দ্র বাবুর উভয়েরই শোচনীয় অকালমৃত্যুতে সকল গণ্ডগোলের শেষ মীমাংসা হইয়া যায়—"ভীষ্ম"কে আর রঙ্গালয়ের লোক-লোচনে আবির্ভূত হইতে হয় নাই। রঙ্গালয়ের আনন্দ-দুলাল দ্বিজেন্দ্র-লালের উক্ত নাটকদ্বয়ের এই ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা অবগত হইয়া হয়ত বাণীভক্তগণ বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবেন, কিন্তু থিয়েটারসংশ্লিষ্ট নাট্যকারগণ যাঁহাদের নব নব নাটকরাশি (বা ঐ নামে অভিহিত নাট্যসাহিত্যের আবর্জ্জনা) বিনা উমেদারীতে, রঙ্গমঞ্চসমূহে মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে—তাঁহারা আপনাদের ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিবেন!—অবশ্য রঙ্গালয়ের বাহিরে তাঁহাদের নাট্যকীর্ত্তি বিস্মৃতির অতলে স্থায়ী স্থান লাভ করিতেছে সে এক স্বতন্ত্র কথা—সেখানে ত আর তাঁহাদের আত্মীয়

নাট্যশালা-পরিচালকগণের হাত নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। ষ্টার-থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের পুস্তক অভিনয়ের উপর কি যেন একটা কুগ্রহের দৃষ্টি ছিল। বিরহ ও ভীষ্ম ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতাপসিংহ, ত্র্যহস্পর্শ, পরপারে ও আনন্দ-বিদায় ষ্টার-থিয়েটারকে অভিনয় করিতে দেন। ত্র্যহস্পর্শ ও আনন্দ-বিদায়ের অভিনয় আরম্ভ করিয়াই বন্ধ করিতে হয়। প্রতাপসিংহ লইয়া মনোমালিন্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং পরপারেও প্রথম প্রথম রঙ্গালয়ে লোকরঞ্জন বা অর্থাগম হিসাবে আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভীষ্ম নাটকখানি "বর্ত্তমান যুগের নূতন ভাবের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মহাপুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে" উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

কবি 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছিলেন—"ভীষ্মের মত মহৎ চরিত্র আর মহাভারতে নাই বলিলেও চলে। সেই দেবচরিত্র লইয়া নাটক রচনা করা আমার পক্ষে অসম সাহসিকতার কথা। অথচ এরূপ চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রলোভনও সংবরণ করিতে পারি নাই। পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

"আমি ভীষ্মের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। কিংবা ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণিত কাব্যটুকু সংকলন করিতেও বসি নাই। ভীষ্মের জন্মবৃত্তান্ত হইতে নাটক আরম্ভ না করিয়া সেই জন্য আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি এবং কোনও কোনও স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।" * * *

এই নাটক খানি গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই লিখিত। পদ্যাংশে মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের গাম্ভীর্য্য, ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও শব্দৈশ্বর্য্য না থাকিলেও উহা অধিকাংশ স্থলে "পাষাণী'র অমিত্রাক্ষরের মত সুখপাঠ্য।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ভীষ্মের সহিত অম্বিকা ও অম্বালিকার যে কথোপকথন আছে তাহা তরল ও নির্ম্মল পরিহাস-রসিকতার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ভীষ্মের সহিত পরশুরামের যে বাক্য-বিনিময় আছে তাহা ভীষ্মের মত উন্নত চরিত্র ক্ষত্রিয়েরই উপযোগী এবং চমৎকার।

এই নাটক খানিকে কবির অনুপম মহাসঙ্গীত "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" মহিমান্বিত করিয়াছে। এই নাটকে যে পিতৃভক্তির ও মাতৃভক্তির অভিব্যক্তি আছে তাহাতে আমরা কবির নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাই।

কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক আমার বিশ্বাস যে আমার কল্পনা দ্বারা ভীষ্মের মহৎ আদর্শ চরিত্র কুত্রাপি ক্ষুণ্ণ করি নাই।" রসজ্ঞের চক্ষেও কবির এই উক্তি অভ্রান্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ভীষ্মের চরিত্র সর্ব্বত্র মহামহিমাময় করিয়াই কবি আঁকিয়াছেন। ভীষ্মচরিত্র নাট্যকারের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

অম্বিকা ও অম্বালিকার মনের অনন্ত-যৌবনের যে চিত্র এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল আঁকিয়াছেন, তাহাও অনবদ্য ও অতুল্য এবং সত্যবতীর দৈহিক অনন্ত-যৌবনের চিত্রের পার্শ্বে উভয় চিত্রই উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অম্বিকা ও অম্বালিকার চরিত্র-যুগল কবি-কল্পনার শোভন বিকাশ। সেই নারীদ্বয়ের অবস্থার সহিত নিজের দুরদৃষ্টের তুলনা করিয়া সত্যবতী যে মর্ম্মন্তুদ বাক্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহার কঠোর সত্য শ্রোতার হৃদয়ে গিয়া আঘাত করে—

"এই অন্তরের চারু অনন্ত যৌবন
বন্দী করে ব্যাধির ভ্রূকুটি, সন্ধি করে

জরার লুণ্ঠন সনে সুপ্ত করে ভয়,
ব্যপ্ত করে বিশ্ব এক আনন্দ সঙ্গীতে।
এর কাছে কি ছার এ অনন্ত যৌবন!—
অনমিত মেরুদণ্ড, অবিলোল দেহ,
অগলিত দন্তপাতি, অপলিত কেশ—
কি করিবে যবে এই হৃদয় শ্মশান।
—বর বটে ঋষি—যাহা ভুজঙ্গের মত
আমারে বেষ্টিয়া আছে। বর ফিরে লও
ঋষিবর! আমারে এ কারাগার হতে
মুক্ত করে দাও! এই অন্তঃসারহীন
জীর্ণ, রম্য হর্ম্ম্য যাক, ভেঙ্গে পড়ে যাক্।
শেষ কর রূপের এ ব্যঙ্গ অভিনয়!"

উপরোক্ত এবং অপরাপর প্রশংসার বিষয় থাকিলেও কিন্তু এই নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। ইহার স্থানে স্থানে কবি তাঁহার মার্জ্জিত রুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সত্যবতীর পদস্খলনের চিত্রে কবি যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণ পাত করিয়াছেন তাহা না করাই উচিত ছিল। শাম্বের চরিত্রের বীভৎসতম চিত্রই তিনি পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অথচ শাম্ব-চরিত্রের এই ঘৃণিত বীভৎসতা কবির স্বকপোলকল্পিত—মহাভারতে এরূপ কিছু নাই। কবি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন "কাল্পনিক বীভৎসতা করায় লাভ নাই;" ('পরপারে'—ভূমিকা) কিন্তু এস্থলে তিনি নিজেই সেই নীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন। ভীষ্ম নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে শাম্বর সয়তানীয় ও সত্যবতীর অন্তরের যে নারকীয় চিত্র দেখাইয়াছেন তাহা যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া ইঙ্গিতে উল্লেখ করিলে নাটকের কোনও ক্ষতি হইত না।

সত্য বটে সেকস্‌পীয়ারের Richard III (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) এ ঐরূপ ঘৃণিত দৃশ্য আছে। কিন্তু সেই নজির দিয়া কবির পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করা বৃথা বলিয়া মনে হয়। সেকস্‌পীয়র তাঁহার নাটকে ভীষ্মচরিত্র আঁকেন নাই—ভীষ্ম-চরিত্র পাশ্চাত্যদেশের ধারণার অতীত। ভীষ্মচরিত্র আঁকিলে তাহার পার্শ্বে সেই নাটকে শাম্ব-চরিত্রের যেরূপ চিত্র দ্বিজেন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেরূপ চিত্র দিতে সেক্‌স্‌পীয়রও কুণ্ঠিত হইতেন। ঐ চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় দ্বিজেন্দ্র বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন—সত্যবতী আর যাহাই হউন, তিনি বেদব্যাসের জননী।

দ্বিজেন্দ্রের ভীষ্ম নাটক যখন রঙ্গালয়ে জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, সেই সময়ে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "ভীষ্ম" নাটক প্রকাশিত হয়। সে নাটকে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত পাপের চিত্র নাই এবং সত্যবতীকে নাট্যকার বেদব্যাসের জননীর যোগ্য চরিত্রই দিয়াছেন; কিন্তু সে জন্য নাটকত্বের কোনও ক্ষতি হয় নাই, প্রত্যুত নাটক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া রসজ্ঞগণ সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে একথা অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার নাটকের উক্ত ত্রুটী থাকিলেও তিনি ভীষ্মের যে সুন্দর ও মহান্‌ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। পরন্তু একথাও উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্দ্র এই নাটকের প্রথমাংশে যে পাপের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে লালসার উদ্রেক করে না, পাপের উপর বিতৃষ্ণাই আসে, সহানুভূতি আসে না—এ বিষয়ে কবির কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।

সিংহল বিজয়। এই নাটকখানি কবির মৃত্যুর প্রায় দেড়বর্ষ পরে, ১৩২২ সালের আশ্বিন মাসে, প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রের স্নেহাস্পদ সুহৃদ্‌ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র মহাশয় বলেন যে, তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসে বিজয়সিংহের কথা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রকে সেই বিষয়ে একখানি

নাটক রচনা করিতে বলেন। পরন্তু তিনি সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে বিজয়সিংহের বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক আনিয়া দ্বিজেন্দ্রকে পাঠ করিতে দেন। সেই পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্র বলেন বিষয়টী চমৎকার বটে এবং সেই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া তিনি সিংহল বিজয় নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থের "নিবেদনে" কবির পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় লিখিয়াছেন—

"স্বর্গীয় পিতৃদেবের বড় সাধের শেষ নাটক "সিংহল বিজয়" এত দিনে প্রকাশিত হইল। বঙ্গের রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহল জয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে ইহা লিখিত। পিতৃদেব এই পুস্তক সমাপ্ত করিয়া আদ্যোপান্ত পুনরালোচনা ও সংশোধন করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ইহার পৃষ্ঠা সকল ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এতদিন যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার বাবু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উহা অভিনয় করিতে উৎসুক হওয়ায় প্রকাশ করিলাম। অনেক পত্রে পত্রাঙ্ক না থাকায় এত গোলমাল হইয়াছিল, যে বোধ হয় অপরেশ বাবু বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এইগুলি মিলাইয়া না লইলে, এই পুস্তক প্রকাশ করা ভার হইত। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

"এখানে একটি কথা, অনাবশ্যক হইলেও কারণ বশতঃ বলিতে বাধ্য হইলাম। একটা গুজব উঠিয়াছে যে, এই পুস্তকের পঞ্চম অঙ্ক ৺পিতৃদেবের লিখিত নহে, অন্য কেহ লিখিয়াছে, সে কথা সর্ব্বৈব কল্পিত। তাঁহার হস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট রহিয়াছে। তবে তিনি পঞ্চম অঙ্ক পুনরালোচনা করিতে সময় পান নাই বলিয়া অন্যান্য অঙ্কের ন্যায় সুন্দর না হইতে পারে। অন্যের দ্বারা সংশোধন করাইয়া

লইয়া হয়ত উক্ত অঙ্কের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারিত, কিন্তু যে নাটক তিনি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অন্যের লেখা প্রবেশ করাইতে আমি ইচ্ছা করি না। এমন কি, তিনি গানগুলি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি আমি অন্যের গান ইহাতে সন্নিবেশিত না করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়াছি। এ সম্বন্ধেও আমি শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবুর নিকট ঋণী। ৺পিতৃদেব দুইটী মাত্র গান ইহাতে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সে দুইটী এই—"যাওহে সুখ পাও" ইত্যাদি এবং "কে আছ ওপারে" ইত্যাদি, অন্যান্য গানের স্থলে কেবলমাত্র "গান" লিখিয়া গানের জন্য স্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

এই নাটকে কবির অপরাপর গানগুলির মধ্যে তাঁহার দুইটি মহা-সঙ্গীত "ওরে আমার সাধের বীণা" এবং "ভারতবর্ষ" স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সকল গানগুলির প্রয়োগ স্থান কাল পাত্রের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অন্ততঃ প্রথমোক্ত সঙ্গীতটীর যে যোগ্য ব্যবহার হয় নাই তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

ভীষ্মনাটকে কবি বিমাতার চরিত্রের অন্ধকার দিকটা যৎপরোনাস্তি মসীবর্ণেই চিত্রিত করিয়াছেন—এই নাটকে কবি একেবারে দুইটি কৈকেয়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কেবল মাত্র, দশরথের মত স্ত্রৈণ পিতার আদর্শে সন্তুষ্ট না হইয়া হ্যামলেটের Claudius চরিত্রের মত একটা বি-পিতারও সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই নাটকখানি প্রথমে পদ্যে রচিত হয়। পরে কবির আত্মীয় ও বন্ধু অধর বাবু তাঁহাকে বলেন—যে তাঁহার গদ্যের force তাঁহার পদ্যে নাই। দ্বিজেন্দ্র নিজেও সেই ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া নাটকখানি পদ্য ভাঙ্গিয়া গদ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সংশোধন ও পরিবর্ত্তন কার্য্য সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন। জীবিত থাকিলে

হয়ত কবি সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া উৎকৃষ্টতর আকারে নাটকখানি প্রকাশ করিতেন। এই নাটকখানি পরিমার্জ্জন করিতে করিতেই দ্বিজেন্দ্রের ইহজীবনের শেষ নিমেষপাত হয়। কবির মৃত্যুস্মৃতির সহিত বিজড়িত এই নাটকের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে এই নাটকে কবির স্বভাবসিদ্ধ রচনা নৈপুণ্যের অভাব নাই, ইহাতে নাটকোচিত চমকপ্রদ ঘটনার সংস্থান আছে—কবিত্বের উচ্ছ্বাস আছে—পাত্র পাত্রীদের অনেকেই এক একটি কবি। এই নাটক কবির শ্রেষ্ঠ নাটক সমূহের সহিত বাণীমন্দিরে একাসন না পাইলেও আমাদের বিশ্বাস ইহা ভারতীচরণে অর্পিত দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ অর্ঘ্য—কবির "Swan song"- বলিয়া বাণীভক্ত মাত্রেই সমাদরে গ্রহণ করিবেন। রঙ্গালয়ে ইহা আদর পাইয়াছে।

মেবার পতন নাটকের আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি যে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যদেশের ঋষিকল্প বাণীপুত্র টলষ্টয়ের সর্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাবের—বিশ্বপ্রেম নীতির আলোচনা করিয়া সেই নীতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠেন। মেবার পতনের ন্যায় এই নাটকেও সেই নীতির অভিব্যক্তি আছে। এই নাটকখানি রচনা কালে দ্বিজেন্দ্রের মনের গতি কোন্‌দিকে ধাবিত হইতেছিল, নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথনটিতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। অধর বাবু বলেন, এই দৃশ্যটীর পরিশোধন করিতে করিতেই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় :—

"বালক। ভালবাসা দু'রকম আছে। * * * এক ভালবাসা আছে, যা সর্ব্বদা প্রিয়জনকে আপনার ক'রে নিতে চায়—যে সাহচর্য্য প্রতিপক্ষ প্রণয় সহ্য করতে পারে না, যে প্রেম তার পুষ্পকোমল ক্ষীণ বাহুর বন্ধনে একটা জগৎকে আঁকড়ে ধরতে চায়, বক্ষের মধ্যে একটা অগাধ অস্থির সমুদ্রকে বেঁধে রাখতে চায়।

কুবেণী। ঠিক বলেছ বালক! আমার সেই প্রেম সর্ব্বগ্রাসী, অধীর, অসহ্য, অস্থির, প্রেম। বিশ্বে আর কিছু জানি না, মানি না—শুধু তাকেই চায়। ঐ চাঁদ, ঐ সমুদ্র, এই উৎসব শয্যা—এ সব চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত ভেসে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে এক চিন্তা, হৃদয়ে এক ভাব, জীবনে এক লক্ষ্য, ইহকালে এক সুখ—তার ভালবাসা।

বালক। জানি, তুমি প্রতিদানের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে জেনো—মহারাণী! যা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়, সুখী করে সুখী হয়। তার ভালবাসা এক কণা পাই—ত আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি, কিন্তু যদি না পাই, ক্ষতি নাই—কারণ সে ভালবাসার আশা করি না। সেই রকম ভালবাসা একবার বাস দেখি মহারাণী। দেখবে, যে আর ভয় নাই দ্বিধা নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই।

কুবেণী—সে কথার কথা।

বালক—যদি তাই হয়, তবু সেই মন্ত্র জপ কর। কামনাহীন প্রেম জপ কর।

কুবেণী! শুধু কামনাহীন প্রেম! একটা কথা শব্দ মাত্র।

বালক। যদি তাই হয় তার কি মূল্য নাই? কথা—শব্দ—ধ্বনি মাত্র—কাণের ভিতরে নিত্য যেতে যেতে যদি বা কখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে অন্তরের দ্বার খোলা পেয়ে সেখানে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের লোক নিত্য হরিনাম জপ করে—শুদ্ধ জপ করে। মনে হয়, তার মধ্যে গূঢ় অর্থ আছে। হয়ত বা সেই নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন, সেই হরিনাম, কখন কোন সুযোগে আকার ধারণ করে, হয়ত বা সেই শব্দেই একখানি হৃদয়ের বীণা বেজে ওঠে—নিশ্চয় এরকম হয়েছে, নৈলে তারা করবে কেন।"

বঙ্গনারী। দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুই বর্ষ পরে, ১৩২২ সালের ১২ই চৈত্র, এই নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। সামাজিক নাটক রচনার কথা প্রসঙ্গে একদিন শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় দ্বিজেন্দ্রকে "improvident marriage" বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করিতে বলেন। সেই কথামত কন্যার বিবাহে ক্ষমতাতীত ব্যয়ের বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্র এই "বঙ্গনারী" নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই নাটক লিখিতে লিখিতে একটী গণিকা-চরিত্রের বিকাশ এতই উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে দ্বিজেন্দ্র বলেন যে সেই গণিকার চরিত্রে আর একখানি স্বতন্ত্র নাটক হইতে পারে। তদনুযায়ী তিনি সেই চরিত্র—শান্তাকে অবলম্বন করিয়া "পরপারে" নাটক রচনা করেন। "পরপারে" নাটক রচিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু "বঙ্গনারী" পড়িয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় দুই বর্ষ কাল উহার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নাই, সেই হেতু "সিংহল বিজয়" নাটক মুদ্রাঙ্কন ও অভিনয়ের সময়ে উহাই দ্বিজেন্দ্রের শেষ নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়। এক হিসাবে সেই কথা অসত্য নহে, কারণ "সিংহল বিজয়" নাটক রচিত হইবার পূর্ব্বেই "বঙ্গনারী" রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের মুখবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমার লিখিয়াছেন—

"স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করেন, কিন্তু তখন ইহা এরূপ বৃহদাকার হইয়া পড়িয়াছিল যে তাদৃশ বৃহৎ নাটক রঙ্গভূমিতে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হইবার পক্ষে অনুপযোগী বোধে, তিনি ইহার এক অংশ লইয়া "পরপারে" রচনা করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তিনি অনেকবার এই গ্রন্থখানি তদীয় বন্ধুগণের ও আমাদের সমক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার

মৃত্যুর পরে, আমি তাঁহার লিখিত কাগজ পত্রের মধ্যে ঐ নাটকখানি খুঁজিয়া পাই নাই। তখন আমার ধারণা হয় যে, নাটকখানি কোনরূপে হারাইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এ যাবৎকাল আমার এ সম্বন্ধে এইরূপই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সাতমাস পূর্ব্বে, স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু লাকুটিয়ার জমীদার সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে বলেন যে, পিতৃদেবের একখানি সামাজিক নাটক তাঁহার নিকট আছে। তদনন্তর আমি নাটকখানি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়া দেখি যে ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট "বঙ্গনারী"। অনতিবিলম্বে আমি মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয়ে জানাই, এবং তিনি পুস্তকখানি সম্পূর্ণ আছে দেখিয়া ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করেন।

"নাটকখানি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ নাটকখানি স্বর্গীয় পিতৃদেব কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই; এজন্য ইহাতে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু মাত্রেই জানেন যে, সংশোধন কার্য্যে তিনি বাহুল্যের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন; অনেক সময় সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার লিখিত কোন কোনও অংশ সম্পূর্ণ ভিন্নাকৃতি ধারণ করিত বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। তিনি নাটকখানি লিখিয়া, ভবিষ্যতে যথাযথ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবেন স্থির করিয়া, তৎকালে অগ্রে "পরপারে," "আনন্দ বিদায়," "ভীষ্ম" প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার অকাল-মৃত্যু-নিবন্ধন নাটকখানি তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল না।

"দ্বিতীয়তঃ, নাটকখানিতে গীত সংখ্যায় অল্পতা দৃষ্ট হইবে। স্বর্গীয় পিতৃদেব পুস্তকখানির জন্য "ঘোরো ঘোরো" নামক গীতটি লিখিয়া-

ছিলেন মাত্র এবং "চিরজীব সুখিনী" ও "এবার হয়েছি হিন্দু" নামক দুইটি গান মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তনের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তথায় কোনও গান না থাকায় "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়" গানটি পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী।

তৃতীয়তঃ, স্বর্গীয় পিতৃদেব যে এ নাটকখানি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, নাটকান্তর্গত একটি দৃশ্য, দেশ কাল পাত্র হিসাবে, গিরিশবাবুর প্রসিদ্ধ নাটক "বলিদানে"র একটি দৃশ্যের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে; সেটি, বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরকে প্রদানার্থে আশীর্ব্বাদের দৃশ্যের প্রথমটা। স্বর্গীয় পিতৃদেব একথা আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে যদি ঐ দৃশ্যটির সুচারু পরিবর্ত্তন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বীকার কবিবেন যে, এরূপ দৃশ্য সাদৃশ্য তাঁহার ইচ্ছাকৃত না হইলেও, ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছে।"

দ্বিজেন্দ্রের শ্রদ্ধাস্পদ অন্তরঙ্গ—"দাদামহাশয়" শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

"৺দ্বিজেন্দ্রের ইহলোক ত্যাগের পর তাঁহার যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বঙ্গনারী" বোধ হয়, শেষ পুস্তক। কারণ তাঁহার প্রকাশের উপযুক্ত আর কোনও গ্রন্থ থাকার বিষয় আমরা অবগত নহি, সম্ভবতঃ নাই। আর যে দুইখানি ক্ষুদ্র প্রহসন আছে, তাহা বিশেষ কারণ বশতঃ প্রকাশিত হইবে না। * *

"* * "বঙ্গনারী" একখানি সামাজিক নাটক। ইহা যে কেবল উদ্দেশ্য-শূন্য সামাজিক চিত্র তাহা নহে। বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আন্দোলনের সম্বন্ধে একটা বিচার করাই ইহার উদ্দেশ্য। বিবাহে পণ-

প্রথা লইয়া আজকাল বঙ্গ-হিন্দু-সমাজে যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রের অভিমত ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত যে সকল বিতর্কাদি হইত, তাহারও সারাংশ এই নাটকের পাত্রপাত্রী দ্বারা বিবৃত করা হইয়াছে। সদানন্দের কথায় অধিকাংশ গ্রন্থকারের নিজের অভিমত। সদানন্দের চরিত্রেও গ্রন্থকারের নিজের চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। "আমি এখন আর হাসির গান গাই না—ভাল লাগে না।" একথা, স্ত্রী-বিয়োগের পর, দ্বিজেন্দ্র কতবার বলিয়াছেন। সদানন্দ—বিলাত-ফেরত, সরল উদার, মহৎ ও সচ্চরিত্র ও পরদুঃখকাতর,—দ্বিজেন্দ্রও তাই। কবি সদানন্দকে দিয়াই নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

"পণ-প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, যে, এই পণ-প্রথা যতই কুৎসিৎ বা নিন্দনীয় হউক না কেন এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য যিনি যতই পক্ষপরিকর হউন না কেন, ইহা সহজে নিবারিত হইবে না। যেথানে কন্যার বিবাহ, নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে দিতেই হইবে, অথচ পুত্রের বিবাহে সে নিয়ম নাই, যেথানে, উপযুক্ত পাত্রের বাহুল্য নাই, অথচ প্রতিযোগিতা বিলক্ষণ আছে; যেথানে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়াছে, * * * সে দেশে যথন পণ-প্রথা একবার প্রবল হইয়াছে, তথন তাহাকে দূর করা ভার।

তাহা হইলে, এ দরিদ্র দেশে কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার মোটামুটি একটা আভাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ, বাল্য-বিবাহ এদেশের ভয়ানক বিপজ্জনক। যে দেশে অন্নাভাব দিন দিন প্রবলরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে দেশে উপার্জ্জনে অক্ষম বা ছাত্রাবস্থায় অবস্থিত লোকে বিবাহ করিয়া দরিদ্র সংখ্যা বৃদ্ধি করে কেন? কন্যাকে বয়স্থা করিয়া, লেথাপড়া শিক্ষা দিয়া, আবশ্যক হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে, এমনভাবে শিক্ষা দিয়া, তাহাদের সম্মতিক্রমে নিজের অনুরূপ গৃহে তাহাদের বিবাহ দাও; না

পার, কন্যা ব্রহ্মচর্য্য করুক। * * * ধনী, সক্ষম লোকে কুমারী কন্যা কেন, বিধবা-বিবাহ পর্য্যন্ত দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অক্ষম পক্ষে বিবাহ অপরিহার্য্য নয়। * * *

"তাহার পর, কবির সর্ব্বজন বিদিত চরিত্র অঙ্কনে অসীম শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কেদার এক চমৎকার অভিনব চরিত্র। উপেন্দ্র ধর্ম্মের ভাণকারী ভণ্ডের চরম আদর্শ। বিনোদিনী ও সুশীলা—একজন সংস্কৃত ও অপরা, কেবল ইংরাজী শিক্ষিতা নারী-চরিত্র।"

এই নাটকে সদানন্দের মুখে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বিবাহে পণ-প্রথা' বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সদানন্দ। দেবেন্দ্র! পুত্র-কন্যা যখন এ সংসারে এনোছো, তাদের ভরণ-পোষণ কর্ত্তে তুমি বাধ্য। ছেলের ভরণ-পোষণ তুমি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ব্বে, আর মেয়েদের দশ বৎসর না পেরোতেই সে ভরণ-পোষণের ভার বরপক্ষের উপর চাপিয়ে দেবে, বাকী পনর বৎসর ভরণ-পোষণের জন্য বরপক্ষকে কি কিছু দেবে না? তার উপর পুত্র হ'লেন তোমার যা কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর মেয়ে কি ভেসে এসে ছিল? কন্যার পিতারা চান কন্যাদের একেবারে ফাঁকি দিতে। সমাজ সে ফাঁকিটা দিতে দিচ্ছে না—এই তার অপরাধ।"

এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রের "ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়"—কীর্ত্তনটী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র এই গীতটী গায়িবার সময় রসোদ্গার করিতেন। গীতটী ভণ্ডদের মুখে—অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে—কিন্তু নিরুপায়। দ্বিজেন্দ্রের রচিত অপর কোনও অপ্রকাশিত কীর্ত্তন গান ছিল না।

নাটকখানি রঙ্গালয়ে প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রথমে অনেকের

ধারণা হইয়া ছিল এই নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রের লেখা নহে—উক্ত থিয়েটারের অধ্যক্ষেরই লেখনীপ্রসূত ; এ ভ্রম এখনো যে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নাটকখানি "পরপারে" অপেক্ষা রঙ্গালয়ের দর্শকগণের নিকট সমাদর পাইয়াছে—এবং সে আদর স্থায়ী হইয়া নাট্যকারের কৃতিত্বের ঘোষণা করিতেছে।

চট্টগ্রামের কবি ও মনস্বী সমালোচক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি-এল্, তদীয় "বঙ্গবাণী" নামক গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রের নাটক সমূহের যে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার অংশ বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"দ্বিজেন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও গদ্যে রচিত হইয়া কাব্যশক্তির প্রধান অবলম্বনটুকু পরিহার করিয়াছে ; পদ্যে রচিত হইলে উহাদের সমাধান কি হইত বলা দুরূহ! তবে উহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহাদের মধ্যে কোন অসাধারণ কবিত্ব বা বিভাবনার পরিচয় না থাকিলেও উহারা লৌকিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রের বর্ণতূলিকা ঐতিহাসিক পরিবেষ ধারণায় কিম্বা 'আব হাওয়ার' সৃজন বিষয়ে পটুতা না দেখাইলেও এ সমস্ত নাটকের মধ্যে অনেক সজীব চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। স্থায়ী ভাবের সমাধান বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রের কণ্ঠ সর্ব্বত্র বিস্তারী, সুস্থির কিংবা গভীর না হইলেও, এবং স্থানে স্থানে গ্লানিকর চাঞ্চল্য দেখাইলেও, উহা স্ফুট-সমুজ্জ্বল রস-বর্ণনার ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যে দীর্ঘকাল অনতিক্রান্ত থাকিবে। এই কবির দার্শনিকতা ভাবুকতা, কিংবা প্রসাধনের নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও, মনে হয়, জীবনের পরিব্যাপ্ত বস্তুধারণায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সমস্ত বঙ্গীয় লেখককেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুলির মধ্যে

অনেকগুলি পরম্পরিত সংস্করণ মাত্র হইলেও, উহাদের ব্যক্তি-সংখ্যা কম নহে। * * * প্রমীলা কিংবা শচী চরিত্রের সমুন্নত কাব্যধ্বনি, শৈলজার ভাবোন্মত্ত মনস্বিতা কিংবা চিত্রাঙ্গদা বিনোদিনীর ভাবুকতা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নাই ; ভ্রমর গোবিন্দলালের দাম্পত্য-সম্বন্ধের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম অদৃষ্ট ধারণাও নাই , মনুষ্য জীবনের সূক্ষ্মতম সমস্যা সমূহের ধারণার বিষয়েও দ্বিজেন্দ্র হয়ত পটু নহেন। তথাপি, দ্বিজেন্দ্রের অনেকগুলি চরিত্র লৌকিকতার ক্ষেত্রেই যে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়া সহানুভূতি অর্জ্জন করিতেছে, তাহাও বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

"বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বে নাটক রচিত হয় নাই, এমন নহে। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, মতিরায় প্রমুখ যাত্রাওয়ালা-গণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রঙ্গাধ্যক্ষগণ, এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অনেকেই নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের নাটক কোনও কোনও অংশে সুখপাঠ্য হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক বা ইউরোপীয় নাটকাদির সহিত উহাদের তুলনা হইতে পারে না। প্রকৃত নাটকের আদর্শ, গতি কিংবা পরিণতি এই সমস্ত নাটকে নাই। * * *

"ইয়োরোপের অনেক বড় বড় কবি এই নাটক রচনা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বলিতে গেলে, প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরাজি স্পেনীয় ভাষাই প্রকৃত নাট্যশিল্পের গৌরব করিতে পারে। আধুনিক কালের সুইডেন, নরোয়ে, জর্ম্মণী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে সামাজিক-সমস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক নাটককে এক স্বতন্ত্র পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিস্তারিত চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু, উহা এখনো কাব্য-শিল্পের বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ। প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি আমাদের

দুর্গা প্রতিমার মত, সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য—সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ! এত জাঁকজমক, এত বর্ণনার পরিপাট্য সাহিত্যে অল্প নাটকেই আছে, কিন্তু সেই অপরিহার্য্য এবং অন্তরতম পদার্থ-টির অভাবে যেন সমস্ত বিফল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত আমাদের প্রকৃত সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে! সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত; এবং সঙ্গীত-ভাবাক্রান্ত বাক্য বিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল! বাঙ্গালার অন্য সমস্ত নাট্য-কাব্য সৌন্দর্য্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। পরন্তু, উহাদের মধ্যেও উক্ত সমস্ত দোষ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

* * * * *

"আমাদের রঙ্গালয়গুলি নৃত্যগীত ও আমোদ বিলাসের গৃহ। সে স্থানে অভিনয় উদ্দেশ্যে প্রস্তুত নাটকগুলিও সুতরাং সাহিত্য হইতে দূরগত এবং বিকৃত রুচির পরিচায়ক। উহাদের মধ্যে ভাষার সৌন্দর্য্য, গঠনের কারুকার্য্য বা জীবিত চরিত্রের সমাবেশ, কিছুই অবারিত নহে। দেশের সাধারণ লোকও যেন 'পুতুলের নাচ' দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে; জীবিত মনুষ্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না; তাহারা সত্য কিংবা সৌন্দর্য্যের বস্তু অপেক্ষা সুর বেশী ভালবাসে; সহজ এবং স্বভাবানুগত দেহলীলার পরিবর্ত্তে কষ্টশিক্ষিত অঙ্গবিভ্রম ভালবাসে; হৃদয়ে অনুভব না করিয়াই 'বাহবা' দিবার জন্য লালায়িত হয়। তাই, আমাদের নাটকও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। সামাজিক মণ্ডলীর পরিব্যাপ্ত ভাবে অভ্যুন্নতি ব্যতীত, সাধারণ অভিনেয় নাটকের উন্নতি কদাপি সম্ভব হয় না। ফলতঃ এ ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে বঙ্গীয় নাটককে অনেক দিকে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালার লোকশিক্ষকগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।"

উক্ত মন্তব্যের অনেক কথাই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গালার সকল নাটকই যে প্রকৃত নাটক নামের অযোগ্য একথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি; এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শশাঙ্কমোহন বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাও অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লিখিয়াছেন "দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য নাটকগুলি অভিনেয় আকারে উপন্যাস বা কথা ব্যতিরিক্ত যেন আর কিছুই হইতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালও যেন উন্নত সাহিত্যকে উদ্দেশ্য না করিয়া অথবা লোকানুবৃত্তিই সাহিত্যের একান্ত কার্য্য মনে করিয়াই চলিতেছিলেন।" (বঙ্গবাণী ১০৩ পৃঃ) দ্বিজেন্দ্র উপন্যাস লিখেন নাই— নাটকই লিখিয়াছেন এবং নাট্যসাহিত্যের সর্ব্বোত্তম আদর্শ মানসচক্ষে রাখিয়াই তিনি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকের "action"এর সহিত উপন্যাসের ঘটনা-সন্নিবেশে ও বাক্যবিন্যাসে কি প্রভেদ তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল বিলক্ষণ জানিতেন। শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ কি তাহা বিবৃত করিতে গিয়া শশাঙ্কমোহন বাবু লিখিয়াছেন—"বঞ্জিতার্থময় ঘটনা সন্নিবেশে নৈপুণ্য এবঞ্চ সমগ্র নাটকের একত্বনিষ্ঠ ফলশ্রুতির সমাধান বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও চমৎকারিণী বিধায়িনী প্রতিভার আবশ্যক" (বঙ্গবাণী —১৯৯ পৃঃ)—"নাটক একত্ব সম্বন্ধ এবং শিল্পীর প্রয়োগ উদ্দেশ্য যুক্ত কাব্য গ্রন্থ।" (বঙ্গবাণী ২০৪ পৃঃ) এইরূপ উৎকট ভাষার গোলক-ধাঁধায় ও ভাবের কুজ্ঝটিকায় দিক্‌ভ্রান্ত না হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অতি সহজ ভাষায় ও সুপরিস্ফুট ভাবে উচ্চাঙ্গ নাটকের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণগুলি স্বয়ংই বিস্তারিত ভাবে তদীয় "কালিদাস ও ভবভূতি" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই আলোচনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রেষ্ঠ-নাটকের অপরিহার্য্য নিয়মগুলি দ্বিজেন্দ্রের নখদর্পণে ছিল; এবং Encyclopædia Britannicaয় মনীষী অধ্যাপক Ward সাহেব

একটিমাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট। প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ, তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই, কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল-রেখায় যায় না। অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি বাধা অতিক্রম করিতেছে বা সে চেষ্টা করিতেছে এরূপ দেখান চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে সে নাটককে ইংরাজিতে Comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেইখানেই সেই নাটকের শেষ। আবার বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে; দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে; এরূপ স্থলে, ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে, তাহার সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখান হয় তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক যেমন—হ্যামলেট বা কিংলিয়র। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান। অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নয়। আদর্শ-চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্য-চরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখান হয় না। বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। নাটকের আর :কটি গুণ থাকা চাই—সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী—নাটক স্বাভাবিক হওয়া চাই। নাটককারের প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার আছে—কিন্তু উপেক্ষা করিবার অধিকার নাই। নাটকে মানুষের কুৎসিত-দিক্‌টাও দেখানর প্রয়োজন হয়—কিন্তু নাটকেও কুৎসিত ব্যাপার এরূপ করিয়া অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ

যাহাতে কুৎসিত ব্যাপারটি লোভনীয় হইয়া দাঁড়ায়। নাটকে কবিত্ব থাকা চাই। কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য বহির্জ্জগতেও আছে, অন্তর্জ্জগতেও আছে। বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরের সৌন্দর্য্যের তুলনায় স্থির অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ে ঘৃণা ভক্তিতে পরিণত হয়, অনুকম্পা হইতে প্রেম জন্মে, হিংসা হইতে কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। এই পরিবর্ত্তনশীল অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই সেক্সপীয়র জগতের আদর্শ কবি।'

নাট্যকলার উক্ত স্বনির্দ্দিষ্ট আদর্শ মনশ্চক্ষে রাখিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকাবলী রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত নিয়মাবলীর প্রয়োগকালে যদি কোনও ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে, যদি তাঁহার সৃষ্ট কোনও কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র সর্ব্বত্র তদীয় আবির্ভাবের সমাজ ও কালোচিত যথাযথ মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিয়া আধুনিক মতিগতির পরিচয় দিয়া থাকে, যদি তাঁহার নাটকে কবিকল্পনাময়ী ভাষার এবং ঔপন্যাসিক বাক্‌পটুতার কিছু বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কবি স্বেচ্ছায় বা নিজ প্রতিভা নির্দ্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়াই করিয়া গিয়াছেন। কোনও সাহিত্য-রসজ্ঞ বলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যদি নাট্যকার না হইয়া বক্তা হইতেন তাহা হইলেও তিনি যশস্বী হইতে পারিতেন। এই বক্তৃতার ঝোঁক - মতামত প্রকাশের অদম্য অনুরাগ - নাটকের নিয়ম-নিগড় ভঙ্গ করিতে সতত উন্মুখ, কবিত্বের উচ্ছ্বাস নাটকের সংহত সীমার বাঁধ উল্লঙ্ঘন করিতে অতিমাত্র ব্যগ্র. এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আমরা পদে পদে প্রত্যক্ষ করি সন্দেহ নাই, কিন্তু শশাঙ্কমোহন বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল তথাকথিত দোষগুলি গুণ বলিয়াই বর্ত্তমানে আদৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে সে আদর ক্ষুণ্ণ হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোনও কারণ

আছে বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু, ইহাই মনে হয়, যে কবি যদি কোথাও নাটকের নিয়মবন্ধন অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাহা লোকরঞ্জনের জন্য যত না হউক রঙ্গমঞ্চের পরিচালক বা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সুবিধার জন্য সেরূপ করিয়া গিয়াছেন। মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট এবং উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৺মহেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকায় উক্ত থিয়েটারের উপর কবির মমতা জন্মিয়াছিল। ঐ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে তিনি নিজে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিনয়-শক্তির সীমা ও সামর্থ্য তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। শেষাবস্থায় নাটক লিখিবার সময় দ্বিজেন্দ্র কিরূপ চরিত্রের ভূমিকা কোন্ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় উৎকৃষ্ট হইবে—চরিত্র কিরূপভাবে সৃষ্ট হইলে যোগ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভাবে রঙ্গালয়ের অসুবিধা হইতে পারে, সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতেন। এ বিষয়ে অবহিত হইবার কারণও ছিল,—তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার কোনও সাধারণ চরিত্র, অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গুণপনায় রঙ্গমঞ্চে অভাবনীয় সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; আবার হয়ত কোনও সুপরিস্ফুট চরিত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অক্ষমতায় রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দের নিকট লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হইয়াছে। 'দুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া একদিন রসময় বাবু দ্বিজেন্দ্রকে বলেন যে, ঐ নাটকের 'রাজিয়া' চরিত্রটির কোনও বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না, যেন গানগুলি গাওয়াইবার জন্যই ঐ চরিত্রটির অবতারণা। দ্বিজেন্দ্রও সেই কথায় সায় দেন। কিন্তু সেইদিনই মিনার্ভা-থিয়েটারে দুর্গাদাসের অভিনয় দেখিতে গিয়া রসময় বাবু দেখেন, যে অভিনেত্রীর (৺সুশীলার) নৈপুণ্যে সেই 'রাজিয়া' চরিত্রটি রঙ্গমঞ্চে এক অভাবনীয় সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ ঘটনার অভিজ্ঞতার ফলেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকের অভিনয়-সাফল্যের কামনায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চরিত্রের কল্পনা ও সৃজন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে যে তাঁহার নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই— তাঁহার নাট্য-প্রতিভা প্রতিহত হয় নাই একথা বলা যায় না। সেই রঙ্গমঞ্চের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিবার হেতুই বোধ হয় শেষের দুইখানি নাটক—ভীষ্ম ও সিংহল-বিজয় অযথা দীর্ঘায়তন হইয়া পড়িয়াছে—প্রথমোক্ত নাটকখানির কিয়দংশ পরিহার করিলে এবং শেষোক্ত নাটকখানির পঞ্চমাঙ্ক বাদ দিয়া চতুর্থ অঙ্ককেই চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে বিভক্ত করিয়া লইলে বোধ হয় নাটকের ক্ষতি হইত না। কিন্তু আজকাল চারিপ্রহরব্যাপী অভিনয় না দেখাইলে রঙ্গালয়ে দর্শকের অভাব হয়, সেই কারণেই হয়ত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকের পরিসর বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকরচনার পদ্ধতিতেও একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিনি প্রথমে নাটকের চরিত্রগুলি স্থির করিয়া, কোন্ চরিত্র কিরূপ ভাবে অঙ্কিত করিবেন তাহা 'ছাকিয়া' লইতেন। পরে যখন যে দৃশ্য মনে উদিত হইত তখন তাহা লিখিয়া সেই চরিত্রগুলির বিকাশ করিতেন। নাটক-রচনার প্রথম হইতে পরে পরে পর্য্যায়ক্রমে দৃশ্য লিখিতেন না। তিনি পাণ্ডুলিপি পুনঃপুনঃ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতেন এবং অনেকস্থলে নাটক ছাপিতে দিয়া প্রথম প্রুফেই রচনার উন্নতিবিধান করিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফে আর পরিবর্ত্তন করিতেন না; সেই দুইটি প্রুফ তাঁহার আত্মীয় ও সুহৃদ্ অধর বাবুকে দেখিতে দিতেন। দ্বিজেন্দ্র বলিতেন, 'অধরদা'র পোকাবাছা না হ'লে আমার প্রুফ্ দেখা মঞ্জুর হয় না।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

——:০:——

গান

গানই দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর প্রাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হাসির গানগুলি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সমাজ-সংস্কারমূলক প্রহসনগুলি রচিত হইয়াছিল এবং জাতীয় সঙ্গীত ও অপরাপর সঙ্গীতগুলিকে কাঠামো করিয়া তাঁহার দেশভক্তির ও মনুষ্যত্বের আদর্শমূলক নাটকগুলি গঠিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রের গানগুলি তাঁহার নাটকাবলীর শুধু যে ভিত্তি তাহা নহে। মনস্বী কবিবর ৺বরদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিতেন, দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গীতগুলি যেন গিরিশিখরে উৎপন্ন সমুন্নত তরুরাজির মত তাঁহার নাটকসমূহের উপর দাঁড়াইয়া সেগুলিকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া আছে।

গান লিখিতে দ্বিজেন্দ্রকে বিশেষ কোনও চেষ্টা বা আয়াস করিতে হইত না—অতি সহজেই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, সাজাহান নাটক লিখিবার সময় তিনি একটি স্থান বাদ রাখিয়া লিখিয়াছিলেন। একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্র অধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে একটা কি গান দেওয়া যায় বলুন দেখি?' অধর বাবু স্থান কাল পাত্র দেখিয়া বলিলেন—একটি রাত্রির বর্ণনা দিন না। দ্বিজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ—

'আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধুহে, নিয়ে এই হাসি রূপ গান,'

পংক্তিবিশিষ্ট সুন্দর গানটি রচনা করিয়া ঐ স্থানে বসাইয়া দিলেন। গান লিখিবার পূর্ব্বে তিনি সুরটি ঠিক করিয়া মনে মনে ভাঁজিয়া লইতেন, পরে—কথা বসাইতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। সুরে লয়ে তিনি এতই পাকা ছিলেন এবং তাঁহার বাক্য-সম্পদ্ এরূপ পর্য্যাপ্ত ছিল যে তাঁহার কোনও গানের কথা টানিয়া গায়িতে হয় না। পরিহাস-সঙ্গীতের যে প্রধান গুণের কথা বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রের সকল সঙ্গীতেই সেই গুণ বিদ্যমান—দ্বিজেন্দ্রের গানে আবিলতা নাই—প্রেম-সঙ্গীতগুলি নির্দ্দোষ—লালসা জাগরিত করে না, এবং নাচের গানগুলির অধিকাংশই স্বভাববর্ণনা-বিষয়ক। দ্বিজেন্দ্রের প্রেম-সঙ্গীতগুলি এরূপ নির্ম্মল যে দ্বিজেন্দ্রের কোনও ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু সেগুলিকে Hymn স্তোত্র আখ্যা দিয়াছিলেন। হাসির গানগুলির সুর ভাষা ও রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছি যে সেগুলি সমস্তই তাঁহার নিজস্ব, তাঁহার মহাসঙ্গীতগুলির সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। দ্বিজেন্দ্র দেশীয় ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব মহাসঙ্গীতগুলিতেও একটি নিজস্ব ছাপ দিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রের মহাসঙ্গীতগুলির মধ্যে 'আমার দেশ,' 'আমার জন্মভূমি', 'ভারতবর্ষ', 'আমার ভাষা', 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' প্রভৃতি কয়েকটি গান সর্ব্বজনবিদিত। 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' সঙ্গীতদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' মহাসঙ্গীতের সহিত জাতীয় সঙ্গীতের শীর্ষস্থান পাইয়াছে। 'আমার জন্মভূমি' গীতটি সাজাহান নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু 'আমার দেশ' সঙ্গীতটি তাঁহার কোনও গ্রন্থে স্থান পায় নাই। 'ভারতবর্ষ' সঙ্গীতটি কবির মৃত্যুর পর প্রথমে 'ভারতবর্ষ পত্রে'র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় (১৩২০, আষাঢ়), পরে 'সিংহল বিজয়' নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গীতটি দ্বিজেন্দ্রের শোকসভায় কলিকাতা টাউন হলে, ইভনিং ক্লাবের সভ্যগণ

কর্ত্তৃক গীত হয়। 'আমার ভাষা' গীতটি, ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবমন্দিরে প্রবেশ উপলক্ষে গায়িবার জন্য দ্বিজেন্দ্র ঘটিকা কালের মধ্যে রচনা করিয়া উক্ত দিবসে পরিষৎ ভবনে ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণের সহযোগে স্বয়ং গান করেন। সেই সভাস্থলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যনায়কবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গা-স্তোত্রটি দ্বিজেন্দ্রের 'ভীষ্ম' নাটকে স্থান পাইয়াছে।

কবির মৃত্যুর দুই বর্ষ পরে, ১৩২২ সালের আশ্বিন মাসে, দ্বিজেন্দ্রের 'হাসির গানে' ও 'আর্য্যগাথায়' প্রকাশিত গীতগুলি ও 'আমার দেশ' গীতটি ব্যতীত অপর প্রায় সমস্ত গীত সংগ্রহ করিয়া 'গান' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে অপ্রকাশিত যে কয়টি মহাসঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'সাধের বীণা', 'ভারত আমার', ও 'বঙ্গভাষা' সঙ্গীতত্রয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সাধের বীণা' গীতটি কবির পরলোকগমনের পরে প্রকাশিত 'সিংহলবিজয়' নাটকে স্থান পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র Moore এর Irish Melodies পাঠ করিতে ভালবাসিতেন এবং সেই কবিতাগুলির মধ্যে "My Harp" কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল—তিনি সেই কবিতাটি বন্ধুবর্গকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সম্ভবতঃ সেই কবিতাটিকে আদর্শ করিয়া দ্বিজেন্দ্র 'সাধের বীণা' গীতটি রচনা করেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্র তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন—তাঁহার 'সাধের বীণা' গীতটি যে মুরের My Harp হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে তাহা পাঠক উক্ত গীত দুইটি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

'ভারতবর্ষ' মহাসঙ্গীতের প্রারম্ভের ভাবটি—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!" ইত্যাদি, দ্বিজেন্দ্র তাঁহার যৌবনকালে "আর্য্যগাথা—২য় ভাগে" অনূদিত Rule Britannia নামক বিখ্যাত ইংরাজি সঙ্গীতের—

"যখন নীলিমাজলধি হৃদয়ে, উঠিল নূতন ঈশ্বর আদেশে"—ইত্যাদি কল্পনা হইতে গ্রহণ করেন। যৌবনের অনুবাদে তিনি তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়েন নাই। শেষ জীবনে ইংরাজি ভাবের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজস্ব কল্পনার পূর্ণবিকাশে তিনি এই "ভারতবর্ষ" মহাসঙ্গীতটি রচনা করিয়া আপনার কবিপ্রতিভাকে ধন্য করিয়াগিয়াছেন।

এইবার দ্বিজেন্দ্রের 'আমার দেশ' মহাসঙ্গীতটির একটু ইতিহাস দিব। গয়ায় অবস্থান কালে একবার বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের অতিথি হয়েন। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্র 'মেবার পাহাড়' গীতটি গায়িয়া জগদীশচন্দ্রকে প্রীত করেন। সেই গীতটি শুনিয়া জগদীশ বাবু বলেন "আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তা'হলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা—বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।" (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৩১-১-১৫) সেই কথা শুনিয়াই দ্বিজেন্দ্রের মনে একটি মাতৃবন্দনা রচনা করিবার কল্পনা উদিত হয়। তাহার ফলেই 'আমার দেশ' সঙ্গীতের সৃষ্টি।

এই মহাসঙ্গীতের রচনা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"একবার পূজার অবকাশে আমি গয়ায় গিয়া কয়েক দিন আমার নমস্য প্রাণপ্রিয় সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্র তৎকালে গয়ায় অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে ছিলেন * * একদিন দুপুরবেলা আহারান্তে বসিয়া আছি, কবিবর বলিলেন 'দেখ—আমার মাথায় একটা গানের কতকগুলো লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে, তুমি একটু বোসো, আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।' অৰ্দ্ধঘণ্টা বা তাহারও কিছু অধিককাল একাকী

বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল দূর হইতে করতালি দিতে দিতে গায়িতে গায়িতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং আমাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া কহিলেন—'উঃ কি চমৎকার গানই লিখেছি। শুনবে? শুনবে নাকি? আচ্ছা তবে শোন'—এই বলিয়া গায়িয়া উঠিলেন—"বঙ্গ আমার, জননী আমার" ইত্যাদি—গানটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, তখন বলিতে লজ্জা হয় পাষণ্ড আমি, আমারও চক্ষে জল আসিয়াছিল। আমি নীরবে নতশিরে একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্ধুবর বলিলেন 'কি? কেমন লাগল?' আমি বলিলাম—'ধন্য আপনি!' বাল্যস্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার শুধু আমার মুখের দিকে হাসিয়া চাহিলেন, পরে আর কিছু না কহিয়া, হাতে তাল দিতে দিতে নাচিয়া নাচিয়া গায়িলেন—"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য" ইত্যাদি—সে রাত্রে যথারীতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে আসিয়া এই অগ্নিগর্ভ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উৎসাহে, গর্ব্বে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও ভক্তির প্রাবল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় তৎকালে গয়ায় জজ ছিলেন, প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুবৎসল পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে আসিতেন এবং সাহিত্যিক বিতর্ক বিচারে রাত্রি প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত যাপন করিতেন। "আমার দেশ" গানটি শুনিয়া লোকেন্দ্রনাথের যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" (সাহিত্য, ১৩২০)

এই মাতৃস্তোত্রটি রচিত হইবার পর ইহার দুই একটি অংশ পরিবর্ত্তন করা হয়। এই গীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সহিত নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামের একটি ভ্রম ছিল, কলিকাতায় আসিলে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরামর্শে দ্বিজেন্দ্র সেই ভ্রমটি সংশোধন করিয়া "ন্যায়ের বিধান

দিল রঘুমণি" এই বাক্যটি যোগ করেন এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরামর্শে ভারতবাসীর সামুদ্রিক বাণিজ্যবিস্তার সম্বন্ধে "একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়" পংক্তিবিশিষ্ট শ্লোকটি ঐ গীতে যোজনা করেন।

কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্র এই গীতটি প্রথমে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট গান করিয়া শুনান, পরে প্রকাশ্য ভাবে এই গীতটি, জননায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারামুক্তির পর পান্তির মাঠের অভ্যর্থনা-সভায় ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক, এবং সারকুলার রোডের মিলন-মন্দিরের মাঠের সভায়, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রাজ পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়। তৎপরে বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে এবং তাহার পর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতাস্থ ভবনে পূর্ণিমা-মিলন উপলক্ষে সাহিত্যিকগণের সমক্ষে উহা গান করা হয়।

নুরজাহান নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীর পর, দ্বিজেন্দ্রের সাধ হয় যে নুরজাহান নাটকে যে দৃশ্যে নুরজাহান বঙ্গদেশে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে 'আমার দেশ' গীতটি ড্রামের বাদ্যধ্বনি সহযোগে গান করাইবেন। দ্বিজেন্দ্রের সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এই গানটির অল্পকালের মধ্যে বহুল প্রচার হয় এবং বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে গীত হইয়া বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ স্তোত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতের সহিত মাতৃভক্ত-হৃদয়ে একাসন অধিকার করে। এবং এই স্তোত্রের ও "আমার জন্মভূমি" সঙ্গীতের রচয়িতা বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ-প্রেমিক মহাকবি বলিয়া অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোক গমনের পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অনুষ্ঠিত

শোক-সভায় দেশপূজ্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন —"দ্বিজেন্দ্রের রচনার সমালোচনার সময় এই নয়। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে তাঁহার রচিত "আমার জন্মভূমি", "আমার দেশ" "আমার ভাষা" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি তাঁহার বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেমিকতার পরিচয় দেয় এবং চিরকাল বাঙ্গালী জাতির কণ্ঠে গীত হইবে।" (সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩২০, ২য়, সংখ্যা)

বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল উক্ত শোক-সভায় বলিয়াছিলেন "ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ইহা একটি মহান্ সঙ্গীত। কবির এই সঙ্গীতে বিশ্বের ধ্যান আছে। ইহা কেবল মাত্র এই বঙ্গদেশকে লইয়া রচিত নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া কেবল আমি মুগ্ধ হই না, তুমি মুগ্ধ হও না, আমি যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী হইয়া না জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও এই সঙ্গীত আমার ভাবের সাগরে ঢেউ তুলিত। এই গানকে ইংরাজীতে অনুবাদ কর, ইংরাজ তাহাতে ভুলিবে, আমাদের দেশমাতাকে পরের মা বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এই গানকে রুষিয়ার ভাষায় তর্জ্জমা কর, যদি তাহা এমনি সুন্দর ভাষায় যথার্থরূপ অনুবাদিত হয়, তাহা হইলে রুষিয়ানেরাও এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বিগলিতপ্রাণে যোগদান করিবে। কবির কাব্যের এমনি শক্তি—তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতা এমনি অপূর্ব্ব। * * * "আমার দেশে" কবি দেশমাতৃকায় এক ভাস্বর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরং" মন্ত্রে দেশ ভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশে" তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে।" (অর্ঘ্য, শ্রাবণ, ১৩২০)

উক্ত "আমার দেশ" মহাসঙ্গীতটি যেমন দ্বিজেন্দ্রের অক্ষয় খ্যাতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, তেমনি আবার এই সঙ্গীতটি তাঁহার সাংঘাতিক ব্যাধির আগমন সূচিত করে বলিয়া তাঁহার মৃত্যু-স্মৃতির সহিত বিজড়িত

হইয়া আছে। এই গীতটি গায়িতে গায়িতে একদিন স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে দ্বিজেন্দ্রের মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়, আর একদিন ইভ্নিং ক্লবে এই গানটি শিক্ষা দিবার সময়, পরে পুনরায় একদিন ঝামাপুকুরে তদীয় মিত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবনে ঐ গানটি গায়িতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রের মস্তকে শোণিতাধিক্য হয় এবং প্রতিবারই তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাই দ্বিজেন্দ্রের প্রাণান্তকারী সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত। দ্বিজেন্দ্রের সাংঘাতিক পীড়ার কারণ যাহাই হউক, এই সঙ্গীতের উদ্দীপনাই যে তাঁহার সেই পীড়ার আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ব ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবকুমার বাবু লিখিয়াছেন "নেতৃগণের অদূরদর্শিতার ফলে স্বদেশী আন্দোলনটা যখন মন্দীভূত ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আর "আমার দেশ" গানটি মোটেই * * * গাহিতে চাহিতেন না দেখিয়া একদিন কোনও বন্ধু ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ ভয়ে আর তিনি উহা পারত পক্ষে গাহিতে রাজী হন না। * * * এ বিদ্রূপটা কবির অন্তরে বাজিয়াছিল, তাই তিনি বিশেষ বিরক্তির সঙ্গেই * * বলিলেন "না হে না; তা নয়!—ও গানটা গায়িতে গেলে আমার কেন জানি না, ভয়ানক মাথা গরম হয়ে উঠে। * * *" (নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২৩)

ঐ গানটি না গায়িবার আর একটি কারণও ছিল। হাইকোর্টে একটি 'স্বদেশী' মকর্দ্দমার সময় কোনও ব্যারিষ্টার এই গীতের "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" পংক্তিটি Longfellowর "Be not like dumb, driven cattle" পংক্তির অনুকরণ বলিয়া স্বীয় গবেষণার পরিচয় দেন এবং বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ বিচারপতি মহাশয়ও সেই কথা সত্য ভাবিয়া রহস্য করেন "তা হলে বাঙ্গালী কবি খুব মৌলিক ত!" সেই কথা শুনিয়া

দ্বিজেন্দ্র আক্ষেপ করেন যে সরকার বাহাদুরকে ঐ গীতটির প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেয় এমন কি কেহ নাই? (দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ অধর বাবু বলেন, পরে ঐ গীতের সরকারী ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্র সেই অনুবাদের মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করেন)। দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী বর্জ্জনের ও বিজাতিবিদ্বেষের আন্তরিক বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সেই মাতৃস্তোত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া তাঁহার দেশ-ভ্রাতৃগণও অনর্থ ঘটাইতেছেন। তাই তিনি তাঁহাদিগের সেই ভ্রম অপনোদন করিবার জন্যই যেন—"আমার দেশ" সঙ্গীতের টীকাস্বরূপ "আবার তোরা মানুষ হ" সঙ্গীতটি রচনা করিলেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন "শত্রু মিত্র জ্ঞান ভুলে গিয়ে, বিদ্বেষ বর্জ্জন করে" মনুষত্ব লাভ কর,—"তার পরে আর তাদের নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না, ঈশ্বরের কোনও অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে।" (মেবারপতন)।

মৃজাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন্ লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় মনস্বী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় জনৈক পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, আমরা যতই অযোগ্য হই, যতই অক্ষম হই, যতই দুর্ব্বল হই, আমরাই মায়ের দৈন্য দূর করব ইহা দ্বিজেন্দ্রের শেষ কথা নহে—"দ্বিজেন্দ্রলালের অসংখ্য গান উচ্চহাস্যে এ মতের প্রতিবাদ করছে। তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তা হ'লে তার জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল হতে হবে। আমার বিশ্বাস তাঁর দেশপ্রীতির চরম বাণী এই যে 'আবার তোরা মানুষ হ'।" (সবুজপত্র, আষাঢ়, ১৩২৩)

পূজনীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের

সঙ্গীতের প্রসঙ্গে কথা হইলে তিনি এই মর্ম্মে বলেন—'দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার জন্মভূমি' ও 'আমার দেশ' এই দুইটি গীতের মধ্যে, আমার মনে হয়, প্রথমোক্ত গীতটিই ভাল। মাতৃভূমিকে মা বলিয়া ডাকিবার সময় মন হইতে ক্ষোভ, অভিমান, রোষ, বিদ্বেষ, শ্লেষ, ব্যঙ্গ সমস্ত বিদায় দিয়া কেবল স্নেহপ্রীতিভক্তিমাখা মধুর কথাতেই তাঁহাকে আহ্বান করিতে হয় —সে মধুর রসে অন্য রস মিশাইতে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি" গীতটি সেই পবিত্র, বিমল, মধুর রসেই পরিপূর্ণ, কিন্তু 'আমার দেশ' গীতটির সম্বন্ধে ঠিক সেকথা বলা যায় না—উহাতে অন্য রসের মিশ্রণ আছে এবং সে রস মাতৃপূজাত্মক সঙ্গীতে না থাকাই ভাল।'

কবিবর ৺ বরদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিতেন এদেশে যে গানের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে গান কখনও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। (জননায়ক পাঁচকড়ি বাবুর ভাষায় 'সে যেন টবের গাছ, মাটিতে তার শিকড় নামে না।)' বরদা বাবু বলিতেন, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমাত্মক সঙ্গীতে সেই ধর্ম্মের ভিত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার গঙ্গাস্তোত্রটিতে সেই ধর্ম্মভাবের বিকাশ আছে; দ্বিজেন্দ্রের গঙ্গাস্তোত্রটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। বরদা বাবু ঐ গঙ্গাস্তোত্রটি শুনিতে এতই ভালবাসিতেন যে তিনি এক দিন নিজ বাটীতে হার্ম্মোনিয়ম আদির আয়োজন করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে দ্বিজেন্দ্রের কণ্ঠে সেই গানটি শুনাইয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের নিজস্বভঙ্গী এবং তাঁহার সুরের নবীনত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভা যেমন বাঙ্গালা কবিতায় এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গীত-প্রতিভাও তেমনি বাঙ্গালায় দেশপ্রেমাত্মক জাতীয় সঙ্গীতে নব উন্মাদনা দিয়াছে, মাতৃস্তোত্র গাহিবার উপযোগী সুরের অভাব বিদূরিত করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র ভারতীয় সুরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভঙ্গী যোজনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয় দেশের সঙ্গীতের পার্থক্য বুঝিতেন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যায় যেমন আবাল্য পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ইংরাজী সঙ্গীতও রীতিমত শিক্ষা করেন। সেই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি উভয় দেশের সঙ্গীতের পার্থক্য এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন— "ইংরাজি গানে একটা সংযমের ভাব আছে, যাহা হিন্দুগানে নাই, ইংরাজি গান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর, হিন্দুগান আনন্দাধিক্য হেতু পীড়া-জনক। একটি উন্মীলনোন্মুখ অপরটি অর্দ্ধনিমীলিত। একটি জাগরণ অপরটি তন্দ্রা ; একটি আনন্দ অপরটি ভোগ ; একটি দিবা অপরটি সন্ধ্যা, একটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীন গতি, স্বাবলম্বা, বিংশতি বর্ষীয়া সুকুমারী ইংরাজমহিলা ; অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গণে শশঙ্কগতি গৃহ-প্রবেশোদ্যতা ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ ; একটি যেন প্রভাতের আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল। একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্য্যমুখী, অপরটি যেন সভয়া বিনতনয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য অপরটি বিলাপ।" দ্বিজেন্দ্র তাঁহার সঙ্গীতে সেই উভয়ের মিলন ঘটাইয়াছিলেন। ফলে আমরা জাতীয় সঙ্গীত—মাতৃ-বন্দনা গায়িবার উপযোগী উন্মাদনাময় সুর পাইয়াছি। ভারতীয় ধর্ম্মও যেমন নিবৃত্তির দিকে লইয়া যায়— ভারতীয় সঙ্গীতও তেমনি প্রবৃত্তির দিকে উত্তেজিত করে না ; ভারতবাসী এক্ষণে প্রতীচ্য হইতে কর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে—প্রতীচ্যের দৃষ্টান্তে দেশমাতৃকার পূজা করিতে শিখিয়াছে—দ্বিজেন্দ্র সেই পূজার মন্ত্র পাঠ করিবার উপযোগী প্রতীচ্য সুর ভারতীয় সুরের সঙ্গে মিলাইয়া হরিহর আত্মা করিয়া, স্বীয় সঙ্গীত-প্রতিভাবলে স্বজাতির নিজস্ব করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুর পর টাউনহলের স্মৃতিসভার সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বলেন—"আমি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভাল করিয়াই চিনিতাম ও জানিতাম। পূর্ব্বে প্রায়ই কৃষ্ণনগরে যাইয়া দীর্ঘ অবকাশ যাপন করিতাম। সেই সময়ে বন্ধুবর রাজেন্দ্রলালের মুখে অনেক খবর শুনিতাম ও জানিতাম। দ্বিজেন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর যখন হাসির গানের গায়করূপে সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে অনেকবার অনেক গান শুনিয়াছি। তিনি সুগায়ক বলিলে অধিক কিছু বলা হইল না। দ্বিজেন্দ্র তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা ভাব ফুটাইতে পারিতেন, তাঁহার সুরের যেন একটা স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। সে কালের বড় বড় কীর্ত্তনীয়া যেমন কীর্ত্তনের সুরে রসোদ্গার করিতে পারিতেন, একটা ভাবের অবতারণা ঘটাইতেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি কণ্ঠস্বরের প্রভাবে গীতটিকে সজীব করিয়া তুলিতে পারিতেন। * * * তিনি কবিতা লিখিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিতেন না, সুরের মহাপ্রাণ নির্দ্দেশ করিয়া তদনুসারে এক একটি গীত রচনা করিতেন। যে ভাবের অভিব্যঞ্জনার জন্য তিনি মনোমত বাঙ্গালা সুর পাইতেন না, তাহার বিকাশ হেতু ইংরেজী সুর আমদানী করিতেন। এমন ভাবে আমদানী করিতেন যে, সে বিলাতী সুর আমাদের কাণে বাজিত না।" (সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩২০)

দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ বুঝিতেন যে সঙ্গীতের সুরই তাহার প্রাণ, কথাগুলি বহিরবয়ব মাত্র। প্রকৃত গান সুরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কথাগুলি প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত হয়—সেই জন্যই তিনি কবিতা লিখিয়া তাহাতে সুর যোজনা করিতেন না—সুর ঠিক করিয়া সেই সুরের অনুযায়ী কথা বসাইতেন, এমন কি তাঁহার 'আর্য্যগাথা-২য় ভাগ' পুস্তকে তিনি গীতগুলি কবিতার মত ছন্দে গ্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার

কৈফিয়ৎ দিয়া লিখিয়াছিলেন—"আর্য্যগাথার সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ সুরে গেয়। সঙ্গীত—স্বরে, কবিতা—ভাষায় একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আমরা গায়িবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি, প্রতি পাঠকের নিকট গায়িয়া বেড়াইতে পারিতাম তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য্য, অসৌন্দর্য্য স্বরের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।"

ইহাতে বুঝা যায় যে সঙ্গীতের সুরকেই তিনি প্রধান বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং সাধারণ্যে তাঁহার সঙ্গীতের যে আদর হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুরের নূতন ঢং—এই বিশেষত্বটির জন্য তাঁহার সঙ্গীত স্মরণীয় ও বরণীয়। অতএব যদি কেহ বলেন দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরগুলি প্রচলিত ঢংএ বদল করিয়া দেওয়া হউক তাহা হইলে সে প্রস্তাব যে সাধারণের অতিমাত্র বিস্ময় উৎপাদিত করিবে ইহার আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু এরূপ প্রস্তাবও হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনে টাউন্-হলের বিরাট্ অধিবেশনে বলিয়াছিলেন :—

"মানবের কণ্ঠসঙ্গীত বিজ্ঞান অনুসারে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত। আরবের মরছিয়া, পারস্যের গজল্ এবং ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের সমগ্র সাধু সঙ্গীত মীড় মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ। যুরোপের সঙ্গীতে মীড় মূর্চ্ছনা নাই, এমন নয়; আছে, অল্প আছে;—সেই সঙ্গীত প্রধানতঃ খাড়া সুরে গড়া। ভারতবর্ষ মীড় মূর্চ্ছনার দেশ। বাঙ্গালা আবার ভারতের ভারত—বাঙ্গালীর কীর্ত্তনের সুর কেবল মীড়মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ।

* * * আমার বর্ত্তমান দুঃখ—নব্যযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরে সঙ্গীত-চর্চ্চা দেখিয়া। * * * যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। যখন পাঁচজন যুবক একসঙ্গে বসিয়া ঐ খাড়া সুরে গান করিতে থাকেন, তখন আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। আমি ভাবি এই ভাবে যদি আমাদের উন্নতি হইতে থাকে, তবে আমাদের অবনতি আবার কিরূপে হইবে? দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক সুরের বিকৃতি সাধনের কথা আমি বৈঠকী-সভায় চট্টগ্রামে তুলিয়াছিলাম, কাহারও মনে ছাপ লাগাইতে পারি নাই, এবারে একেবারে সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম।

"আমার কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেমিক হইলে, তিনি খাড়া সুর বাঙ্গালায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অতি সুমিষ্ট গায়ক ছিলেন, খেয়াল, ধ্রুপদ ব্রহ্মসঙ্গীত, টপ্পা তিনি অতি মিষ্টসুরে নিপুণভাবে গায়িতেন; জানি না, কার কেমন দুর্ভাগ্য কিরূপে হয়, এ হেন পিতৃসমীপে বসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কি দশ দিনও সঙ্গীত চর্চ্চা করেন নাই? দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য আরও ঘোরতর, কেন না, গানগুলির বাঁধুনিতে সুন্দর নিপুণতা আছে। এখন সঙ্গীতজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করি,—ঐ গানগুলিতে আমরা খেয়ালের সুর বসাইতে পারি না?"

আমাদের মনে হয় নমস্য সরকার মহাশয় যখন উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তখন তাঁহার জানা ছিল না যে দ্বিজেন্দ্র একজন সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন—তিনি শাস্ত্রসঙ্গত সুরে বিশুদ্ধভাবে গীত গায়িতে পারিতেন—তিনি 'তালকাণা' ছিলেন না—তাঁহার যৌবনকালে রচিত সমস্ত গীতই নিভাঁজ দেশীয় রাগ রাগিণীতে গেয়, তিনি শেষ বয়সেও 'মীড়মূর্চ্ছনা' পূর্ণ কীর্ত্তনাঙ্গ বিশুদ্ধভাবে গায়িয়া সমজদারদের মুগ্ধ করিতেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সঙ্গীতগুলিতে খাঁটি দেশীয় ঢংএর সুর বসাইতে

পারিতেন—এমন কি 'Psalm of Life' ইংরাজী কবিতাটি তিনি কীর্ত্তনাঙ্গে 'আখর' দিয়া গায়িয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজের গীতে যে 'খেয়ালের' সুর বসাইতে পারিতেন তাহার আর বিচিত্রতা কি?—এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় গুণী ও গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সঙ্গীতকলার বিশেষজ্ঞ ভাবে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"যাঁর সুরজ্ঞান নেই তাঁর পক্ষে গান রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুর বাদ দিয়ে গানের কথায় যা অবশিষ্ট থাকে তা অনেক স্থলে না থাকারই সামিল। অতএব, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে সরকার মহাশয়ের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এ কবির রচনার কোনই মূল্য নেই, কোনই মর্য্যাদা নেই ; এবং কবি হিসেবে তিনি শুধু উপেক্ষার কেন, অবজ্ঞারও পাত্র। * * *

"কবিতার প্রাণ যদি ধ্বনির উপর নির্ভর করে তাহলে গানের প্রাণ যে সম্পূর্ণ সুরের উপর নির্ভর করবে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত হতে পারে না। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুর যদি গুণিসমাজে অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হয়, তাহলে তাঁর গানও বাঙ্গালীর নিকট অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হত। * * * কাউকে সা রি গ ম (খাড়া সুর) সাধ্‌তে শুনলে, সরকার মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, অথচ ধৈর্য্যধরে সা রি গ ম অভ্যেস না করলে কি করে ও-বিদ্যা যে আয়ত্ত করা যায় সে কথা তিনি বলে দেন নি। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে হিন্দু সঙ্গীতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাঁর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অধিকার ছিল তাহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। সঙ্গীত তাঁর কুলবিদ্যা এবং সে বিদ্যা তাঁকে কায়ক্লেশে আয়ত্ত করতে হয়নি, কেন না ভগবান্ তাঁকে গানের গলা এবং সুরের কান দিয়েছিলেন।

"৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের হাস্যরস কতটা তার কথার আর কতটা তার সুরের উপর নির্ভর করে বলা কঠিন। সুতরাং সুর থেকে বিশ্লিষ্ট করে' তাঁর কথার এবং কথা থেকে বিশ্লিষ্ট করে' তাঁর সুরের মূল্য নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। তবে যখন একজন খ্যাত-নামা সমালোচক তাঁর সুরের উপর আক্রমণ করেছেন, তখন সে সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

"আপনারা সকলেই জানেন যে, সঙ্গীতে কোন বিশেষ রস ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'লে, সেই রসের অনুরূপ সুরের আবশ্যক। করুণ রসের প্রকাশের জন্য সুরও করুণ হওয়া চাই—এবং বীররসের প্রকাশের জন্য সুরও রুদ্র হওয়া চাই। কিন্তু এ বিষয়ে হাস্যরসের একটু বিশেষত্ব আছে। অনুরূপ কি বিরূপ, সকল রূপ সুরেই গুণী ব্যক্তির হাতে হাস্যরস সমান ফুটে ওঠে। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে সুর সম্বন্ধে যে এই উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন, তা' দুচারটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। সুরের এবং কথার স্পষ্ট এবং ঘোর অসাম-ঞ্জস্য যে সহজেই হাসির উদ্রেক করে, তার প্রমাণ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের—"এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল", "বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্‌" "পুরাকালে ছিল শুনি, দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি", "নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ" প্রভৃতি গান। এ সকল গানের কথা যেমন হাল্‌কা—সুরও তেমনি ভারি। হিন্দু সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর উপর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কতটা অধিকার ছিল, এই সকল গানের সুরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সকল সুর যে খাঁটি দরবারি শুধু তাই নয়, ঢংও খাঁটি কালোয়াতি। "এক যে ছিল শেয়াল"—হচ্ছে পূরবীর মামুলি খেয়াল। "বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্‌"—কানাড়া ও মল্লারের মিশ্রণে যে সুর হয়

তাই—অর্থাৎ মেঘমল্লার। "পুরাকালে ছিল শুনি, দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি"—দরবারি কানাড়া। এবং "নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ"—বিশুদ্ধ পরজ।

"এ সকল সুর অবলীলাক্রমে গাওয়ার ভিতর যে কত শিক্ষা এবং কত সাধনা আছে, তা' যিনি সঙ্গীতের স্বল্প চর্চ্চা করেছেন তিনিই জানেন। এবং ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুমাত্রেই জানেন যে, তিনি তাঁর স্বরচিত এই গানগুলি কতদূর নির্ভুল তালে মানে লয়ে সুরে গাইতেন। * * *

"৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁর সকল গানেই ওস্তাদি সুর দেন নি, তার কারণ তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, হাস্যরসের অনুরূপ সুরের সৃষ্টি কর্‌তে হ'লে আমাদের তৈরি রাগ রাগিণীকে একটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে নূতন করে' গড়ে' নেওয়া আবশ্যক। তিনি তাই প্রচলিত সুরের পরিচিত আকার পরিবর্ত্তন করে' তার নূতন আকার দিয়েছেন, তার বিকার সাধন করেন নি।

"বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন নভাই"—এই গানটিতে কথার অনুরূপ সুরেরও আগাগোড়া একটা বেপরোয়া ভাব আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ গানটি শুন্‌লে স্বয়ং তানসেনও মুখ ভার করা দূরে থাক্ হাস্য সম্বরণ কর্‌তে পারতেন না। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত এ ধরণের সুরের আর কোন উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—কেন না তাঁর অধিকাংশ গান এই ধরণের।

"সম্ভবতঃ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্ভাবিত এই নূতন ঢঙের প্রতিই সরকার মহাশয় তাঁর সকল আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। এ ঢং যদি কারও ভাল না লাগে—তাহলে তাঁর কথার কোন উত্তর দেওয়া চলে না। তবে যদি কেউ বলেন যে, এ ঢং বিশ্রী বা বিকৃত—তাহলেই তর্ক উপস্থিত হয়।

"৺দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে' হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নি—কেননা ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয়

সঙ্গীতের একমাত্র ঢং নয়! দেশভেদে যুগভেদে এদেশে নানা ঢঙের উৎপত্তি হয়েছে। যাঁদের সঙ্গীতের দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রীতির সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে দক্ষিণী ঢং এবং হিন্দুস্থানী ঢং এত বিভিন্ন যে দুই একজাতীয় সঙ্গীত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। অথচ এ দুই যে মূলতঃ এক জাতীয়, বিশেষজ্ঞ মাত্রেই তা জানেন। তারপর এই হিন্দুস্থানী গানেরও প্রদেশভেদে সুরের চেহারা বদ্‌লে যায়। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে বিষ্ণুপুরে একটি নূতন ঢঙের সৃষ্টি হয়েছে—যা দেশে বিদেশে বিষ্ণুপুরি ঢং বলে' পরিচিত। এ সকল ঢঙে অবশ্য সনাতন সুরতাল রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীর যা সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু কীর্ত্তন—তাতে রাগরাগিণীকে এতটা রূপান্তরিত করা হয়েছে যে, সে গান শুনে অনেক ওস্তাদে কানে হাত দেন। কিন্তু ওস্তাদেরা স্বীকার না কর্‌লেও আমরা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে বাঙ্গলার কীর্ত্তন হিন্দুসঙ্গীত। সুতরাং ৺দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের রাগরাগিণীর উপর হস্তক্ষেপ করায় তাঁর অহিন্দুত্বের পরিচয় দেন নি—পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁর বাঙ্গালীত্বের।

"৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজে একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে। আমার মতে সঙ্গীত সম্বন্ধে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁর প্রতিভার বলে আমাদের রাগরাগিণী বিলেতি চাল এত সহজে অঙ্গীকার করেছে যে তাঁর সুরের এই বিলেতি ভঙ্গি আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা লাগে না। আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে দেশী গান বাজনাকে বিলেতি ছাঁচে ঢালবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিলেতি Concertএর অনুকরণে আমাদের দেশে যে সব "ঐক্যতান-গীতবাদ্যের" রচনা করা হয়েছে তা শুনে যুগপৎ হাসি ও কান্না পায়। কারণ এ সকল তানে ও গানে আর যাই করা হয়ে থাক্, দেশী ও বিলাতি সঙ্গীতের ঐক্যসাধন করা হয়নি। তার

কারণ কেবলমাত্র Mechanical পদ্ধতি হচ্ছে যোড়াতাড়া দিয়ে গড়্‌বার পদ্ধতি। যোড়াতাড়ার সাহায্যে পৃথিবীতে আর যাই হো'ক আর্ট হয় না। আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic. ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুসঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দু'য়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। আমরা আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সাহায্যে যা গড়ে তুল্‌তে পারিনি, যখন দেখি অপর কারও মন থেকে তা আপনিই গড়ে উঠছে তখন আমরা বলি যে সে গঠনক্রিয়ার মূল আর্টের সৃষ্টিকর্ত্তার মগ্ন-চৈতন্যে নিহিত। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশী ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।

"আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, "ঐ দেখা যায় আমার বাড়ী চারদিকে মালঞ্চের বেড়া" এই গানের সঙ্গে কথায় এবং সুরে, "আমার দেশ" এর যে প্রভেদ বাঙ্গালার সেকেলে গান রচয়িতাদের সঙ্গে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সেই প্রভেদ। তিনি বলেন যে, হয়ত কারও কারও মতে "আমার বাড়ী" "আমার দেশ" অপেক্ষা অধিক মধুর। কিন্তু কেউ অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না যে "আমার দেশ"-এ যে ওজস্বিতা আছে "আমার বাড়ী"-তে তার বিন্দুমাত্রও নেই। তাঁর মতে এই ওজঃগুণের সমাবেশেই ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। ইংরাজি কাব্য এবং ইংরাজি সঙ্গীতের শিক্ষার প্রসাদেই ৺দ্বিজেন্দ্রলাল এই ওজঃগুণ লাভ করেছিলেন। "আমার দেশ"-এর সুর ঝিঁঝিট ; কিন্তু এ ঝিঁঝিট এবং বাঙ্গলা ঝিঁঝিটে তফাৎ এত বেশী যে প্রচলিত ঢঙে এ গান গাইতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়্‌বে। অথচ "আমার দেশ"-এ ঝিঁঝিটের সকল সুর বজায় আছে এবং তার তালও পূরামাত্রায় একতালা। অতএব এ কথা সাহস করে বলা যেতে পারে যে আমাদের

রাগরাগিণী ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বেঁকেচুরে গেলেও ভেঙেচুরে যায়নি। রাগরাগিণীর উপর অসাধারণ অধিকার না থাক্‌লে সুরকে নিয়ে যা খুসি তাই করা যায় না। অধিকাংশ গায়ক এবং বাদক অভ্যস্ত বিস্তারই পুনরাবৃত্তি করেন—কেননা সঙ্গীতে নূতন সুরের কিংবা নূতন ঢঙের সৃষ্টি করবার জন্য প্রতিভা চাই। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতকে যে একটি নূতন পথে চালাতে সক্ষম হয়েছেন তাতে করে' তিনি সঙ্গীত-বিষয়ে অনভিজ্ঞতার নয়, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

আমার শেষ কথা এই যে, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতিরক্ষা করা হবে। এ সকল সুরের বিশেষত্বের লোপ পাবার সম্ভাবনা খুব বেশী, কেননা সুর মুখে মুখে কথার চাইতেও বেশী বদ্‌লে যায়। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর স্বরলিপিতে আবদ্ধ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সুর আমাদের চল্‌তি সুরেতে পরিণত হবে।" (সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২)

কলকণ্ঠ কবিশেখর স্যার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেচে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দু-সঙ্গীত থেকে বহিস্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্ব্বাদ করবেন। হিন্দু-সঙ্গীত বলে কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দু-সঙ্গীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে।" (সবুজ পত্র—জ্যৈষ্ঠ—১৩২২ —সোনার কাঠি)।

ইহারই মধ্যে—কোনও কোনও ওস্তাদ দ্বিজেন্দ্রের মহাসঙ্গীতগুলি সত্য সত্যই দেশীয় রাগরাগিণীর প্রচলিত ঢং এ গাহিয়া বিকৃত করিতে

আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রের অপূর্ব্ব গীতগুলিকে স্বরলিপিতে আবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রের "গান" পুস্তকের ভূমিকায় তদীয় পুত্র শ্রীমান্ দীলিপকুমার আশ্বাস দিয়াছেন যে সেই স্বরলিপি তিনিই প্রকাশ করিবেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

আলেখ্য ও ত্রিবেণী

আলেখ্য—এই গীতি কবিতার পুস্তকখানি ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার কতকগুলি কবিতা 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই কাব্যখানি তাঁহার "অনুজোপম শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর করকমলে" উপহার দেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"প্রথমতঃ ছন্দ এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক Syllabic; অক্ষর হিসাবে ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব্ব হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। * * আমি সেই পুরাণো মাত্রিক ছন্দেই এই কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে আমি ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্ত্তে চেষ্টা করেছি।

"তারপরে ভাষা—যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্ত্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্য্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়া-পদের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন যাচ্ছি—কর্চ্ছিলাম ইত্যাদি। অন্যপদ নির্ব্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জ্জন করিনি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা—এই যে যেখানে বাঙ্গলা শব্দ বা বচন, আসল বাঙ্গলা ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গলা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে সেখানে সেই শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাতেই বাঙ্গলা কবিতা হবে। ইংরাজি বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ করে লিখলে সে ইংরাজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা হবে না। "গুতোর চোটে বাবা বলায়"—কি "তাতে মেয়ো না" এই রকম জোরের বচন ইংরাজিতে বা সংস্কৃততে কেহ অনুবাদ করুন দেখি।"

দ্বিজেন্দ্র এই কাব্যের ভূমিকায় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কবিতার আর কোনও গুণ থাকুক আর না থাকুক সেগুলি অস্পষ্ট নহে। বলা বাহুল্য দ্বিজেন্দ্রের সে কথা বৃথা বাকৃচাতুরী নহে। বস্তুতঃই দ্বিজেন্দ্রের এই কাব্যের এবং অপরাপর সমস্ত কাব্যেরই কবিতায় প্রহেলিকার ভাব আদৌ নাই। তিনি মুখে যে নীতি প্রচার করিয়াছিলেন কার্য্যেও তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা কুজ্ঝটিকাবৃত নহে—ভারতের আকাশেরই মত সৌরকর-দীপ্ত।

ত্রিবেণী—এখানিও গীতি-কবিতা পুস্তক—১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "অনুজপ্রতিম কবিবর শ্রীরসময় লাহার করকমলে" উৎসর্গ করেন। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

"বন্ধুবর শ্রীললিতচন্দ্র মিত্রের কাছে আমি এ কবিতা সংগ্রহের নামকরণের জন্য ঋণী।

"কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মিতাক্ষর—অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর ঐকার ও ঔকার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্রচিত 'মন্দ্র' কাব্যে সমস্ত কবিতা এই শ্রেণীর। (২) মাত্রিক—অর্থাৎ যে কবিতার ছন্দ মাত্রা (Syllable) দ্বারা পরিমিত হয়। মদ্রচিত "আলেখ্য"—কাব্যে সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীর। (৩) দশপদী—অর্থাৎ মাত্রিক কবিতা যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দ্দশপদী কবিতা না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে আমি ইংরাজি বা ইটালিয়ান Sonnet এর অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে চতুর্দ্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী। * * *

"সম্ভবতঃ আমার খণ্ড কবিতা রচনার এই খানেই সমাপ্তি। * * 'শ্মশান-সঙ্গীত' কবিতাটির বয়স ত্রিশ বৎসর। * * কবিতাগুলি অধিকাংশই পূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এস্থলে সনেট্ রচনার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র পদ্য লেখা মাত্র এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেক্সপীয়রের সনেটের অনুকরণে বা অন্য প্রকারের চৌদ্দ লাইনের যে সকল কবিতা বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহার অধিকাংশই প্রকৃত সনেট্ পদ বাচ্য নহে। সনেটের উৎপত্তি ইটালী দেশে—ইংরাজেরা অনুকারী মাত্র। Petrarch প্রমুখ ইটালীয়ান্ সনেট্ রচয়িতাগণ সনেট্ রচনার যে আদর্শ দেখাইয়া

গিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করিয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিলে সনেট্ হয় না। সনেটের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে—যথা সনেটের চৌদ্দ পংক্তিকে দুইটি বিভাগ করিয়া—প্রথম অষ্টকে চারিটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় একাক্ষরের মিল থাকিবে (ক খ খ ক, ক খ খ ক) এবং শেষের ষষ্ঠকে ৩টি করিয়া একাক্ষরের মিল (গ ঘ গ ঘ গ ঘ—ষষ্ঠকে মিলের ব্যতিক্রম চলিতে পারে যেমন গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ) থাকিবে; সনেটে একটি মাত্র ভাবের ব্যঞ্জনা থাকিবে—ভাবটি গম্ভীর হইবে; সাগরোর্ম্মির উত্থান পতনের (ebb and flow) মত অষ্টকে সেই ভাবটির উত্থান বা বিকাশ হইবে এবং ষষ্ঠকে তাহার ধীরে ধীরে পতন হইবে; সনেটের বর্ণনার বিষয়ে ভাবুকতা বা চিন্তাশীলতা থাকিবে, বর্ণনা গীতি-প্রাণ (lyric) বা নাটকোচিত (dramatic) হইবে না, ইত্যাদি। সেই কঠিন নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ অবস্থায় সনেট্ রচনা করিয়া সাফল্যের বা মুক্তির আনন্দলাভ করিলে দ্বিজেন্দ্র সনেটের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং তাহা হইলে সনেট্‌কে ক্ষুদ্র কবিতা মাত্র ভাবে দেখিয়া উহার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করিতেন না। তিনি মাত্রিক ছন্দে যেরূপ মিলে দশপদী কবিতা লিখিয়াছেন—তাহাতে চারিটি পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেই সনেট্ হইত না, সুতরাং তিনি সনেট্ না লিখিয়া কেন দশপদী কবিতা লিখিয়াছেন সে কৈফিয়ৎ দিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আলেখ্য ও ত্রিবেণী উভয় পুস্তকেই কবির আত্মপ্রকাশ আছে। কবি নিজে মুক্তপ্রাণ স্পষ্টভাষী ছিলেন। মনের কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেন না। মেবার পতন নাটকের ভূমিকায় কবি পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন বটে যে নাটকের পাত্র পাত্রীদের মুখে তিনি যে সকল উক্তি দিয়াছেন তাহা হইতে গ্রন্থকারের মনের কথা ধরিয়া লওয়া অকর্ত্তব্য ও ভ্রমাত্মক, কিন্তু তত্রাচ আমরা দেখিতে পাই কবির অজ্ঞাত-

সারেই হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক তাঁহার নিজের সরল অন্তরের অনেক কথা অনেকস্থলে পাত্র পাত্রীদের মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু নাটকে আত্মপ্রকাশে যে বাধা আছে, কবিতায় সে বাধা নাই; এখানে কবির প্রাণের অনেক কথা সরল ও স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। কবির ত্রিবেণী কাব্যের 'দশপদী' কবিতায় ও আলেখ্যের কোন কোন কবিতায়— সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনেক বিষয়েই কবি তাঁহার স্বাধীন-মত প্রচার করিয়াছেন। সেই মতামতের কতকগুলি অন্যান্য পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে আর কয়েকটি উদাহরণ দিলাম—

"হায়রে মানুষ! বিধির কৃত্য—চোকের সামনে দেখছি নৃত্য
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি!
খোসামোদের মন্দির খুঁলে মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে দয়াল বলে ডাকি।" (বিধবা—আলেখ্য)

"ওরে মূর্খ! জানিস, মা মা বলে' সখের অশ্রু ফেলা বেশী শক্ত নয়;
যেজন চেঁচায় বেশী 'দীনবন্ধু' বলে—সেজন সত্যই বেশী ভক্ত নয়।"
(ভক্ত—আলেখ্য)

"কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ মিষ্ট শব্দের কথার হার;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার তাহার কাব্য শব্দ সার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত, ঝঙ্কারিত, কবির প্রাণ,
উৎসারিত মহাপ্রীতি;—তাহাই কাব্য, তাহাই গান।
নিদাঘ সন্ধ্যার মহান্ দৃশ্য যাহার চক্ষে বর্ণ সার
কবিই নয় সে—তাহার আত্মা শুদ্ধ পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সেই, যে সে সৌন্দর্য্যে দেখে একটা মহাপ্রাণ
কবি সেই, যে দেখে বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান।"
(কবি—আলেখ্য)

"প্রবাসে" কবিতাটি কবির শেষ কবিতা বলিয়া স্মরণীয়। বাঁকুড়ায় অবস্থানকালে তিনি ইহা রচনা করেন। এই কবিতাটি "শ্মশান-সঙ্গীত—দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া" নামক কবির প্রথম প্রকাশিত (১২৯০ সালে নব্যভারতে) কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—ইহাতে সেই কবিতাটির উল্লেখও আছে। এই কবিতায় কবির চিন্তার লহরীমালা উদ্দাম নৃত্য করিয়াছে—কখনও নিজের অতীত জীবনে, কখনও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ইতিহাসে, প্রাচীন কাব্য—পুরাণে ছুটিয়া গিয়াছে—কখনও সৃষ্টি-রহস্যের সমস্যা পূরণ করিবার জন্য, কখনও বা পরার্থে উৎসর্গ করিয়া মানবজীবন সার্থক করিবার বাসনায় তাঁহার অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। ছন্দের দ্রুতগতির সঙ্গে কবির চিন্তার প্রখর নৃত্যলীলা সুন্দরভাবে একতা রক্ষা করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল অস্পষ্ট কবিতার বিরোধী ছিলেন। তাই সেই অস্পষ্ট কবিতার উদাহরণস্বরূপ ব্যঙ্গচ্ছলে 'রূপক ত্রয়' ও 'এস্রাজ' শীর্ষক কবিতা চতুষ্টয় লিখিয়াছিলেন। সেগুলিকে ত্রিবেণীতে স্থান দিয়া কবি ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"গুটিকতক কবিতা ব্যঙ্গচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলি উচ্চধরণের কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল বলিয়া এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইল।" দশপদী কবিতাগুলিতে দার্শনিকতার ভাব কিছু প্রবল।

কিন্তু এই দুইখানি খণ্ডকাব্যে কবির বিপত্নীক জীবনের আত্মপ্রকাশ আছে বলিয়াই বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'আলেখ্য' কাব্যের বিপত্নীক, মাতৃহারা, হতভাগা, বিপত্নীক (২), শীর্ষক কবিতায় এবং 'ত্রিবেণী' কাব্যের, স্মৃতি, আহ্বান ও সোণার স্বপ্ন কবিতা কয়টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পত্নী-বিয়োগ-ব্যথিত জীবনের মানসিক অবস্থা- সরল, করুণ ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিয়োগের কবিতার সহিত দ্বিজেন্দ্রের 'আর্য্য-

গাথা—২য় ভাগে' প্রকাশিত মিলনের গীতগুলির তুলনা করিলে আমরা দ্বিজেন্দ্রের শোক-গীতির গভীরতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সেই মিলনের গীতগুলিতে দ্বিজেন্দ্রের হৃদয়াকাশের পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না যেমন দীপ্তিমান, এই বিয়োগের কবিতায় তাঁহার মানসাকাশের অমানিশার তামসরাশিও তেমনি গভীর ও নিবিড়ভাবে ঘনীভূত। পত্নীবিয়োগ পরিচ্ছেদে সেইরূপ দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, এস্থলে আরও কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিলাম। কবি বিলাপ করিয়াছেন—

(১)

"শ্রান্তদেহে সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন আপন ঘরে যাবো,
কাহার কাছে বসবো এসে তখন আমি? কাহার মুখের পানে চাবো?
ক্ষুদ্র দুঃখ সুখের কথা কইব আমি এখন কাহার কাছে এসে?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য—গৃহ আঁধার কোরে চোলে গিয়েছে সে।

* * *

তোমায় আমায় বিবাদ হয়নি, এমন মিথ্যা কথা কেমন কোরে কই!
কখনো বা আমার কসুর কখনো বা তোমার হবে অবশ্যই।
তুমি মানুষ আমি মানুষ, গড়া দোষে গুণে—একটু বেশী কম;
তদুপরি অনেক সময়ই, বুঝতে পরস্পরে হোতে পারে ভ্রম।
তবু তুমি আমায় ভালবেসেছিলে জানি, ভরে' তোমার বুক
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটেনা সর্ব্বদাই যে সৌভাগ্য টুক্।
অনেক সময় অনেক বিপদ্, অনেক জ্বালা ছিল অনেক দুঃখ রাশি,
করেছিলে, তুমি প্রিয়ে আমার আঁধার নিশায় শুক্ল পৌর্ণমাসী।

* * *

আমার হৃদয়-সরোবরে পদ্মফুলের মতন তুমি ফুটেছিলে,
আমার নীরস বৃক্ষকাণ্ডে বনলতার মতন জড়িয়ে উঠেছিলে।

পুষ্পিত অটবী দিয়ে, দিয়েছিলে পাহাড় ঘেরে চারিদিক্,
গেয়েছিলে আমার বাবলা গাছের উপর এসে হে বসন্ত পিক।

(২)

জান্তাম নাক চিন্তাম নাক তোমায় আমি প্রিয়তমে, ষোল বছর আগে,
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক্‌গতি এ সংসারের ছিল পৃথক্‌ভাগে;
তোমার জগৎ নিয়ে তুমি, আমার জগৎ নিয়ে আমি ছিলাম ত সে একা;
এক রকম ত যাচ্ছিল সে জীবন নিরুৎসবে কেটে—কেন হোল দেখা।

*　　　*　　　*

এসেছিলে সেদিন তুমি যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে সুখ স্বপ্ন আসে;
এসেছিলে আসে যেমন কান্তারে চামেলি গন্ধ বসন্ত বাতাসে;
শুষ্ক তপ্ত নদীতটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত ঢেউয়ের মত এসে,
স্মৃতি হতে হারা একটা অজানা রাগিণীর মত কোথায় গেলে ভেসে।"

কবি বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি অনুযোগ করিয়াছেন—

"এইত ছিল দেবীমূর্ত্তি, আলাপ, বিলাপ. হাস্য, রোদন
কর্চ্ছিল ত কাছে,
কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাওহে বিশ্বপতি! দাবী কর্চ্ছি—
বল কোথায় আছে?
এই সে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হবে আবার, কিম্বা
এ চির বিচ্ছেদ?
আমি পার্ল্লামনাক; তবে তুমি করে' দাওহে প্রভু এ রহস্য ভেদ?
—হারে মূর্খ! কাহার কাছে—কিসের জন্য দাবী কর্চ্ছিস!
জানিস নাকি ভবে,
যা হবার তা' হবেই হবে; মাথা খুঁড়ে মরিস যদি যা হবার তা হবে
কাহার কাছে বিচার চাচ্ছিস? বিচারকর্ত্তা বহুৎ দূরে, আর্জ্জি বড়ই ক্ষুদ্র;

তোর আর বিচার কর্ত্তার মধ্যে পড়ে আছে উত্তাল এক প্রকাণ্ড সমুদ্র।
আজ পর্য্যন্ত শুনিনিক, শুনে কারো আর্ত্তধ্বনি ফিরেছে প্রবাহ,
বাত্যা থেমে গেছে, গেছে সমুদ্র শুকায়ে; অগ্নি করে নাইক দাহ;
উঠে মাত্র আর্ত্তধ্বনি মিশে যেতে সমীরণে ক্ষুব্ধ মূর্চ্ছনায়;—
আমি কাঁদি আমি কাঁদি এ মহা ব্রহ্মাণ্ডে তাহে—কাহার আসে যায়।
প্রিয়তমে! আজি তুমি জানিনা ক কোথায় গেছ; কোথায় আছ আর;
কোন শাস্ত্রের কোন ধর্ম্মের সাধ্য নাইক দিতে পারে তাহার সমাচার—
যেথা থাক, (থাক যদি) আশা করি আছো সুখে, আশা করি তবে,
তোমার জগৎ—যাহাই হোক না—আমাদের এ জগৎ চেয়ে—কিছু
ভাল হবে।"

কবি লোকান্তরিতা পত্নীকে আহ্বান করিতেছেন—

"যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা—তুমি আমার এসো;
যখন ধীরে পড়ে' আসবে বেলা—তুমি একবার এসো।
যখন যাবে কলরব থামি'—যখন রব একা,
কাউকে খুঁজে পাব না ক আমি—তুমি দিও দেখা।
আমার নাইক এমন কোন দাবী—তোমায় আমি পাবো।
আমি শুধু পূর্ব্বকথা ভাবি—তুমিও কি ভাবো?
তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে—আমি চেয়ে থাকি;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে—তুমি আসো নাকি?

* * *

যখন হেথায় ছেড়ে যাবো শেষে—যাহা কিছু প্রেয়;
তুমি তখন সাগর তীরে এসে—সঙ্গে নিয়ে যেও;

* * *

আঁধার যদি, তুমি শুধু হেসো—আঁধার হবে আলো।
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো—তুমি বেসো ভালো।"

ঘটনাচক্রে দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক আর দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি—বিশ্ববন্দিত কবি স্যর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল—তুল্যরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যে এবং অক্ষয়কুমারের "এষা" কাব্যে সেই স্ত্রী-বিয়োগের কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। অনেক স্থলে একই ভাব কবিত্রয় নিজ নিজ প্রকৃতির ও রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব অনুযায়ী স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কবিতাগুলিতে রচয়িতাগণের বিশেষত্ব জাজ্বল্যমান। তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচ্চতম কবিস্বপ্নময়, গভীর করুণরসসিক্ত, তাঁহার শোকের অভিব্যক্তি সহজ ও সুন্দর, ধীর ও সংযত এবং কবির স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচবশতঃ তাঁহার আত্মপ্রকাশ সংহত। অক্ষয়-কুমারের কবিতায় তাঁহার হিন্দুত্ব, শোকের অনুভূতির গভীরতা, অভি-ব্যক্তির শ্রেষ্ঠকবিজনোচিত বিশিষ্টতা এবং সুনির্ব্বাচিত বাক্য-সম্পদ্ দেদীপ্যমান। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা তাঁহার উন্মুক্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া—গভীরতম আবেগপূর্ণ নি:সঙ্কোচ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। দ্বিজেন্দ্রের অভিব্যক্তির ভঙ্গীও যেমন নিজস্ব, তাঁহার বিলাপধ্বনিতেও কেমন একটি পুরুষোচিত ভাব আছে যাহা বাঙ্গালায় অপর কোনও কবির রচনায় দৃষ্ট হয় না; কবিতাগুলির ছন্দ, ভাষা ও ভাব সমস্তই মৌলিক এবং অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

দ্বিজেন্দ্রলাল মাসিক পত্রাদিতে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাহার মধ্যে "কালিদাস ও ভবভূতি" নামে এক খানি পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া কবি তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে ছাপিতে দিয়াছিলেন; কিন্তু কবির মৃত্যুতে সে পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য স্থগিত হইয়া যায়—আশা আছে সে পুস্তকখানিও অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। কবি সেই পুস্তকখানির নাম দিয়া গিয়াছেন—"চিন্তা ও কল্পনা"।

কালিদাস ও ভবভূতি– এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল ও ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকদ্বয়ের বিস্তারিত ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রথমে ১৩১৭ সালের সাহিত্য পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে ১৩২২ সালে কবির পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমার উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া কবির ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের দোষ গুণ বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাসের পার্থক্য ও বিশেষত্ব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ, উপমার প্রয়োগ, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় (Poetic Justice) প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাবলী, নাটকে পরিহাসরসিকতা ও অতিমানুষিক বিষয়ের অবতারণা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনায় কবির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, সহৃদয়

গুণগ্রাহিতা, দেশীয় ও বিদেশীয় সুকুমার সাহিত্যে জ্ঞান ও গবেষণা, সৌন্দর্য্যবোধ ও রসগ্রাহিতা একাধারে দেদীপ্যমান।

এই গ্রন্থেও অভিমত প্রকাশস্থলে কবির হৃদয়ের আবেগ ও স্পষ্ট-ভাষিতা সর্ব্বত্র প্রকট। যেখানে তিনি সুখ্যাতি করিয়াছেন সেখানে অন্তরের অন্তস্তল হইতেই করিয়াছেন, যেখানে নিন্দা করিয়াছেন সেখানে তীব্র ভাবেই করিয়াছেন—তিক্ত বটিকার উপর শর্করার প্রলেপ দেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"এই পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব্ব জিনিস দেখি। দেখি, অলক্ষ্যে একটা যুদ্ধ চলিয়াছে, এক দিকে ক্ষত্রিয়ের তেজ, অন্য অন্য দিকে ব্রাহ্মণের তেজ। * * * আমি শকুন্তলার এই পঞ্চম অঙ্ক জগতের নাট্য-সাহিত্যে অতুল্য বিবেচনা করি। গ্রীক নাটকে এই রূপ পড়ি নাই, ফরাসী নাটকে পড়ি নাই, জর্ম্মান নাটকে এইরূপ দৃশ্য পড়ি নাই—ইংরাজি নাটকে পড়ি নাই।"

"লঙ্কা জয়ের পরে রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন তখন সীতা যে উত্তর দেন তাহার দীপ্তিতে সমস্ত রামায়ণ খানি উদ্ভাসিত। * * * * এ কথা যে ত্রি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোনও নারীর মুখে শুনিতে পাইব, এরূপ আশা করি নাই। ভাবিতে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, রক্ত উষ্ণ হয়, গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে যে, এই আর্য্যযুগে আমাদেরই দেশে এক কবি সতীত্বের এই তেজের, এই আত্মাভিমানের এই মহিমার কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রেমের এই অশরীরিণী বিশুদ্ধি, ঐশী আধ্যা-ত্মিকতা এরূপ ভাবে আর কেহ কোনও কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন কি না জানি না।"

"রসিকতা সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের সহিত কালিদাসের তুলনা হয় না—সেক্সপীয়র এত উচ্চে।"

"বস্তুতঃ বিরাট্ গম্ভীর, ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি কালিদাসের বহু ঊর্দ্ধে। আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। রমণীয় করুণ ছবি আঁকিতে কালিদাস যেমন, গম্ভীর ও করুণ ছবি আঁকিতে ভবভূতি তেমনই। কালিদাসের নাটককে যদি নদীর কলস্বরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভবভূতির এই নাটককে সমুদ্রগর্জ্জনের সহিত তুলনা করিতে হয়। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে, মনের ভাব বাহিরের ভঙ্গিমায় বা কার্য্যে প্রকাশ করিতে ভবভূতি কালিদাসের চরণরেণু মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নহেন।"

এইরূপ জোরের সহিত অভিমত প্রকাশের দৃষ্টান্ত পুস্তকে অনেক আছে। কবি এই গ্রন্থে সীতা ও শকুন্তলা এবং রাম ও দুষ্মন্ত চরিত্রের কিরূপ নিপুণভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রলোভন, বাহুল্য ভয়ে, দমন করিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে কবি ও নাট্যকার ছিলেন—কবিত্ব কাহাকে বলে, নাটকের কি কি গুণ থাকা উচিত এবং নাটকত্বের সহিতে কবিত্বের কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সে বিষয়ে তাঁহার পরিণত বয়সের কিরূপ ধারণা ছিল—এই পুস্তকে তাহার বিশেষভাবে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

চিন্তা ও কল্পনা—এই প্রবন্ধ-পুস্তকে 'নব্যভারত'পত্রে (পৌষ, ১২৯০) প্রকাশিত 'প্রেম কি উন্মত্ততা,' 'বাণী'পত্রিকায় (কার্ত্তিক, ১৩১৭) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সমালোচনা প্রভৃতি যে সমস্ত রচনা দ্বিজেন্দ্রলাল মুদ্রাঙ্কিত করিতে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'গোরা'র সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গোরা' মনস্তত্ত্বের বা অন্তর্দ্বন্দ্বের এক অপূর্ব্ব উপন্যাস—এবং সেই উচ্চাঙ্গ উপন্যাসের যোগ্য সমালোচনাই দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়া গিয়াছেন। সেই উপন্যাসের গোরা, বিনয়, সুচরিতা, আনন্দময়ী, পরেশ প্রভৃতি প্রধান

প্রধান ব্যক্তিগণের দ্বিজেন্দ্রলাল যে চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি গোরা ও বিনয় চরিত্রদ্বয়ের যে অনিন্দ্যসুন্দর তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের মানবচরিত্র জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম ও উদার সমালোচনার শক্তি প্রকট হইয়া আছে। প্রবন্ধের ভাষাও যেমনি সংযত ও মনোজ্ঞ, অভিব্যক্তিও তেমনি উপভোগ্য। এই সমালোচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাভাবিক জোরের সহিত স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

গোরার আখ্যানবস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "এই ব্যাপার লইয়া এই বৃহৎ ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস রচিত হইয়াছে এবং এরূপ কৌশলের সহিত ইহা রচিত হইয়াছে যে আদ্যোপান্ত আমি মুগ্ধ হইয়া এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছি।

"এই উপন্যাসে বহুল পরিমাণে তর্কবিতর্ক আছে, তাহাতে পাঠকের বিতৃষ্ণা হয় না, বরং সেইগুলি বোধ হয় যেন মাণিক্যের মত পুস্তক মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। এ তর্কগুলির মজা এই যে, যখন যে উক্তিটি যে পক্ষে উক্ত হইয়াছে তখনই সে উক্তি সেই পক্ষের চরম যুক্তি বলিয়া বোধ হয় এবং বিপক্ষবাদী তাহার উত্তরে কি বলিবে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল বাড়ে। * * *

"উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি চরমলক্ষ্য নির্দ্দেশ করা। চমৎকার কৌশলের সহিত দেখান হইয়াছে যে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামীর চেয়ে আধুনিক ব্রাহ্ম গোঁড়ামী কম অনিষ্টকর নহে। * * বস্তুতঃ এত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস কদাচিৎ নয়নগোচর হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা এক সঙ্গে আর কোন উপন্যাসে দেখি নাই! * * * ইহা শুদ্ধ উপন্যাস নহে, ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ। এক দিকে

যেমন ৬০০ পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কেবল কৌতূহল বাড়িতে থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত করিয়া উঠিতে অনিচ্ছা হয়, অন্য দিকে ইহা হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। এ উপন্যাসখানি বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরব। সকলেরই (বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্রাহ্মের) এই উপন্যাসখানি পাঠ করা উচিত।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

“ভূমিকা”—সমালোচনা

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না—প্রত্যুত সেগুলি পাঠ করিয়া সময়ে সময়ে অতিমাত্র বিচলিত হইতেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর ‘ভূমিকা’ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার কোনও গ্রন্থের সমালোচনার প্রতিবাদ অথবা ভবিষ্যৎ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে আত্মরক্ষা—কচিৎ বিজ্ঞতাভিমানী অজ্ঞ সমালোচককে শিক্ষাদান। শেষোক্ত ধরণের সমালোচনার এস্থলে কয়েকটি উদাহরণ দিব।

“মন্দ্র” কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছিলেন—“সমালোচকদিগের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা যদি পুস্তকখানি সমালোচনা করেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ তাঁহারা যেন তৎপূর্ব্বে গ্রন্থখানি পড়েন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যে বিষয় জানেন সেই বিষয়েই যেন তাঁহাদিগের “কশাঘাত” সংরুদ্ধ রাখেন। একথা বলা নিতান্ত দরকার না হইলে এখানে বলিতাম না। সমালোচনা জিনিসটা অধুনা সম্প্রদায়বিশেষে নিতান্ত

দায়িত্বহীন, সখের বা ব্যবসায়ের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমাদের দেশে একজন লেখক ইংরাজ-সমাজে না মিশিয়া ইংরাজী নারী-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। আমার একটি বন্ধু সমুদ্রবিষয়ক একটি কবিতার এক বিজ্ঞ উপদেশপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কখন সমুদ্র দেখেন নাই। * * * রচনা উত্তম হইয়াছে কি অধম হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার স্বত্ব সমালোচকের আছে * * * কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার নৈতিক স্বত্ব কাহারও নাই।"

"প্রতাপসিংহ" নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—

"যাঁহারা ঐতিহাসিক সত্য রক্ষিত হইল না বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে রস্কিনের অভিমত পাঠ করেন। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের বিবৃতির মধ্যে কি যে প্রকৃত ঘটনা তাহা নির্দ্দেশ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠে। "পোর্ট আর্থার" সম্বন্ধে ঘটনাবলি তাহার উদাহরণ। এরূপ পড়িয়াছি যে ট্রাফাল-গার যুদ্ধে কোনও ফরাসী লেখক বলেন যে ফরাসী জয়ী হইয়াছিল।"

"যাহার মুখে যে উক্তি সঙ্গত ও স্বাভাবিক, তাহাই নাটকে তাহার মুখে দেওয়া হয়। তাহা না দিলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না। তাহা হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যিনি বাহির করেন তিনি অন্তর্য্যামী হইয়া পড়েন।"

"মেবারপতন"এর ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নাটকের মত বা উপন্যাসের মত নিরীহ পুস্তক লিখিলেও * * * উদ্দেশ্য আবিষ্কারকারী সমালোচকদিগের হস্ত হইতে নিস্তার নাই। তাঁহারা তাহা হইতে একটা উদ্দেশ্য বাহির করিবেনই। এই যেমন দুর্গাদাসেই ধরুন না, রাজসিংহ যখন বলিতেছেন "ঈশ্বরের নিয়মে অন্তিমে অধর্ম্মের পতন হবেই" এবং তাহার উত্তরে মহামায়া বলিতেছেন

"সে কবে! কবে! কবে!" তখন এক শ্রেণীর সমালোচক হয়ত বলিতে পারেন যে আমি নাস্তিক।"

"সমালোচকদিগকে বুঝাইতে কিছুদিন লাগিয়াছে যে নাটক—কাব্য, নাটক ইতিহাস নহে। এখন কিছুদিন বোধ হয় বুঝাইতে লাগিবে যে নাটক—রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়। * * যে সময়ের ঘটনা লইয়া যে নাটক রচিত, সেই সময়ের চরিত্রগত অভিব্যক্তি লইয়াই সেই নাটক প্রধানতঃ ব্যাপৃত। বর্ত্তমানের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই!"

"সাজাহানের" ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, "আমার একজন সম্পাদক বন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি নাটকের ভূমিকা লেখো কেন?" আমি উত্তর করিয়াছিলাম "তোমরা নিজের কর্ত্তব্য কর না বলিয়া।" মন্দ বলিয়াছিলাম কি? সম্পাদকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিলে গ্রন্থকারকে এত কষ্টস্বীকার করিতে হইত না।"

আনন্দ-বিদায়ের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"ভূমিকায় এগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল, কারণ, দেখিতেছি যে, অনেক অসাবধান পাঠক, চিন্তা না করিয়াই গ্রন্থের সমালোচনা করেন। আবার কোন কোন সমালোচক এমন নিরেট যে ভূমিকারূপ হাতুড়ি দ্বারাও তাঁহাদের মাথায় পেরক বসে না। উদাহরণতঃ "পরপারে"র ভূমিকায় আমি বলিয়াছিলাম যে ইহা ইংরাজি-শিক্ষায় আলোড়িত "বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের" ভিত্তির উপর গঠিত, তথাপি এই ব্যক্তিগণ নাটকে সেকেলে আদর্শ খুঁজিতে বসিলেন। * * * সমালোচকগণ যেন মনে রাখেন যে সমাজে এখন নূতন নূতন আদর্শ সৃষ্ট হইতেছে এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাদের সেকেলে আদর্শ লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু কি করিব আমি যুক্তি দিতে পারি, মস্তক দিতে পারি না। তাহা ভগবানের সৃষ্ট।"

উক্ত মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার গ্রন্থের সমালোচকদিগের সহিত পূর্ব্ব হইতেই একটা 'বোঝাপড়া' করিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন—পাছে তাঁহারা 'উল্টা বুঝিয়া' ভালকে মন্দ, সাদাকে কালো বলিয়া বসেন। বস্তুতঃ সেরূপ স্থলে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন—ভাষায় সংযম রক্ষা করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। ইহার পরিচয়ও উদ্ধৃত ভূমিকাংশসমূহে আছে। বস্তুতঃ সমালোচক-দিগের উপর অশ্রদ্ধা তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তিনি নিজের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি করিয়াই "মন্দ্র" কাব্যে বায়রণকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"অতি সত্য কথাই তুমি বলিয়াছিলে হে কবি! সর্ব্ব ব্যবসাই
শিক্ষা সাধ্য, আছে একটি ব্যবসা যাহে শিক্ষা প্রয়োজন নাই,—
মূর্খ হইলেও চলে—সে সমালোচনা। অন্য সুবিধাটি তার—
আছে তার চির স্বত্ব; যত ইচ্ছা, মিথ্যা কথা করিতে প্রচার।"

বলা বাহুল্য দ্বিজেন্দ্রের গ্রন্থসমূহের ভূমিকার উক্ত মন্তব্যসমূহ সমালোচকগণ নতমস্তকে গ্রহণ করিতেন না—প্রত্যুত সময়ে সময়ে তীব্রতর ভাষায় প্রতিবাদ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অর্চ্চনা' (পৌষ ১৩১৯) পত্রে প্রকাশিত 'আনন্দ বিদায়ের' সমালোচনা (শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত) হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনিই বুঝিবেন যে দ্বিজেন বাবুর ঐ গালাগালির লক্ষ্য "বঙ্গবাসী" ও "নব্যভারতের" সমালোচনা। * * উহা পাঠে "বঙ্গবাসী"র সমালোচক অনায়াসে বলিতে পারেন যে, 'আহা! দ্বিজেন বাবুকে আর কখনও কিছু বলিয়া কাজ নাই। যিনি নিজের লেখায় দুই একটা অপ্রশংসার কথা শুনিলেই

ভদ্রলোককে গালাগালি করেন ; তাঁহার উপর রাগ করিবার কিছু নাই ; বরং তিনি কৃপার পাত্র।'

"দ্বিজেন বাবুর ভাষায় অসংযম ও শিথিলতার পরিচয় যে আজ এই প্রথম পাইলাম, তাহা নহে। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে মক্স করিতেছিলেন, তখন একবার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার দোষ ধরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—এই সব কল্পনা উক্ত গ্রন্থকারের (বঙ্কিমের) শেষ বয়সে বিকৃত মস্তিষ্কের চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।" সুখের বিষয় * * বাঙ্গালার নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচক সমাজপতি মহাশয়ের ভাষার কশাঘাত তাঁহার ঐ অসংযত লেখনীকে সুসংযত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। * *

"সমালোচকদিগের জন্য 'হাতুড়ির' ব্যবস্থা দ্বিজেন বাবু যে আনন্দ-বিদায়ে এই প্রথম করিয়াছেন ; তাহা নহে। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক নাটক ও নাটিকা নামাঙ্কিত পুস্তকের ভূমিকায় সমালোচকগণকে তিনি ধমক দিয়াছেন, চোখ রাঙাইয়াছেন। তাঁহার ভূমিকার ভাবখানা এই যে * * আমি যাহা বলি তাহা অকাট্য, আমি যাহা লিখি তাহা নিখুঁৎ।"

উদ্ধৃত ভূমিকাগুলি এবং উক্ত প্রতিবাদটি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার গ্রন্থের বিরুদ্ধ সমালোচনা বা প্রতিবাদ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলেন—"সমালোচনার দোষ দেখাইয়া দিলে দ্বিজু তাহা অগ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার সীতা নাটক 'নবপ্রভা'য় প্রকাশিত হইলে কোনও সমালোচক (বঙ্গবাসী) সেই নাটকের অনেক দোষ দেখাইয়া দেন। দ্বিজু সে সমালোচনা পড়িয়া বলেন যে ঐ নাটকের যত কিছু দোষ আবিষ্কার করা সম্ভব সমালোচক তাহা করিয়াছেন। দ্বিজু সেই সমালোচনার প্রতিবাদ অতি কঠোর

ভাষায় করেন—সে ভাষা এত কটু হইয়াছিল যে সমালোচকের উপর সেরূপ ভাষা তিনি আর কখন ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পরে যখন ঐ সীতা নাটকখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন পাঠ করিয়া দেখি যে উক্ত সমালোচক যে সকল দোষ দেখাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ দোষই দ্বিজু সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

"একদিন কথায় কথায় দ্বিজু বলেন 'আজকাল * * বড় তর্ক করে। তাহাতে আমি বলি 'তর্ক করা ভাল না—তর্ক করিয়া কাহারো দোষ সংশোধন করা যায় না—তর্ক করিলে লোকে আরো জেদ করিয়া নিজের দোষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করে।' তাহাতে দ্বিজু উত্তর দেন 'আমি কিন্তু সে কথা স্বীকার করি না। পালিতে (৺লোকেন্দ্র পালিত) ও আমাতে অনেক সময় তর্ক হইয়াছে। পালিতকে তাহার ভ্রম স্বীকার করিতে দেখিয়াছি।'

"চন্দ্রগুপ্ত নাটক বাহির হইলে 'মণ্টু' আমাকে একদিন ঐ নাটকখানি সম্বন্ধে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করে। আমার ঐ নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রের অপরাপর নাটক হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু যখন মণ্টু বলিল যে মাননীয় গুরুদাস বাবু (স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ঐ নাটকখানির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। তখন আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—উহার যে সমস্ত দোষ দেখিয়াছিলাম, তাহা একে একে দ্বিজুকে বলিলাম। দ্বিজু সেগুলি সমস্ত শুনিলেন এবং নিজের পক্ষসমর্থন করিয়া তর্কও করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম দ্বিজু বলিয়াছিলেন—"সেজ দাদার সঙ্গে তর্ক করে সুখ আছে, উনি এ রকম ধীর ভাবে, কিছুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত না হয়ে, তর্ক করেন যে সে তর্ক শুনিলে আনন্দ হয়।"

বস্তুতঃ সহৃদয়তার সহিত যুক্তিযুক্ত ভাবে সমালোচনা করিলে, তিনি

বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হইতেন না, পরন্তু ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দেওয়াতে সমালোচকের নিকট মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন "সীতা" নাটকের ভূমিকায় এরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার আছে। দেবকুমার বাবু লিখিয়াছেন "তারাবাই নাট্যকাব্যের আমি একটি সমালোচনা করিয়া তাঁহার (দ্বিজেন্দ্রের) নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় প্রচুর পরিমাণে আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সন্ধ্যাকালে আমার নিকট আসিয়া, সহসা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং আমার প্রদর্শিত ত্রুটীগুলি অম্লান মুখেই স্বীকার করিয়া অপ্রত্যাশিত প্রীতির সুখ-বেদনায় আমাকে "ভাই ভাই" বলিয়া কতই না কাঁদাইয়াছিলেন।" (সাহিত্য আশ্বিন, ১৩২০)

এই নগণ্য লেখকের সাজাহান নাটকের সমালোচনাটি যখন সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন বন্ধুবর রসময় বাবু উহা দ্বিজেন্দ্রকে পাঠ করিয়া শুনাইলে, দ্বিজেন্দ্রের কোনও কোনও বন্ধু সমালোচনাটি বিরুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিয়া (Learএর সহিত সাজাহান-চরিত্রের সাদৃশ্য কষ্টকল্পিত ইত্যাদি) অসন্তোষ প্রকাশ করেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্র স্বয়ং সহৃদয়তার সহিত আমার সঙ্গে কয়েকটি সামান্য বিষয়ে মতভেদের কথা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র,—কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু আমার সহিত সেই সময়ে একদিন পথে সাক্ষাৎ হইলে,—সামান্য পরিচয় সত্ত্বেও— স্বাভাবিক প্রীতি-প্রফুল্লমুখে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল খোলাপ্রাণের লোক ছিলেন, সেইজন্য তিনি অপ্রীতি প্রকাশ করিবার সময় যেমন অকপট ভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিতেন, তেমনি প্রশংসা করিবার সময়ও প্রাণ খুলিয়াই প্রশংসা করিতেন— অর্দ্ধমনা হইয়া অভিমত প্রকাশ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

দ্বিজেন্দ্রের সভাপতিত্বে সাহিত্যপারিষৎ ভবনে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের রচিত "যশোর যুদ্ধ" নামক কবিতা সাহিত্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পাঠ করেন। কবিতাটি শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র-লাল বলিলেন "দশ বৎসরের মধ্যে আমি এমন কবিতা শুনি নাই।" উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত করুণানিদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কবিতায় "রবির কিরণ পিছলে পড়ে আতা-নোনার গায়" পংক্তিটি পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্র এতই প্রীত হয়েন যে তিনি উক্ত কবির বাটীতে গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আসেন। দেবকুমার বাবুর "ব্যাধি ও প্রতীকার" পুস্তক পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্র প্রশংসাপত্রে লিখেন,—"পরবর্ত্তী যুগে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকবি ও লেখক, আমি অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম।" রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,—তাঁহার "খাসদখল" অভিনয় দেখিয়া গিয়া দ্বিজেন্দ্রের কোনও বন্ধু 'মন্দ হয় নাই' বলিলে, দ্বিজেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে তাঁহাকে বলেন, "কি! সবাই চার ঘণ্টা ধরে হেসে আসছে—আর তুমি বল কি না মন্দ হয় নি!"

এইরূপ ঘটনাগুলি স্মরণ করিলে মনে হয় যে তাঁহার হৃদয় এরূপ সরল ও আবেগময় ছিল, যে নিন্দা বা প্রশংসা উভয় স্থলের সংযম রক্ষা করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। কবিবরের অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্র সারল্যের অবতার ছিলেন। * * * এই সারল্য ছিল বলিয়াই তিনি প্রাণখুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিতেন, আবার মনখুলিয়া নিন্দা তিরস্কার করিতে পারিতেন। * * * দোষই বল আর গুণই বল দ্বিজেন্দ্রলাল মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না, যাহা ভাবিতেন তাহাই বলিয়া ফেলিতেন, সেই হেতু তাঁহার জীবনে দুই একবার বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়াছিল।" (মানসী, আষাঢ়, ১৩২০) দেবকুমার বাবু এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া-

ছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"একদিন * * কোন খেতাবী ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলালের কলিকাতার ভবনে শুভাগমন করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'বলি Mr. দ্বিজু তুমি কেমন লোক হে? আমার এই সম্মান লাভে বিশ্বশুদ্ধ লোক আজ আমায় congratulate করলে, আর তুমি কি না আপনার লোক হয়ে আমার একটা খোঁজও নিলে না!' শুনিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে যে সরকার বাহাদুর ব্যঙ্গ করেছেন সেটা বুঝি বুঝলে না! তা না হলে তোমার মত অশিক্ষিত লোকেরও খেতাব মেলে!' * * * যাহা যখন তিনি সত্য মনে করিয়াছেন কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এভাবে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। এক দিন তাঁহাকে সতর্ক করিতে যাইলে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন—"কি বল তুমি, জীবনে তো কাহারো মুখচেয়ে চলিনি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কিসের জন্য কি লাভের আশায় বিবেক ও বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া লোকের মনরাখা কথা বলতে যাব, অমন নীচ বলে আমাকে ভাববার তোমার কি কারণ আছে?" (সাহিত্য, ১৩২০)

দ্বিজেন্দ্রলালের এই অপ্রিয় সত্য বলিবার স্বভাবটি ভাল কি মন্দ সে বিচার না করিয়া ইহা হইতে তাঁহার যে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহারই আর একটি উদাহরণ দিব। আমি যে বন্ধুবিচ্ছেদের কথা বলিতেছি তাহার সহিত তুলনায় দেবকুমার বাবু যে বন্ধুটির সহিত মনান্তরের কথা বলিয়াছেন তাহা অতি তুচ্ছ ঘটনা;—আমি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মনোমালিন্যের কথা বলিতেছি। সে ঘটনা সর্ব্বজনবিদিত এবং সে ঘটনার উল্লেখ না করিলে দ্বিজেন্দ্রের জীবনকথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পর পরিচ্ছেদদ্বয়ে সেই বাদ

বিসম্বাদের কথা বাদী প্রতিবাদীর নিজেদের কথায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

——:•:——

কাব্যে অস্পষ্টতা

"কাব্যের অভিব্যক্তি" নামক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—"গত শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের প্রকাশ' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুদ্ধ তাহা নহে, যাঁহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাঁহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্র বাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে ইহার এই প্রতিবাদ করিতাম না।

"লেখকের মতে এই অস্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটা 'বৃহৎ আইডিয়া' আছে। সেই আইডিয়াটি দু'এক কথায় বুঝা যাইবার নহে, তাহা অনেকাংশে কবির নিকটেই প্রচ্ছন্ন। * * *

"কাব্যের জড়তা সাধারণতঃ আইডিয়ার জড়তা হইতে প্রসূত হয়। যেখানে আইডিয়া স্পষ্ট সেখানে ভাষা প্রাঞ্জল। যেখানে আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের নিকটে প্রচ্ছন্ন, সেখানে ভাষা অবশ্য অস্পষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফল নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ার ফল। * *

"একটা উদাহরণ লইতে হয়। আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের

অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতএব তাঁহার কাব্য হইতেই উদাহরণ লইলেই হয়।

"রবি বাবুর ভক্তগণ রবি বাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া লিখিয়াছেন যে, 'তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক।' দেখা যা'ক ইহার সৌন্দর্য্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে কি ভাব সংগ্রহ কবিতে পারি। বলাবাহুল্য কবিতাটি যার-পর-নাই অস্পষ্ট। * * *

"পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ কবির প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য কবিতা (Wordsworthএর Ode on the Immortality of the soul) বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃ-ভাষায় আমার বাঙ্গালী-ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি দুর্ব্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে—একেবারে অর্থশূন্য স্ববিরোধী। * *

"যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা, তাহাতে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না। কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট; স্বচ্ছ হইলে shallow বা অগভীর হয় না কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া "miraculous" দাবী করিয়া, স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।" (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৩)

"কাব্যের উপভোগ"—প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—

"আমার 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামক প্রবন্ধ-পাঠে অনেক ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভুত ওকালতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং যে সব কবিতার

ভাব গ্রহণ কর্ত্তে অসমর্থ, সে সব কবিতা, দেখলাম যে কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন। আমি সেই চেলাদিগকে এইখানে বলে রাখি যে রবীন্দ্র বাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কি না সন্দেহ। তবে রবীন্দ্র বাবু যাই লেখেন তা'তেই তাধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ম্যাও এঁও এঁও বলে কোরাস দিতে পারি না,—রবীন্দ্র বাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।

"রবীন্দ্র বাবু তাঁর আত্মজীবনীতে Inspiration দাবী করে' যখন নিজের কবিতাবলি সমালোচনা কর্ত্তে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তাঁরই উক্তি বঙ্গদর্শনে প্রায় তাঁরই ভাষায় পুনরুক্ত দেখে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গল হিসাবে তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বসেছিলাম; এবং উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্র বাবুর জনকতক নগণ্য চেলা তাঁর উত্তমগুলি অনুকরণে অসমর্থ হয়ে তাঁর অর্থহীন কবিতাগুলির অন্ধ অনুকরণে ভাবহীন ঝঙ্কার কর্ত্তেন, তাই আমার উক্ত প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়েছিল। আমি দেখে সুখী হলাম যে সে বিষয়ে সকলেই আমার সঙ্গে একমত। কাব্য যে স্পষ্ট হওয়া উচিত সে বিষয়ে ত তাঁরা আমার সঙ্গে একমতই। আর আমার উল্লিখিত কবিতাটিরও যে কোনরূপ অর্থ হয় না, সে বিষয়েও তাঁরা আমার সঙ্গে একমত। কারণ, যখন পাঁচজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেই নগণ্য কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাহির করে' নিজেদের মধ্যে বিবাদ কচ্ছে'ন, তখন এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে কবিতাটির সত্যই কোন অর্থ নাই। তবে তাঁরা পণ্ডিত লোক, নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন। * * *

"আমি পূর্ব্বে বলেছি যে প্রবুদ্ধ উপভোগ থেকে সমালোচনার সৃষ্টি। আমাদের দেশে সমালোচনা জিনিষটা বড় একটা নাই। তাই আমার বোধ হয় আমাদের দেশের কাব্যের প্রবুদ্ধ উপভোগও বড় বেশী নাই।

শিক্ষিত সমাজে শতাংশের একাংশও কবিতা পড়েন কি না সন্দেহ। আবার সেই ভগ্নাংশের শতাংশের একাংশ ব্যক্তি কবিতা বুঝে পড়েন কি না সন্দেহ।" (বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৪)

রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধের যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার মূল কথা এই—

"আমার কোনো বিশেষ কবিতা ভাল কি মন্দ, তাহা সুবোধ কি দুর্ব্বোধ, সে সম্বন্ধে যদি বা আমার বলিবার কিছু থাকে তাহা না বলিলেও চলে। * * তবে দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি আমার প্রতি যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। কারণ সেটা কবিত্ব লইয়া নয়, চরিত্র লইয়া।

আমার আত্মজীবনী প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি দ্বিজেন্দ্র বাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। * * আমি মনে জানি অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। * * কিন্তু অহঙ্কার করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি নাই—তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। * * আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে তবে দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্য বোধ করেন নাই ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও গানে, সভাস্থলে ও মাসিক পত্রে এবং, যে ব্যঙ্গ ইতিপূর্ব্বে কদাচ কোন ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই, সেই ব্যঙ্গে ও ভৎর্সনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। * * *

"আমি মাসিক পত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার লেখার সেই সকল "অপ্রবুদ্ধ" উপভোগের বিবরণ পড়িয়া অনেক বিচারক আমাকে দ্বিজেন্দ্র বাবুর অযথা স্তাবক বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। আমি তাহাতে কান দিই নাই। * * *

আমার কাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার মতে অনৈক্য হইয়াছে তাঁহাদিগকে তিনি আমার "চেলা" বলিয়াছেন। * * *

"দ্বিজেন্দ্র বাবু কেন কল্পনা করিতেছেন যে আমি একদল চেলা আমার চারি পাশে তৈরি করিয়া তুলিয়াছি। যদিচ তাঁহারও অনুরক্ত বন্ধু-বর্গের অভাব নাই তথাপি আমি রাগ করিয়াও এরূপ অপবাদ তাঁহাকে পালটা ফিরাইয়া দিতে পারি না। আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্র বাবুর কোনো মতেই ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারো ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।" (বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৪)

এই বাদানুবাদের পর দ্বিজেন্দ্রলাল, "রবীন্দ্র বাবুর বক্তব্যে"র কোনও প্রত্যুত্তর দেন নাই। তৎপূর্ব্বে তিনি ১৩১৩ সালের সাহিত্য. পত্রে আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরী" কবিতার যাঁহারা অর্থ আবিষ্কার করিয়া প্রবন্ধ লিখেন তাঁহাদের বিদ্রূপ করিয়া "একটি পুরাতন মাঝির গান" নামক একটি কবিতা ও তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন—সেই কবিতাটির ও তাহার প্রথম দুই চরণের ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"একটি পুরাতন মাঝির গান।

(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।)

(১)

"ঘাটে ডিঙ্গে লাগায়ে বঁধু! পান খায়ে যাও,
পান খায়ে যাও বঁধু! পান খায়ে যাও।

(২)

"কোন গেরামের লাও তোমার, কোন গেরামের লাও?
একটা কথা কও বা না কও, পান খা'য়ে যাও।

(৩)

"আমার গাছের পান সুপারি তোমায় দেবো ক্ষাও,
কড়ির কথা শ্যাষে হবে, পান খায়ে যাও।

ব্যাখ্যা।

(১)

"ঘাটে=সংসারে; ডিঙ্গে=করুণ (তরী); লাগায়ে=দান করিয়া;
বঁধু=হরি; পান খায়ে=দেখা দিয়ে; যাও=যাও।
"হে হেরি আমাকে করুণা করিয়া দর্শন দিয়া যাও।
"[এখানে ডিঙ্গের অর্থ ছোট নৌকা নহে। কারণ, যিনি ভব-সংসারের কাণ্ডারী, তাঁহার নৌকা যে কেন ছোট হইবে, বোঝা যায় না। এখানে ডিঙ্গের অর্থ দেশী তরী। ইহা জাপানীর যুদ্ধজাহাজ নহে; গোয়ালন্দ ঘাটের ষ্টীমারও নহে। ইঁহা একান্ত দেশী নৌকা। অতএব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভক্ত কোনও বিজাতীয় ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন না, আমাদের হরিকেই ডাকিতেছেন। আর, "কবি পান খায়ে যাও" কেন বলিলেন? অর্থাৎ পুত্র যেমন পিতাকে ডাকে, ছাত্র যেরূপ গুরুমহাশয়কে ডাকে, ভক্ত সেরূপ ডাকিতেছেন না; প্রেমিকা যেরূপ প্রেমিককে ডাকে, ভক্ত হরিকে সেইরূপ ডাকিতেছেন। "বিহরতি হরিরিব সরস বসন্তে।"—জয়দেব]" ইত্যাদি

এই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের মনে অস্পষ্ট কবিতার উপর যে বিতৃষ্ণা ছিল তাহা "মন্ত্র" কাব্যের "সুখমৃত্যু" নামক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়—

"আমি যবে মরিব আমার নিজ খাটে গো, * * *
(যেন) রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ।"

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কথা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর বিশ্বাস ছিল, সেই জন্য তিনি আমরণ সেই কথাটি প্রচার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৩১৪ সালের সাহিত্য পত্রে 'উপমা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন—"সাধারণতঃ এইটি বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে কবিতা যত সহজ ততই মর্ম্মস্পর্শী হয়, আর যে নিজে সুন্দরী তার তত আভরণের দরকার হয় না।"

এই বাদানুবাদের শেষ কথা আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের "আলেখ্য" কাব্যের ভূমিকায় শুনিতে পাই। তিনি লিখিয়াছেন—"তার পরে ভাব। এই খানেই গোল। এখানে আমার বক্তব্যটি জোর করে' বলতে গেলে অনেক তর্কপ্রিয় ও ব্যঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি তর্ক ও ব্যঙ্গ কর্ব্বেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক বা ব্যঙ্গ কর্ত্তে আমার আপত্তি নাই। তবে কোন বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকায় এই লেখকদের সঙ্গে আমার তর্ক বা ব্যঙ্গ কর্‌বার প্রবৃত্তি নাই। সেই জন্য এই কবিতাগুলির ভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিজের নীরব থাকাই ভালো। তবে এটুকু আমার স্বীকার করায় দোষ নাই যে এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে, তার মানে দশজনে দশ রকম বের করে' তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে। কোন কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বল্‌বো যে সেটা আমার ভাষার দোষ, 'বৃহৎ ভাব' দাবী কর্ব্ব না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণা কর্ত্তে পারি সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি, আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যে অস্পষ্টতা সম্বন্ধে আর মাসিক সাহিত্যে প্রবন্ধ লিখিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। কেবল তাঁহার 'ত্রিবেণী' কাব্যে ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিত কয়েকটি অস্পষ্ট কবিতার নমুনা দিয়াছিলেন।

এই বিবাদ-বিসম্বাদ-অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার বহুদিন পরে এই ঘটনার আলোচনা করিয়া সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় "বঙ্গবাণী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"সংপ্রতি ইয়োরোপে, যখন সাহিত্যশিল্পে সর্ব্বত্র প্রকৃতবাদে (Naturalism) আদর্শ হইতেছে, তখনই এরূপে ভণ্ডভাব, কষ্টকল্পনা, ভাসা ভাসা ছলনা এবং পাঠককে প্রবঞ্চনা করার একটা 'চোখ দেখা' হুজুগেই আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। যে কবিতা জীবন হইতে, বা কোনরূপ সত্য কিংবা অর্থের সম্পর্ক হইতে যত অধিক দূরবর্ত্তী হইতে পারে, অথবা অর্থের উপরে অবগুণ্ঠন পরিয়া যতই মেয়েলী ভাব দেখাইতে চাহে, তাহার মাহাত্ম্য ততই যেন গভীর এবং অলৌকিক বলিয়া মনে করার ঝোঁক আমাদের মধ্যে পূজা লাভ করিতেছে। * * * বঙ্গসাহিত্যে এমন শক্তিধর এবং সৌভাগ্যজন্মা পুরুষ কে আছেন, যিনি এই বিপত্তি হইতে সমুচিত দৃষ্টান্তে বঙ্গসাহিত্যকে রক্ষা করিতে পারেন। এই ভণ্ডতা এবং ভাবোন্মত্ততা, এই Prettiness বা 'মেয়ে মুখো' এবং 'মুখ চোরা' ভাবই যে সাহিত্যে শালীনতা বা ভব্যতার একান্ত লক্ষণ নহে, উহা কথায়—কার্য্যে প্রমাণিত করিতে পারেন। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল কথায় কার্য্যে এ বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিলেন। * * * ঋজুতা, বস্তুভিত্তি এবং ভাব সংযম, এ সমস্ত 'ক্লাসিক' আদর্শের কাব্যশিল্পের প্রধান শক্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্লাসিক আদর্শে পরিচালিত হইয়াই, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের অত্যন্ত প্রবল অস্পষ্টতা আদর্শের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; উচিত উপযুক্ত সময়েই

করিয়াছিলেন। এককালে, জর্ম্মন সাহিত্যের ভাবুক বা রোমান্টিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কবি হায়েন যাহা সমাধা করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের সমক্ষেও সে প্রকৃতির সমস্যাই উপস্থিত ছিল। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অসহায়, এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের উদ্যোগ-শক্তি কিংবা অস্ত্র-সম্পত্তিও পর্য্যাপ্ত ছিল না। তবে এই বিদ্রোহ ঘোষণার ফল উত্তরোত্তর শুভদায়ী হইতেছে। • • •

"আমরা জানি দ্বিজেন্দ্রের উক্ত কার্য্যকে নানা জনে নানা ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে কেবল দলাদলির ভাব কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলিয়া কটাক্ষ করিতেও কসুর করে নাই। * * * এখন দ্বিজেন্দ্রলাল নাই সুতরাং আলোচনার মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিগত 'ফোঁড়' থাকিলেও তাহা অন্তর্হিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি দ্বিজেন্দ্রের স্বকীয় শিল্প আদর্শের হিসাবে, উক্ত রূপ প্রতিষেধ উচ্চারণ না করাটাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিজের বিপরীত সাহিত্য আদর্শকে কেবল মূকার্পিতাঙ্গুলি সংখ্যয়ৈব 'পাশ কাটাইয়া যাওয়া' তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। বরং এই কাব্যে তাঁহার স্বকীয় বিশ্বাস অনুগত সাহসের পরিচয়টিই পাইতেছি! উহা হইতে বঙ্গসাহিত্যের লাভ দাঁড়াইয়াছে। আর আত্মপ্রতিষ্ঠা হইলেই বা কি? * * *

"বরঞ্চ দ্বিজেন্দ্রলালের এই কার্য্যকে আমরা বঙ্গসাহিত্যের একটি সবিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়াই মনে করি। বঙ্গসাহিত্যে দুইটা ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকিবে, যদ্দারা এই সাহিত্যের জীবন বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। অশেষ শুভই সাধিত হইয়াছে। প্রথম হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দ্বারা হৃদয় খুলিয়া মধুসূদনের সমর্থন; দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক হৃদয় খুলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রণালী-বিশেষের প্রতিষেধ। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আসন্ন পক্ষগণের কিছুমাত্র লাভ

নাই ; বরং ব্যক্তিগত প্রীতি-সম্পর্কের হিসাবে সবিশেষ ক্ষতি। * * * কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের পাঠকসংঘ বিশেষতঃ এই সাহিত্যের সেবকবৃন্দ উক্ত কার্য্য হইতে যথেষ্ট মতে লাভবান্ হইয়াছে। এই লাভের সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটিতে এখনো বিলম্ব আছে। * * এই বিদ্রোহ অত্যন্ত সুসময়ে উত্থিত হইয়া * * যাহাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তাহাদের অনেকেই সতর্ক হইয়া গিয়াছে!

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহস করিয়া বলিয়াছেন, কাব্যে ন্যায় শাস্ত্রটাকে মানিয়া চলা একান্ত আবশ্যক—এবং রবীন্দ্রনাথ সময় সময় ন্যায়শাস্ত্রকে পদদলিত করেন। রবীন্দ্রনাথও ততোধিক সাহসের সহিত বলিয়াছেন ন্যায় শাস্ত্রকে মানিয়া চলিতে গেলে সকল সময় ভাল কবিতা হয় না। উভয় সাহসিকতার মধ্য হইতেই আমরা লাভ উদ্বৃত্ত করিয়াছি।"

শশাঙ্কমোহন বাবুর উক্ত মন্তব্যের আমরা সর্ব্বোতভাবে সমর্থন করি। পর পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করিব।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

কাব্যে নীতি

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যে অস্পষ্টতা সম্বন্ধে আর মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলেও "কাব্যে নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৩১৬ সালের সাহিত্য পত্রের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, প্রকাশিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের আভাষ দিবার জন্য উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন। * * কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই, সব নায়ক, আর নায়িকা। * * আর তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ, নয়ত টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। * * ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয় দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক। * *

"উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্র বাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। "সে আসে ধীরে", "সে কেন চুরী করে চায়", "তুজনে দেখা হ'লে" ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান সবই ইংরাজী কোর্টশিপের গান। তাঁহার "তুমি যেওনা এখনই", "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না" ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান।

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপগানে মৌলিকতাও নাই। শয্যা রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ। * * রবি বাবুর খণ্ড কবিতাও ঐ একই রূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়। * * এ সম্বন্ধে একটি বড় উদাহরণ না দিলে চলে না। রবীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্গদা কাব্যটি লউন।" * * মহাভারতের বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই; অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমানা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। * * এ গল্পটি রবীন্দ্র বাবুর বড়ই গন্থময় বোধ হইল। * রবীন্দ্র বাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। কোর্টশিপ নহিলে প্রেম হয়! এ কোর্টশিপে একজন সামান্যা ইংরাজ নারী সম্মত হইত না। কিন্তু একজন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন। রবীন্দ্র বাবু অর্জ্জুনকে জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। * * তাহাই বুঝি যে এই কাব্য দুর্নীতিমূলক হউক, ইহা মনুষ্যস্বভাবের এক খানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম, সব দেশেই নারী জাতির সম্পত্তি। একজন কুলাঙ্গনাকে এরূপ নির্লজ্জ কুলটা করিতে হইলে * * কেন সে কুলটা হইল, তাহা দেখান চাই। * রবি বাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও আয়োজন দেখান নাই। * রবীন্দ্র বাবুর

গ্রহ উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন। * * অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে, কিন্তু অধর্ম্ম ভয়ানক। ঘরে ঘরে 'বিদ্যা' হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়, কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য্য। আর রবীন্দ্র বাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

"আমি "চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমাছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পরে এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।

"কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্র বাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা না করিয়া কি হরিঘোষকে আক্রমণ করিব? তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। * রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। * বরিবাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিতেছেন।"

এই প্রবন্ধের উত্তর রবীন্দ্র বাবু দেন নাই। তাঁহার বন্ধু মনস্বী সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় ১৩১৬ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্যে চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সেই সুদীর্ঘ প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য এই—

"প্রকাশ হইবার কালেই আমরা চিত্রাঙ্গদা পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রথম শ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাষা-ভঙ্গীর মৌলিকতায়, শব্দ-রচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতায়, নাট্যগুণে এবং সর্ব্বশেষে নিছক কবিত্ব-রসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত একটি দুর্ল্লভ রত্ন বলিয়াই জানিয়াছিলাম। * * শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের * * মন্তব্য পাঠ করিয়া * * * আমাদের পূর্ব্বধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত পাইয়াছে এবং আমাদিগকে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে, যে "দুর্নীতি" এবং "অস্বাভাবিকতা" দ্বিজেন্দ্র বাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? * * * দ্বিজেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা বিবাহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। * * কাব্য পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় এবং বুঝিতে হইবে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হইয়া অর্জ্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। * * চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য। অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা সঙ্কোচ শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই—তাহার চরিত্র পুরুষের ন্যায় গঠিত হইয়াছিল। * * দ্বিজেন্দ্র বাবু সমস্ত কাব্যখানি ভুল বুঝিয়াছেন। * * আমরা ত কাব্যের কোথাও দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথিত * * নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণনা দেখিলাম না। * * * দ্বিজেন্দ্র বাবু courtshipএর উপর একেবারে খড়্গহস্ত। * * বাল্যবিবাহেও দাম্পত্য প্রেম জন্মিবার আগে courtship আবশ্যক এবং হইয়া থাকে—তবে তাহা বিবাহের পূর্ব্বে নয়। * * courtship কথাটা ইংরাজি হইলেও পদার্থটি আর কিছুই নয়—আমরা যাহাকে

পূর্ব্বরাগ বলি। * * দ্বিজেন্দ্র বাবু নীতির দোহাই দিয়া রবি বাবুর যে সকল নির্দ্দোষ ও পবিত্র গানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এই পূর্ব্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ। * * আমাদের এমন আশা আছে যে * * দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবি বাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতি থাকিবে ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে। তা' ছাড়া * * দ্বিজেন্দ্র বাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন "কানু বিনা গীত নাই।"

প্রিয়নাথ বাবুর এই প্রবন্ধেরও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া হিতবাদী পত্রে চিত্রাঙ্গদার প্রতিকূল-সমালোচনা বাহির হইল। এবং এই বাদ-প্রতি-বাদ নানা আকারে সাহিত্য-সংসারে প্রকট হইয়া উঠিল। "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের "কাব্য সমালোচনা" এবং অধ্যা-পক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" এই প্রসঙ্গে, ব্যঙ্গ কৌতুকের নমুনা। এই বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে গরলের প্রচুর উৎপত্তি হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩১৬ সালের "মানসী" পত্রিকায় (ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) প্রকাশিত "কাব্যে নীতি" এবং "কাব্যে অপহরণ" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় উল্লেখযোগ্য। সেই দুই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের উপর যেরূপ গালি বর্ষিত হইয়াছিল, বঙ্গের অপর কোনও কবি মাসিক সাহিত্যে কখনও সেরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বাদপ্রতিবাদে নিজে আর লেখনী ধারণ করেন নাই; পর বৎসর (১৩১৭ সালে) কেবল তাঁহার "কালিদাস ভবভূতি" শীর্ষক যে ধারাবাহিক সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে শকুন্তলার সহিত রাজা দুষ্মন্তের গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথাপ্রসঙ্গে আপনার মতের পোষকতা করেন। এই সমস্ত প্রতিবাদে ও নিন্দাবাদে তাঁহার মতের

যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই তাহা, তিন বর্ষ পরে, ১৩১৯ সালে, প্রকাশিত, তাঁহার "আনন্দবিদায়" নামক 'প্যারডি'র ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপই চাবকাইয়া ছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু; এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন না।"

এই 'আনন্দবিদায়' নাটিকাখানি প্রকাশিত হওয়াতে, মাসিক সাহিত্যাদিতে যে বিবাদের অগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিল। রঙ্গালয়ের দর্শকগণের এবং বঙ্গসাহিত্যের পাঠকবৃন্দের অনেকেই উহা রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যক্তিগত ও রুচিবিগর্হিত আক্রমণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"অর্চ্চনা" পত্রের পৌষ-সংখ্যায় জনৈক সমালোচক লিখিয়াছিলেন—"রবীন্দ্রনাথের 'দর্পহরণ' মানসে তাঁহাকে ও তাঁহার লেখনীকে আক্রমণ করিয়া এই কয় বৎসরকাল ক্রমাগত দ্বিজেন্দ্র বাবু অশ্রান্তভাবে কত যে ছড়া, পদ্য ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহার সংখ্যা নাই। অদ্যকার আলোচ্য এই "আনন্দবিদায়" নাটিকাও প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যে রচিত।"

এই উপলক্ষ্যে ১৩১৯ সালে "সাহিত্য" পত্রের মাঘ সংখ্যায় "সাহিত্যে চাবুক" শীর্ষক প্রবন্ধে "বীরবল"—দ্বিজেন্দ্রলালের "কাব্যে নীতি" প্রবন্ধের ও আনন্দবিদায়ের ভূমিকার বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা বাহির করিলেন এবং উহার ভূমিকায় লিখিলেন—"সে দিন ষ্টার-থিয়েটারে "আনন্দ-বিদায়ে"র অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত ও লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লোককে দর্শকমণ্ডলী লাঞ্ছিত করেছেন; এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই আনন্দ-বিদায়ের রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করেছিলেন।"

"সাহিত্য" পত্রের পরের সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩১৯ ; "মেঘনাদ" বীরবলের উক্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করিলেন—এবং তিনি 'সাহিত্যে নৈতিক চাবুক' প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এবং সেই প্রবন্ধের মুখবন্ধে লিখিলেন—"গত মাঘ মাসের "সাহিত্যে" "বীরবল" দ্বিজেন্দ্র বাবুকে "সাহিত্য চাবুক" সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। * * প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি "আনন্দ-বিদায়" রচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য দৈববলে জানিয়াছেন ; এবং তাঁহার জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় প্যারায় তিনি রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্র বাবুর লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া সমভাবে "দুঃখিত এবং লজ্জিত" হইয়াছেন। দুটি ব্যাপারই অমূলক।"

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে এই প্রসঙ্গে আর লেখনী ধারণ করেন নাই এবং এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-নাটকের এই অপ্রীতিকর অঙ্কের যবনিকা পতিত হইয়াছিল। এই বাদানুবাদের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় দ্বিজেন্দ্র যে দুর্নীতির প্রভাব হইতে বঙ্গ-সাহিত্যকে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি

বাণীভক্ত মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। কিন্তু সেই সূত্রে তিনি যে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা, সাধারণের চক্ষে, ব্যক্তিগত আকার ধারণ করাতেই তিনি তাঁহার গুণগ্রাহীদের সহানুভূতি হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে বঞ্চিত এবং নবীন লেখক-দিগেরও দ্বারা অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কবিদ্বয়ের স্তাবকগণ, যাঁহারা এই বিবাদের ব্যক্তিগত দিক্‌টাই অযথা প্রবল করিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধ হইয়া হয়ত অন্যদিকে লক্ষ্য করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিবাদ ব্যক্তিগত ভাবে দেখেন নাই। কিন্তু সে যাহাই হউক, তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার তথাকথিত মনোমালিন্য বিদূরিত করিবার পথ সুগম করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক মাসের 'বাণী' পত্রিকায় তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র সহৃদয় সমালোচনা প্রকাশ করেন, তখন অনেকে দুই বন্ধুর পুনর্মিলনের আশা করিয়াছিলেন। সেই কথা দ্বিজেন্দ্রের কাছে উপস্থাপিত করিলে দ্বিজেন্দ্র বলিতেন "রবি বাবু আমার বন্ধুই চিরকাল।" মধ্যে একবার "আনন্দ-বিদায়ের" ঘটনাচক্রে তাঁহার হৃদয়াকাশ অল্পকালের জন্য মেঘাচ্ছন্ন করে। সেই মেঘখণ্ড কাটিয়া যাইবার পর দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদাকাশের মত তাঁহার স্বাভাবিক নির্ম্মল সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলাল "ভারতবর্ষ" পত্র প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। সেই পত্রের লেখকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখিয়া সকলে পুনরায় আশান্বিত হইয়াছিলেন যে এইবার কবিদ্বয়ের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ পুনঃ স্থাপিত হইবে। পরে "ভারতবর্ষ" পত্রের সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা-যায়, যে দ্বিজেন্দ্র জীবিত থাকিলে তাঁহাদের সে আশা অচিরে সফল হইত। দ্বিজেন্দ্র ভারতবর্ষের সূচনা পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের শাসন

কর্ত্তারা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।" এই সরল সত্য বাক্যে যদিও কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই, কিন্তু এই উক্তি হইতে দ্বিজেন্দ্রের মনের গতি কোন্ দিকে ফিরিতেছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ত পরলোক হইতে দেখিতেছেন যে তাঁহার লেখনী-মুখে "ফুলচন্দন পড়িয়াছে"—তাঁহার কামনা সফল হইয়াছে—দুই বর্ষ না যাইতে যাইতে রবীন্দ্রনাথ সত্যসত্যই নাইট্ হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় "ত্রিবেণী" কাব্যের 'অবসান' কবিতায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই আমরা তাঁহার শেষ কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি তিনি লিখিয়াছেন—

"করেছি কর্ত্তব্য যাহা, সেই টুকুই আমার যাহা জমা ;
করেছি অন্যায় যাহা সেই টুকুই খরচ দিও বাদ।
তোমাদিগে যেটুকু দিয়াছি দুঃখ, করো ভাই ক্ষমা ;
তোমাদিগে যেটুকু দিয়াছি সুখ করো আশীর্ব্বাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসিনিক কর্ত্তে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই ;
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম অপরাধ ;
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি কোন দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশী হয়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ ;
জমা যদি বেশী থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ।"

এই বাদপ্রতিবাদটী, সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়া, ব্যক্তিগত অপ্রীতিপ্রসূভাবে দেখিয়া, সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনঃকষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ইহার আর একটি মহত্তর দিক্ আছে, সে দিক্

দিয়া দেখিলে এই ঘটনার জন্য অনুশোচনা করিবার কিছুমাত্র কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বাদ-প্রতিবাদের পর যদি রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার অনুচিকীর্ষু লেখকগণের মনের গতি বা রচনার ধারা, তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কিঞ্চিৎমাত্রও পরবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যের সেই মঙ্গলের সহিত তুলনায়, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত মনান্তরের কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়াই মনে হয়। সেইরূপ শুভঘটনা সাহিত্যে যে ঘটে নাই এ কথা কে বলিতে পারে? সাহিত্যিক বাদানুবাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে এবং সেই বাদানুবাদের ঘাতপ্রতিঘাতেই সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে উন্নতির মার্গে অগ্রসর করে। সমালোচকও নূতন জীব নহেন। বায়রণের যেমন জেফ্রী (Jeffrey) তেমনি কালিদাসেরও দিঙ্‌নাগ্‌ ছিলেন। লেখক আপনার ঝোঁকে সম্মুখস্থ কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি ধরিয়া লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া যান,—সেই আলোক-রশ্মির বাহিরের অন্ধকারে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পথের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান সমালোচক যেমন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন লেখক নিজে তেমন পারেন না। সেই কারণেই সমালোচকের সার্থকতা। লেখকের ও সমালোচকের বিচরণক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক্। লেখক যতবড়ই শক্তিশালী হউন না কেন, এবং তাঁহার রচনাশক্তির কণামাত্রও যদি সমালোচকের না থাকে, তত্রাচ সমালোচকের যদি নিজের গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য থাকে, তাঁহাকে হীন ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবার অধিকার কোন লেখকেরই নাই। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ ঘটে না; অধিকাংশ প্রতিভাশালী লেখকই তাঁহার স্বকীয় রচনা শক্তির তুলাদণ্ডে সমালোচককে পরিমাণ করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন, এবং অনেক সময়ে নিজের সেই দুর্ব্বলতায় সাহিত্যিক বিষয়কে ব্যক্তিগত

করিয়া তুলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের যে সেই দুর্ব্বলতা ছিল না—অথবা প্রতিবাদকারী মাত্রেই যে প্রকৃত সমালোচক পদবাচ্য সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু বর্ত্তমান বাদ-প্রতিবাদে দ্বিজেন্দ্রলাল অক্ষম সমালোচকও ছিলেন না, এবং তিনি যে সমালোচকের উচ্চ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়াই এই সাহিত্য-সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় বা অপর :কোনরূপ স্বার্থচিন্তায় প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, ইহা আমাদের ধ্রুব ধারণা। বিষয়টি সম্পূর্ণ-ভাবে সাহিত্যিক কিন্তু ভাগ্যচক্রে উহা ব্যক্তিগত আকার ধারণ করিয়া-ছিল; সে বিষয়ে কোন্ পক্ষ অধিক দোষী তাহা নির্দ্ধারণের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের মত বন্ধুর বন্ধুত্বে এবং তাঁহার মত শক্তিমান্ সাহিত্য-শূরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সাহিত্যের শুভানুধ্যানই উচ্চতর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহার সৎ সাহসের ও মহদুদ্দেশ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কবিস্বপ্ন-কুহেলিকাচ্ছন্ন (Romantic ও Mystic) আদর্শের সহিত বাস্তব ও পরিস্ফুট (Realistic) আদর্শের বিবাদ অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে; দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিবাদ বঙ্গ-সাহিত্যে সেই সংঘর্ষেরই একটি তরঙ্গ তুলিয়াছিল। আপাততঃ পাশ্চাত্য দেশে বাস্তব ও প্রস্ফুট আদর্শেরই জয় হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সেই প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যেও আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। এক হিসাবে এই ঘটনাকে আমরা দ্বিজেন্দ্রের অনুসৃত আদর্শেরই বিজয় ঘোষণা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু ইহা যে বঙ্গ-সাহিত্যের শুভপ্রদ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কারণ এই বাস্তব আদর্শের পারিপার্শ্বিক ভাবে প্রতীচ্য সাহিত্যের—বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্যের—দুর্নীতির আবিলতাও বঙ্গ-

সাহিত্যে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হইয়াছে। এই দুর্নীতি, দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবের দুর্নীতির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন তাহারই রূপান্তর মাত্র—ইহা আমাদের সাহিত্যের সুপরিচিত অশ্লীলতার মুক্ত পয়ঃপ্রণালী নহে; এ যেন মনোহারী কুসুমাস্তীর্ণ শ্যামল দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত ছদ্মবেশী পয়ঃপ্রণালী—ভিতরের পূতিগন্ধময় পঙ্ক সহজে লক্ষিত হয় না।

সেই হেতু এতদিন পরে আবার, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাহিরে' পুস্তক উপলক্ষ্য করিয়া, সাহিত্য-সভার সভাপতি মহাশয়ের বাৎসরিক অভিভাষণে, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতায় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মাসিক সাহিত্যে লেখকগণের প্রবন্ধাদিতে উক্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের রণ-নিনাদের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। কিন্তু এবার আর দ্বিজেন্দ্রলালের তূর্য্যধ্বনি নাই। সাহিত্যসভার গুরুগম্ভীর মৃদঙ্গরোলে, অথবা পণ্ডিত মহাশয়ের সুন্দরী-ভাষা-একতারার পৌনঃপুনিক ঝঙ্কারে বোধ হয় প্রতি-পক্ষের সাড়াই পাওয়া যাইত না; যাহা হউক অধ্যাপক প্রবরাদির যুক্তিতর্ক-করতালির আহ্বানে, মনীষী সবুজপত্র-সম্পাদক, প্রবীণ সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ প্রতিপক্ষ রথিবৃন্দ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একদল হুঙ্কার করিতেছেন 'সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষা', অপর পক্ষ হাঁকিতেছেন 'স্কুলমাষ্টারী আর যে করে করুক—সাহিত্য তা করবে না, সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্য্যবিকাশ,—রস-সৃষ্টি।' যুদ্ধ চলিয়াছে। কে বুঝাইবে যে যাহাতে সার্ব্বভৌমিক সুনীতি নাই, তাহা সৎ হইতে পারে না—এবং যাহা সৎ তাহাই সুন্দর—তাহাই সুরস।

———

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

রচনার বিশিষ্টতা

দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর অনেকেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায় সেই প্রশ্ন সমাধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যে স্থান নির্দ্দেশ করিবার ভার প্রধানতঃ কালের হস্তে নিহিত—কবির সমসাময়িক ব্যক্তিগণের হস্তে নহে। সুতরাং সেই অনিশ্চিত বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য পণ্ডশ্রম না করিয়া এস্থলে কবির রচনার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। দ্বিজেন্দ্রলালের ভিন্ন ভিন্ন রচনাবলীর পরিচয় দিবার সময় তাঁহার হাসির গান, নাটক, কবিতা প্রভৃতির বিশিষ্টতার কথা যথাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে সেই সকল মন্তব্যের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সেই বিষয়ে আর কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিব।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-প্রতিভা প্রধানতঃ চারিটি বিষয়ে প্রকট হইয়াছিল—(১) তাঁহার হাসির গানে ও ব্যঙ্গ-কবিতায়, (২) তাঁহার নাটকে, (৩) তাঁহার দেশ-প্রেমাত্মক সঙ্গীতে এবং (৪)—সাধারণ ভাবে—তাঁহার ছন্দে, ভাষায়, অভিব্যক্তির নূতন ভঙ্গীতে ও পুরুষোচিত শক্তিতে।

হাসির গানে ও ব্যঙ্গ-কবিতায় তিনি বঙ্গসাহিত্যে বিলাতী রহস্য-সঙ্গীতের ও পরিহাস কবিতার সুর, ছন্দ ও অভিব্যক্তির প্রথা বঙ্গীয়-কবিতার নিজস্ব করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র যে ভাবে ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও হাস্য বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ সুরুচিসঙ্গত পরিহাস-রসিকতা, অনাবিল রহস্যরস-রচনার ভঙ্গী বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে, আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে, তাঁহার

হাসির গানের আদর—ব্যঙ্গের প্রভাব—কমিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি হাস্যরসের যে নূতন ধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন সে কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবার নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, মহাশয় বলিয়াছিলেন "অদ্যকার সভার প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে, অনেকের মতে তাঁর (দ্বিজেন্দ্রের) হাসির গানই হচ্ছে বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয়-কীর্ত্তি। একথা যদি সত্য হয়—এবং আমার বিশ্বাস তা সম্পূর্ণ সত্য—তা হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার উজ্জ্বল আলো "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমির" বাইরেও পড়েছে। শুধু তাই নই—তাঁর দেশাত্মবোধের প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর হাসির গানের ভিতরই পাওয়া যায়। এদেশের নব্য আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, রমণীর সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র তার নাক, কান্, চোখ, তার অঙ্গসৌষ্ঠবের উপর নির্ভর করে না ; কিন্তু এ সকলের অতিরিক্ত "লাবণ্য" নামক একটি পদার্থ আছে, যা হচ্ছে সেই সৌন্দর্য্যের প্রাণ ও আত্মা। হাস্যরস সম্বন্ধে "লাবণ্য" শব্দটি প্রয়োগ করা চলে না, কিন্তু ঐ একই অর্থের একটি ফার্সি কথা আছে—নিমক্—যা বাঙ্গালীর একেবারে অপরিচিত নয়। যা জলোও নয়, মিষ্টিও নয়, অথচ অতিশয় মুখরোচক, তার সেই বিশেষ স্বাদটির নাম "নিমক"। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান কাব্য, কেন না তাতে "লাবণ্য" না থাকলেও "নিমক" আছে। এবং এ রসের রসিক বঙ্গদেশে পূর্ব্বেও ছিল, আজও আছে, আর আশাকরি ভবিষ্যতেও থাকবে, সুতরাং তাঁর হাসির গান বাঙ্গালা-সাহিত্যে অমর হবার সম্ভাবনা খুব বেশী।" ('সবুজপত্র'—আষাঢ়, ১৩২৩).

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসমূহ, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে উন্নত ও বিশুদ্ধ রুচির স্রোত প্রবাহিত করিয়া এবং নবীন ও ভবিষ্যৎ নাট্যকারগণকে

অনুকরণীয় উচ্চ আদর্শ দান করিয়া, বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যকে স্থায়ী উচ্চ-সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইবার মার্গে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চাঙ্গের নাটকাবলী, অভিনয় করিয়া বঙ্গের রঙ্গালয়-সমূহ শিক্ষিত-সমাজে যেরূপ আদর পাইয়াছে, তৎপূর্ব্বে সেরূপ পায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার নাট্যশালাগুলিকে বেল্লিকবাজার হইতে আনন্দবাজারে পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাট্যকাব্য 'পাষাণী' এবং গদ্যনাটক 'মেবার-পতন' 'নুরজাহান' ও 'সাজাহান' বর্ত্তমানে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের সমাদর যে কালজয়ী হইবে এবং দ্বিজেন্দ্রের নাটকাবলী স্থায়িসাহিত্যে স্থান পাইবে এরূপ আশাকরা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমাত্মক গান—কথা ও সুরের নূতন ভঙ্গীতে—মাতৃপূজার উপযোগী যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে সেরূপ সঙ্গীতের বাঙ্গালায় প্রচলন ছিল না। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শে সেই সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালীকে একটি অমূল্য সম্পদ দিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ছন্দে, গদ্যের ভাষায় এবং রচনার ভঙ্গীতে তাঁহার স্বকীয় বিশেষত্ব জাজ্বল্যমান—সেগুলিও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নূতন সম্পদ। দ্বিজেন্দ্র তাহার মনোভাব নিজস্ব পুরুষোচিত ভাবে ব্যক্ত করিবার উপযোগী করিয়া পদ্যে এক নূতন ভঙ্গীর মাত্রিক ছন্দ, এবং গদ্যে চলিত সহজ কথার সহিত গুরুগম্ভীর ও সঙ্গীতময় কবিত্বব্যঞ্জক বাক্য-যোজনা করিয়া এক অভিনব তেজস্বিনী ভাষার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই 'পদ্য ভাঙ্গিয়া গদ্যে'র ভাষা নবীন নাটক লেখকগণের আদর্শের স্থান অধিকার করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার বিশিষ্টতা—তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব*—প্রথম হইতেই প্রকট হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন "দ্বিজেন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যে যে একটি অপূর্ব্ব রস—বঙ্গভাষায় যে একটি নূতন প্রাণ আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে পৌরুষ এবং তাঁহার হাস্যের অভ্যন্তরে যে তেজ প্রকাশ পাইয়াছে—বিদ্রূপের চাপল্যের মধ্যেও সুগভীর সত্যকে রক্ষা করিয়া তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন তাহার আনন্দ আমি প্রথম হইতেই, যখন তিনি সাহিত্য-সমাজে অপরিচিত ছিলেন তখন হইতেই অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি।" (বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৪)।

দ্বিজেন্দ্রের ভাষা ও রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"Directness, ভাব সরলতা বা শব্দের নারাচগতি তাঁহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। * * শব্দের ও ভাষার এই নারাচগতির অন্তরালে একটু পরুষভাব থাকিবেই। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পারুষ্যকে অনুরাগের ভাব-মদিরায় এতটাই মধুর করিয়াছেন যে তাঁহার পারুষ্য কখনও কাহারও কর্ণে বাজে নাই। * * দ্বিজেন্দ্রলালের লেখায় আর একটি গুণ আছে, তিনি স্ফুটোক্তির সাহায্যে বিরোধালঙ্কারের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়া এমন একটি—অভিনব-রসের অবতারণা করিতেন যে শ্রবণ মাত্রেই পাঠকগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যাইত। ইহা ইংরেজী Climax ও antithesis এই দুইয়ের সমবায়ে প্রায়ই ফুটান হইত, অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা ও মালোপমার সম্মিলনে রসের সঞ্চার করা হইত। একটা উদাহরণ দিব :—

* এমন কি দ্বিজেন্দ্র ইংরেজী-শিক্ষার্থী বালকদের জন্য যে কয়েকখণ্ড "Lesson in English" নামক পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার স্বকীয় বিশেষত্বের ছাপ আছে।

'নারীর রূপ—যা—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান, নারীর রূপ যা—ইন্দ্রধনুর মত সেই আদি শুভ্র রূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ—যাহার মহিমায় পৃথিবী মদভরে মাথা উঁচু করে' স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কচ্ছে, যেন বলছে—দেখাও দেখি এর মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ—যার পদতলে সমস্ত বিশ্ব সৌন্দর্য্য এসে লুটিয়ে পড়ে, যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীতে বেজে উঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে উঠে, জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হয়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্য্যের কোমল কর স্পর্শে পশুও বশ হয়—সেই নারীর রূপ।'

"এ ভঙ্গীর লেখা তাঁহার নাটক সকলে অনেক আছে। এই ভঙ্গীর সাহায্যে তিনি ভাষায় একটা নূতন জোর, নবীন তেজ, একটা স্পর্দ্ধার শ্লাঘা ফুটাইয়াছেন। * * দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্বনির অনুপ্রাসে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ধ্বনির অনুপ্রাসের রাজা হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল বড় ছোট ছিলেন না। তাঁহার—"একি সরিৎরঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।" যে কোনও কবিকে শ্লাঘাযুক্ত করিতে পারে। * * "দান্তের মতন তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কবিত্বের প্লাবনে ডুবাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশিষ্টতা,—সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট, তাঁহার কাব্য নাটকের দোষ গুণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের দোষগুণ হইতেই নিঃসৃত—পটুতার অভাবজন্য নহে, আরাধনার ত্রুটীজন্য নহে, মনীষা ও প্রতিভার ন্যূনতা জন্য নহে। যদি কখনও তাঁহার নাটক, কাব্য, গাথা ও হাসির গানের বিস্তৃত সমালোচনা হয়; যদি তাঁহার সৃষ্টির বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের, মতামতের ভাব অভাবের বিশ্লেষণও আবশ্যক হইবে। * * তিনি তাঁহার বিশিষ্টতার ছাপ তাঁহার লেখার খুব চাপিয়া জাঁতিয়া দিয়া গিয়াছেন। (সাহিত্য—১৩২০)

পাঁচকড়ি বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"মানুষ আমরা নহিত মেষ"—

কথাটা খুব জোরের, খুব তেজের—সোজা, সাদা, চাঁচা ছোলা কথা ; কিন্তু ইহাতে কঠোরতা নাই, ইতরের রূঢ়তা নাই। দেশাত্মবোধের অনেক গান ত বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু সে সকলে বামাসুলভ যে কোমলতা ছিল, দ্বিজেন্দ্রের রচিত "আমার দেশ" এবং "আমার জন্মভূমি" গানে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির গড়ানে ভাব নাই। মমত্ব বোধের জোর জবরদস্ত বিকাশ একা তিনিই পারিয়াছিলেন। তাঁহার লিখন-ভঙ্গীর ইহাই বিশিষ্টতা। * * ইংরেজি ভাবের ও অভিব্যঞ্জনা-পদ্ধতির হাত হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই। * * দ্বিজেন্দ্রলালের লেখায়, গানে, ছড়ায়, ইংরাজি ভাব বিস্তর আছে। কিন্তু * * সে সকল যেন তাঁহার লিখনভঙ্গীর সহিত মিশিয়া থাপ থাইয়া গিয়াছে ; নাটক সকলের মধ্যে অনেক ভূমিকা ইংরাজি ছাঁচে ঢালা। কিন্তু সে ঢালা এত পরিষ্কার হইয়াছে যে সহসা ধরা যায় না। * * "মানুষ আমরা নহিত মেষ"—এই উক্তির ভিতরে ইংরেজি ভাষার ছাপ থাকিলেও উহা বেমালুম বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। আবার—"এই দেশেতে জন্ম আমার, এই দেশেতে মরি"—ইহা খাঁটি বাঙ্গালীর উক্তি—বাঙ্গালী ভাব, বাঙ্গালী কোমলতা যেন জড়ান মাথান রহিয়াছে ; ইহাকেই বলি ভাব ও শব্দ সামঞ্জস্য—স্বদেশ ও বিদেশের ঘাতপ্রতিঘাতে নবীন স্বদেশীয়তার সম্প্রসারণ, প্রতিভা না থাকিলে এটুকু হয় না। এ পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য প্রতিভা ছিল।" (মানসী, আষাঢ় ১৩২০)

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রের ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমাদের কাব্য ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী করিয়া তুলিবার আশায় যে সকল বঙ্গকবি নিজেদের প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই সকল কবির মধ্যে মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। কারণ ইঁহারা দুইজনে বঙ্গভাষার যে অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার

করিয়া গিয়াছেন; সে শক্তির কথা কেহ কখনও ভাবে নাই বা আশা করে নাই। এই মৃদু মোলায়েম ভাষায় যে দুন্দুভি বাজাইতে পারা যায়, মধুসূদনের পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিত না বা বিশ্বাস করিত না। এই কৃশাঙ্গী ভাষার ভিতর হইতে যে 'ড্রমের ঝর্ঝর রব বাহির করা যাইতে পারে; এ কথা দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতে আমরা যে তেজ, যে পৌরুষ (Masculinism) দেখিতে পাই, সেই তেজ, সেই সজীবতা, সেই পৌরুষ, দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। ইহাই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

"বঙ্গভাষায় এই পৌরুষের ভাব যদিও বিবেকানন্দের বীরবাণীতেই সর্ব্ব প্রথম আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু জনসাধারণে তাহার সংবাদ রাখে না। বিবেকানন্দের হস্তে যাহার উন্মেষ হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা প্রভাবেই তাহা বিকশিত হইয়াছে। * * *

"দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা-রীতির এক প্রকার বেশ খোলাখুলি সরল ভাব আছে, যাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা কবির স্বভাব হইতে উৎপন্ন। * * আত্মস্বভাবের ছায়া থাকায়, উহা যেমন তাঁহার কাব্যের একটা গুণের কারণ হইয়াছে, তেমনই উহা দোষের কারণও হইয়াছে। তিনি তাঁহার নাটকান্তর্গত পাত্র পাত্রী হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার ছোট বড় স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় প্রত্যেক চরিত্রেই তাঁহার আত্ম-প্রকৃতির ছায়া পড়িয়াছে। জীবনে ও সাহিত্যে এমন ঐক্য অতি অল্প কবির মধ্যেই দেখিয়াছি।

"দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের আরও একটি বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। সে উপকার আমরা তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি

হইতে পাইয়াছি। বঙ্গদেশে যখন কবিতা ও হেঁয়ালীর ব্যবধান ক্রমশঃ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু স্বকীয় সুন্দর সুস্পষ্ট কবিতায় নহে যুক্তিপূর্ণ ও সুতীব্র সমালোচনার দ্বারা তাহা শাসন সম্মার্জ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।" (অর্চ্চনা, আষাঢ়, ১৩২০)

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্, কবিভাস্কর, "বঙ্গবাণী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট ছবিগ্রহণের শক্তি, ঋজুতা, বাস্তব বুদ্ধি এবং প্রমোদ-আনন্দের পরিচয় আছে, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের মধ্যে দুর্লভ! গদ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই উহার প্রাক্‌ভাস লাভ করিতেছি। এ সমস্ত গুণও সাহিত্য-লোকে পরম মহার্ঘ! এই গুণ-সমষ্টি যথোচিত মতে প্রমূর্ত্ত হইলে, কবিকে পাঠকের হৃদয়ে অমর পদবী প্রদান করিতে পারে। বলিতে কি, দ্বিজেন্দ্রলাল নানাদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী।

"দ্বিজেন্দ্রের 'এবারত' বা রীতির মধ্যে যেমন একটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাঁহার চরিত্রাঙ্কণ-প্রণালীর মধ্যেও তেমনি একটা সুমার্জ্জিত সীমা পরিচিহ্ন এবং রেখা ব্যবহারের প্রণালীও বোধগম্য! সময় সময় দৃঢ় চঞ্চল অথচ বৃহৎ তূলিকা সঞ্চালনে বর্ণসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করার অপরূপ ক্ষমতাও প্রত্যক্ষ হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে এই জাতীয় আর একজন শিল্পী গিয়াছেন—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। এ সাহিত্যে বঙ্কিম-গুণের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল। এ কারণেই দৃঢ় এবং বৃহৎ তূলি-শিল্পী, স্পষ্ট-শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গ-সাহিত্যের সূক্ষ্ম-শিল্পী এবং রেখা-আভাস শিল্পিগণের অস্পষ্টতা শিল্পিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

"দেশপ্রাণতা এবং জাতীয়তা! নীতি, ধর্ম্ম এবং সমাজের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ! দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি এই সকল আদর্শের ভাবোজ্জ্বল

প্রতিমূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালীকে যেই শিক্ষাদান করিয়াছে, সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই রূপে লোকশিক্ষক হওয়াও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এই সকল নাটক চিরকাল বাঙ্গালীর সমুন্নত ভাব প্রয়োগের গুরু এবং সহযাত্রী হইয়া থাকিবে! কবি এইরূপ পুণ্যব্রত লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে উহাদের মধ্যে মনুষ্যহৃদয়ের কিংবা তাহার মেরুদণ্ডের অবসাদক কোনরূপ পরামর্শ বা ইঙ্গিত ইসারাও মুখ দেখাইতে পারে নাই; নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় He uttered nothing base। দ্বিজেন্দ্র যে সমস্ত দৃশ্যপরিকল্পনাসাহায্যে এই সকল নাটকের ভাবপ্রাণতা সিদ্ধ করিয়াছেন, সে সমস্ত অনেক দিকেই বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। * * *

"নির্জ্জলা দুরাত্মতা কোনরূপ পুণ্যস্পর্শহীন দুর্বৃত্ত-চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে নাই! দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুকরসিক, কিন্তু এই কৌতুক ততটা বুদ্ধি-অধিকারের নহে; তাঁহার হাস্যোল্লাস সর্ব্বথা হৃদয় হইতে, নিজের সদয় সহৃদয়তা হইতেই উৎসারিত। তিনি বারবনিতাকে পর্য্যন্ত মহত্ত্বের আলোকে মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই লক্ষণ টুকুর মধ্যেই লোকটির অধ্যাত্মচরিত্রের রহস্যতত্ত্ব নিহিত আছে। * * * তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যেও নিখুঁত দুরাত্মা বা 'লেডী-ম্যাকবেথ' জাতীয় স্ত্রী নাই! রমণী জাতির প্রতি একটা অন্তর্নিহিত সম্মানের ভাব হইতেই যেন তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলি অঙ্কিত। * * *

"দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ সঙ্গীত কবি। * * * অনেক সময় তিনি সঙ্গীতপ্রতিভায় লীলাসূত্ররূপেই যেন এক একটি দৃশ্য গ্রহণ করিয়াছেন; এবঞ্চ সঙ্গীতগুলির সার্থকতা উদ্দেশ্যেই দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় পাত্রগুলির কথা বার্ত্তার মধ্যেও অনেক স্থানে সঙ্গীত জাতীয়, উচ্ছ্বাস এবং রসোদ্গারই লক্ষ্য

করিবেন, সময় সময় এক একটি কথা অপরূপ বিদ্যুৎ-বিভাসের ন্যায়, সঙ্গীতের আকস্মিক আভোগ মূর্চ্ছনার ন্যায়, উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট করিয়াই হয়ত অচিরে বিলীন হইতেছে! এ সমস্ত নাটকের বাক্য-রীতির মধ্যেও, সর্ব্বত্র যেমন একটি তীক্ষ্ণ দীপ্তি এবং স্বপ্ন-বিজ্ঞানযুক্ত স্ফূর্ত্তি আছে যে, সঙ্গীতের আকস্মিকতা দেখাইয়া, মুহূর্ত্তমৃত সঙ্কেত বা ক্ষণভঙ্গুর আভাস মাত্র দিয়াই হয়ত উহা ম্রিয়মাণ হইতে থাকে!"

বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের অতুল্য শোকগাথা—"এষা" কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বদেশীর মুখেই দু'চারিটি সঙ্গীতে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সোণার বাংলা' তাহাদের অন্যমত। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ', বোধহয়, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই দুইটি সঙ্গীতই প্রকৃত কাব্য। * * * বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া বঙ্গমাতারই কল্পনা করিয়াছিলেন সত্য! কিন্তু তাঁহার মানস-নেত্রোদ্ভাসিতা দেব-প্রতিমা নানারূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্না হইলেও, তিনি যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের দেবতা; বিশিষ্ট দেশের বা বিশিষ্ট কালের নহেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' সম্বন্ধেও এই কথা। এই সঙ্গীতে কবি বাঙ্গালার জীবনেতিহাসে গাঁথিয়া দিয়া, বাঙ্গালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেগুলি মূল রসের অবলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে,—"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ" এই অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাসে এই অপূর্ব্ব ত্যাগে ও স্পর্দ্ধায়। আর ফুটিয়াছে যখন কবি দেশ-মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,— "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।" এই ভাব ও ভক্তি কোন দেশে বা কালে আবদ্ধ নহে, ইহা স্বদেশ-প্রেমিকের

সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ভাব। * * * যে তেজ, যে গর্ব্ব, যে স্পর্দ্ধা, যে ভক্তি, যে নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও নিঃশেষ আত্মদান দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আর কোথাও জাগে নাই। বিশ্বজনীনতার জন্যই এই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য।"

বঙ্গ-সাহিত্যের নির্ভীক ও বিচক্ষণ সমালোচক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহারা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অন্যতম। প্রতিভার বিচারে তাঁহার স্থান কত উচ্চ ভবিষ্যৎ তাহা নির্ণয় করিবে। কিন্তু উপযোগিতা ও উপকারিতায় এ যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিদ্বন্দ্বী অত্যন্ত অল্প। দ্বিজেন্দ্র স্বদেশী ভাবের স্রষ্টা। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ভাবরাজ্যে নূতন ভাব-সন্ততির স্রষ্টা। তাঁহার চিন্তায়, কল্পনায়, জ্ঞানে, ধ্যানে স্বদেশ—তাহাই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। তাঁহার নাটকের মেঘমন্দ্রে এবং কবিতা ও গানের ঝঙ্কারেও সেই মূলমন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হই। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে সৃষ্টিকুশলী মহাকবি ও রসজ্ঞ সহৃদয় ভাবুক। * * * তাঁহার দেশাত্মবোধ প্রগাঢ়—তাঁহার জীবনে তাহাই ধ্রুব সত্য। তাঁহার রচনার সেই দেশাত্মবোধের পূর্ণ অভিব্যক্তি। দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রতিভা নবযুগের মন্ত্র লইয়া আসিয়াছিল। বাঙ্গালীকে সে মন্ত্র দান করিয়া সে প্রতিভা চরিতার্থ হইয়াছে। * * * আজ যে গৃহাশ্রমের নবীন অতিথি শিশু হইতে পরপারের যাত্রী পর্য্যন্ত সকল বাঙ্গালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—'আমার দেশ'—তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের দান।" (বাঙ্গালী, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩)

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:o:—

স্বদেশ-প্রেম

যাঁহার দেশপ্রেমাত্মক সঙ্গীতে বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত, যাঁহার মাতৃ-বন্দনার ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রশক্তিতে বঙ্গ-সন্তান আজ অন্তরের অন্তরে তাহার জন্মভূমিকে "আমার দেশ" বলিয়া চিনিয়াছে, যাঁহার প্রতাপ সিংহ, মেবার পতন, দুর্গাদাস প্রভৃতি নাটক বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত করিয়াছে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর দিনাজপুরের অধিবেশনের সভাপতির আসন হইতে, তদীয় "বাল্য-বন্ধু, অনুজপ্রতিম" দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল বিয়োগে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন "তিনি (দ্বিজেন্দ্র) যদি 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' এই দুইটি গান মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন তাঁহার নাম অক্ষয় রহিত। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানে অনেকের স্থান কথনও হইবে না, তাঁহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য নই।" শেষে মাননীয় চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন "এই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা, তুমি যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিলে, তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে, এবং সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে তুমি তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।"

প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও টাউনহলের

দ্বিজেন্দ্রের শোক-সভায় সমগ্র বঙ্গ-সন্তানের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছিলেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল যে চোখে স্বদেশকে দেখতেন আমরাও যদি সেই চোখে দেখতে পারি, আমার জন্মভূমিকে 'আমার দেশ' জেনে দেশের কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি—সেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন।"

দ্বিজেন্দ্রের দ্বিতীয়-বার্ষিক স্মৃতিসভার সভাপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—"সকলগুলি রচনার মধ্যদিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দেশজননীর প্রতি অচলা ভক্তি, দেশবাসীদিগের জন্য অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশিত হইয়া কবিবরের অনাবৃত মস্তকটিকে লোকলোচনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। "বঙ্গ আমার জননী আমার" বলিয়া এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে তাহা ত জানি না। "সকল-দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" হৃদয়ের অন্তস্তলগত ভক্তিমন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত জল-তরঙ্গে দেশজননীর রাতুল চরণখানি কে এমন প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে বলিতে পারি না। "অতুল চির বিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম, শত নির্ঝর-ঝর্ঝর-ঝঙ্কারিত অবিরাম" বলিয়া দেশ-জননীর অতুলন শোভা সম্পদের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধমন হইয়া কে আর এমন করিয়া সকল অন্তর দিয়া গাহিয়া উঠিয়াছে জানি না ত!" (মানসী, আষাঢ়, ১৩২২)

'সাহিত্য-সম্পাদক, স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্যরস-সমুজ্জ্বল মধুর গানের রচয়িতা নন, তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি বাঙ্গালীর পথ-প্রদর্শক। তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের কবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ মহা-দেবের জটাজূট হইতে দেশ-ভক্তি ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটী

কোটী ভারত-সন্তানের, জীব মুক্তির সাধন দান করিয়া গিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে।" (বাঙ্গালী—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩)।

দ্বিজেন্দ্রলালের বালককালের কবিতা হইতেই আমরা তাঁহার দেশ-প্রীতির পরিচয় পাই। তাঁহার কৈশোর-রচনা 'আর্য্যগাথা—১ম ভাগে' তিনি মাতৃ-ভূমির "মনোমোহন মূরতি" মলিন, বীণার ঝঙ্কার নীরব, নয়নে অশ্রু দেখিয়া, ব্যথিতহৃদয়ে দেশ-জননীকে সাধিয়াছিলেন—

"লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার।"

বিলাতে প্রবাসকালে প্রকাশিত তদীয় Lyries of Ind পুস্তকেও "The Land of the Sun" কবিতায়, স্নেহ-ভক্তির আবেগে বিগলিত অন্তরে অধঃপতিতা ভারত-মাতাকে আমার দেশ (My land) সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"O my land ! can I cease to adore thee * * *
O dear Bharat ! my beautiful maiden
O sweet Ind ! Once the queen of world !"

বাল্য ও যৌবনের এই স্বদেশ-প্রীতি বয়োবৃদ্ধির সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া দেশ-প্রাণতার অমৃতরসে তাঁহাকে আমরণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি গায়িয়াছিলেন—

"তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব মহিমা,
এখনও তোমার গগন সুনীল উজল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনও তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্রে ;

এখনও ভেদি হিমাদ্রি জঙ্ঘা, উছলি যাইছে যমুনা গঙ্গা—
সেই সুধারাশি ঢালিয়া শতধা তোমার হৃদয়ে যাইছে বহি মা।
তুমি ত মা সেই 'সুজলা সুফলা'—এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে
পুষ্প তোমার শ্যামল কুঞ্জেও, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে,
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী, আমরা নিঃস্ব;
তুমি কি করিবে? তুমি ত মা সেই মহিমা গরিমা—পুণ্যময়ী মা!"

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতায় হাসির গানে, প্রহসনে, নাটকে, প্রবন্ধে, সঙ্গীতে গদ্য পদ্য সর্ব্ববিধ রচনাতেই তাঁহার দেশ-প্রীতির অবারিত উৎস শত মুখে উৎসারিত হইয়াছে। তিনি যে স্ব-সমাজের দোষ ত্রুটীর প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্বজাতির প্রতি মমত্ব-বোধের বিকাশ, আবার তিনি যখন দেশব্রত বীর-চরিত্রের ত্যাগের ও মহত্ত্বের আদর্শ-চিত্রসমূহ স্বদেশবাসীর নয়নপথে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তখনও তিনি দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়াই—সেরূপ করিয়াছেন। দেশ-ভ্রাতৃগণের দুঃখ-দৈন্যে মর্ম্মকাতরতা তাঁহার অগণ্য সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া শেষে যখন তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশেতে মরি",

তখন বুঝি তাঁহার দেশপ্রীতির চরমবাণী অন্তরের অন্তস্তল হইতে স্বতঃই উত্থিত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এক দিনের ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তখন কবিবর ৫ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। রবিবার প্রাতঃকালে আমরা অনেকে তাঁহার বসিবার ঘরে গল্পগুজব করিতেছি। সহসা দূর হইতে একটা সুর আমাদের কাণে ভাসিয়া আসিল। তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ পরিপ্লাবিত * * * দেখিলাম কতকগুলি

যুবক দলবদ্ধ হইয়া মাতৃনাম গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন, সঙ্গে শত শত লোক মন্ত্রমোহিত-চিত্তে সে সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহসমক্ষে আসিয়া সেই বিপুল জনস্রোত সহসা সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন সেই ভাবতরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তিন চারিবার জলদ নির্ঘোষে "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে গগন প্লাবিত করিয়া দিলেন। সেই দিন তাঁহার রক্তিম মুখমণ্ডলে মহাসমারোহের যে জ্বলন্ত জ্যোতির্ব্বিভা দেখিয়াছিলাম, তাহা এ দগ্ধ হৃদয়-পটে চিরজীবন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।" (সাহিত্য—১৩২০)।

দেবকুমার বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন—"তাঁহার (দ্বিজেন্দ্রলালের) মত সারাটি হৃদয় ঢালিয়া অকপটে জন্মভূমিকে যথার্থ জননীরই মত ভালবাসিতে ও পূজা করিতে আর কয়জনে পারেন অথবা জানেন, তাহা একমাত্র সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় পার্থিব প্রতিষ্ঠা সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, তুচ্ছ স্বার্থ-চিন্তায় বিস্মৃত হইয়া, তন্ময় সাধনায় স্বদেশের অকৃত্রিম কল্যাণ কামনা করিতে আমি অল্প লোককেই দেখিয়াছি।" (নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩২৩)।

স্বদেশ-প্রেমিক কবিকুলের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল জনসমাজে যেরূপ পূজা পাইয়াছেন, তাহাতে এ কথা কাহারও মনে উঠিতেই পারে না যে তাঁহার সেই স্বদেশপ্রাণতার উপর কাহারও কটাক্ষপাত হইতে পারে। কিন্তু তাহাও হইয়াছে। "আর্য্যাবর্ত্ত" (অগ্রহায়ণ, ১৩২০) লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশবাৎসল্য সাধারণতঃ রাজনীতিকের স্বদেশবাৎসল্য—কচিৎ কবির স্বদেশবাৎসল্য—কুত্রাপি স্বদেশ-প্রেমিকের স্বদেশবাৎসল্য নহে, অর্থাৎ যে স্বদেশবাৎসল্য সর্ব্বোত্তম তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ঠেলিয়া।"

এই যে বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া দেশের কুকুরকেও আদর করা—ইহাই স্বদেশ-প্রেমিকের স্বদেশ-বাৎসল্য। সমালোচকের দৃষ্টিতে দেশের যে দৈন্য লক্ষিত হয়, স্বদেশ-প্রেমিক সে দৈন্য বিষয়ে অন্ধ।"

আর্য্যাবর্ত্তের উক্ত মন্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি, ১ম—দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশের ঠাকুর ঠেলিয়া দেশের কুকুরকে আদর করিতেন না, ২য়—যাঁহারা সেরূপ করেন,—যাঁহারা "প্রেমের উচ্ছ্বসিত ধারায় সকল ত্রুটী আবৃত করিয়া দিতে পারেন"—তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেমই সর্ব্বোত্তম। প্রথম অভিযোগটি সত্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় অভিমতটি সত্য বলিয়া দ্বিজেন্দ্র স্বীকার করিতেন না।

সমাজের ভ্রম ত্রুটীকে ঢাকিয়া লইয়া বজায় রাখিবার চেষ্টাকে দ্বিজেন্দ্র স্বদেশ-প্রেম বলিতেন না—সঙ্কীর্ণতা বলিতেন। তিনি সেরূপ মতাবলম্বীদিগের ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আরো বলি, দেশী ময়লা অন্ধকারও ভালো,
এনোনা এনোনা দেশে বিদেশীয় আলো।" (কল্কি অবতার)

সামাজিক ব্যাধির নিরাকরণের চেষ্টাকেই দ্বিজেন্দ্র স্বদেশহিতৈষণা বলিতেন। সমাজকে উন্নত না করিলে স্বজাতির মনুষ্যত্ব লাভের আশা সুদূরপরাহত, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল। সেই মতের অনুসরণ করিয়াই তিনি সমাজের দূষণীয় আচারসমূহের প্রতি কখনও তীব্রভাষায় নিন্দাবাদ, কখনও বা ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ কশাঘাত করিয়াছেন। সেই কারণেই তিনি 'নুরজাহান' নাটকে হিন্দু সমাজের, জাতির কঠিন

নিয়মাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন, 'সীতা' নাটকে ব্রাহ্মণগণের শূদ্রের প্রতি ব্যবহারকে অন্যায় অত্যাচার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করাকে হিন্দুজাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'প্রতাপসিংহ' নাটকে বংশগৌরব বা নিজের ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে স্বদেশকে বড় বলিয়া বিবেচনা না করিলে প্রতাপের মত বীরেরও দেশপ্রাণতা ফলদায়ক হয় না এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই নীতির সম্প্রসারণেই তিনি 'মেবার পতন' নাটকে জাতীয় প্রেম হইতে বিশ্বপ্রীতিকেই গরীয়সী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শেষোক্ত সূত্রটি ধরিয়া মনস্বী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-ভক্তির এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংরেজী সমাজ ধর্ম্মের গুণপ্রধান অংশটা ধরিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে তিনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব অনেকটা বুঝিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের এই পরিচয়ের ফলে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সৌন্দর্য্যটুকু আধুনিক Humanitarianism বা মানবপ্রীতির মাধুরীটুকু বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিতে পারিয়াছিলেন। * * হাসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে, সে মমত্ববোধ "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গানে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই মমত্ববোধের স্ফুরণ হইয়াছে দেশাত্মবোধে; দুর্গাদাস ও রাণাপ্রতাপ নাটকে এই দেশাত্মবোধ ষোল কলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার * * ভারতবর্ষের প্রতি মমত্ববোধ ঘটিলেই উহা বিশ্বব্যাপী হইবেই। "নুরজাহান", "সাজাহান" প্রভৃতি নাটকে জগদ্ব্যাপিনী প্রীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিলাতী Humanitaria-

nism টুকু স্থানে স্থানে ঠিক বিলাতী ঢঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। প্রীতির এই জগন্ময়তাকে আত্মময়রূপে প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার অবসর দ্বিজেন্দ্রলালের হয় নাই। ভাবের এই উচ্চতম স্তরে পৌছিবার পূর্ব্বেই বিধাতা তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গিয়াছেন।" (সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২০)

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশ-প্রীতিকে বিশ্বপ্রেমের প্রথমস্তর বলিয়া মনে করিতেন, সেই জন্য বিজাতিবিদ্বেষমূলক বিদেশী-দ্রব্য বর্জ্জন বা বয়কটকে তিনি দেশ-প্রেমের প্রতিকূল ও দূষণীয় বলিয়া মনে করিতেন। রবীন্দ্র-নাথের "গোরা" পুস্তকের সমালোচনাকালে দ্বিজেন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন "বিজাতি-বিদ্বেষ দেশানুরাগ নহে।" দেবকুমার বাবু লিখিয়াছেন, "স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় আমাকে একদিন কবিবর বলিয়াছিলেন 'এদেশ আজ যদি পরপ্রসঙ্গ ও বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত কল্যাণ সাধনে তৎপর হয়, তবে এজগতে এমন কোনও শক্তিই নাই যে, তাহার সে বলদৃপ্ত গতির রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ অশোভন আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষাগুরু— যাহাদের কৃপায় ও পুণ্যবলে আমাদের আজ এই যা' কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আমাদের এই অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে ততদিন আমাদের উদ্ধারের কোনও উপায়ই আমি দেখি না।" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই দ্বিজেন্দ্র দেশের তথা-কথিত "নেতা"দিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"হারে মূঢ় ইংরাজদিগে গালি দিয়ে, দেশের প্রতি দেখায় না ক ভক্তি,
দেশভক্তি নয়ক ছেলে খেলাটি এ, সেখানে চাই প্রাণ দেবার শক্তি।"

ভণ্ড বয়কট্ প্রচারকদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন—

"কেউবা বলে শোন সবাই বাণী—রাখব না আর বিজাতীয় চিহ্ন;
অর্থাৎ কিনা হুইস্কি এবং সোডাপানি, ম্যানিলা ও ভিনোলিয়া ভিন্ন।"

যাঁহারা মুখে "স্বদেশী" "স্বদেশী" করিতেন, অথচ যেরূপ স্থলে সামান্য মাত্র স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে সেরূপ স্থলে "স্বদেশী" পালন করিতেন না, তাঁহাদের প্রতি দ্বিজেন্দ্রের দারুণ অভক্তি ছিল। একদিন তাঁহার জনৈক বিলেত-ফেরত উচ্চপদস্থ বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন "মুখে ত খুব স্বদেশী স্বদেশী কর তবে বিলাতি মদ খাও কেন?" উক্ত বন্ধুটি বাক্‌সর্ব্বস্ব দেশভক্ত ছিলেন না, প্রকৃতই একজন ত্যাগী ও কর্ম্মী দেশ-প্রেমিক ছিলেন; তিনি যথার্থই অন্তরে আঘাত পাইয়া উত্তর দিয়াছিলেন "দ্বিজু, এটা আমার weakness, কিন্তু তুমি মনে কোরো না আমি মুখেই 'স্বদেশী'; তুমি কি জান না আমি স্বদেশীতে দশ হাজার টাকা দিয়েছি?"—তিনি ধনকুবের ছিলেন না,—সহৃদয় দ্বিজেন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত বন্ধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

দেবকুমার বাবু বলেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশভক্তির ভিত্তি সার্ব্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশভক্তির পরম পরিণতি দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে এই সমগ্র মঙ্গলেচ্ছায়! তাঁহার দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর ঘৃণার উদ্রেক করে না। বলা বাহুল্য এই বিশেষত্ব টুকুই তাঁহার এবংবিধ রচনাগুলিকে অবিনশ্বর যশের অধিকারী করিয়া রাখিবে।" (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২২)

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে, যে "আর্য্যাবর্ত্ত" যে ভাবের দেশানুরাগকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সে আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। "আর্য্যাবর্ত্ত" কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় কবির বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু সে অভিমত স্বত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁহার সহিত একমত হইতেন না তাহা নিশ্চিত। অতএব দ্বিজেন্দ্র, যে স্বদেশপ্রেমকে, সর্ব্বোত্তম দূরে থাকুক, স্বদেশপ্রেমই বলিতেন না—সেই তথাকথিত স্বদেশ-

প্রেম লাভ করেন নাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রের গুণগ্রাহীদিগের পরিতাপের বিষয় কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্র যে আদর্শের স্বদেশ-প্রেম লাভ করিবার জন্য আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন—সে সাধনা তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে—বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজ তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমিকের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। অতএব এ বিষয়ের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের, কলিকাতার টাউন হলের অধিবেশনে আর্য্যবর্ত্তের উক্ত সমালোচনা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের "প্রকৃত সমালোচনা" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন এবং আর্য্যাবর্ত্তের উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম।

অতঃপর এই প্রসঙ্গে "আর্য্যাবর্ত্ত" দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি অপবাদের ঘোষণা করিয়াছেন সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিব। আর্য্যাবর্ত্ত লিখিয়াছেন যে দ্বিজেন্দ্র তদীয় 'এক ঘরে' পুস্তকে—"যে সমাজের অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিতপালিত হইয়াছিলেন সেই সমাজকে * * * লোকের চক্ষে ঘৃণিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন * * * পিতৃ-পিতামহানুসৃত ধর্ম্মকেই বিদ্রূপের লক্ষ্য করিয়া লোকসমাজে নিন্দিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক হইলে তিনি এরূপ করিতেন না।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'একঘরে' পুস্তকখানি দ্বিজেন্দ্র মনে দারুণ আঘাত পাইয়া প্রবল উত্তেজনার সময় লিখিয়াছিলেন—সুতরাং ঐ পুস্তকের ভাষা ও মতামতের অভিব্যক্তি যৌবনসুলভ চপলতা বলিয়া উপেক্ষা না করিলে দ্বিজেন্দ্রের উপর অবিচার করা হয়। সে কথা স্বীকার করিলেই আর্য্যাবর্ত্তের অভিযোগও ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত বলেন "কবির মৃত্যুর পর তাঁহার সাহিত্য-

সুহৃদ্ নর্ম্ম-সচিব, অন্তরঙ্গ বন্ধু বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—'ঐ গ্রন্থে (এক ঘরে) যে তীব্র ভাষায় সমাজিক অনেক ভণ্ডামির পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন তাহা প্রথম যৌবনসুলভ চপলতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবির অনেক রক্ষণশীল আত্মীয় বন্ধু প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ঐ কথায় স্থিতিশীল সমাজের লোকদিগের নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের আদর ও প্রতিপত্তি থাকিবে। দ্বিজেন্দ্রলাল সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, এবং স্বাভাবিক সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ করিতেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সত্যসত্যই বুঝি কালের প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়া ২৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'একঘরে' পুস্তকখানি এই প্রকার ভূমিকা লিখিয়া পুনর্মুদ্রিত করিলেন যে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনও যে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই পুনর্মুদ্রণ হইতেই পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০)

বিজয়বাবু যখন উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তখন তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে 'আর্য্যাবর্ত্ত' তাঁহার ঐ মন্তব্য হইতে প্রমাণ করিবেন যে দ্বিজেন্দ্র প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন না; কিন্তু আর্য্যা-বর্ত্ত সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা বিজয় বাবুই অধিকতর দায়ী বলিয়া বোধ হয়। "একঘরে" পুস্তকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে যখন 'চীন গেলে জাত যায় না, গোপনে অখাদ্য খাইলে জাতি যায় না—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, তখন বিদ্যা-শিক্ষার্থে বিলাত গেলে জাতি যাইবে কেন?' এ বিষয়ে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্রের মত-পরিবর্ত্তন হয় নাই একথা সত্য; তাঁহার জীবন-সায়াহ্নের রচনা 'বঙ্গনারী'তেও তিনি ঐ মত দেবেন্দ্রের মুখে প্রকাশ

করিয়াছেন—"না হয় একঘরে হব! * * * সমাজ একঘরে কচ্ছেন কাকে? না, যে প্রকাশ্যে মুর্গী খায়, যার বাপ অপঘাতে মরে—আর প্রায়শ্চিত্ত করে না। যার হৃদয় বালিকা-বিধবার দুঃখে কাঁদে, যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারে না, যার স্ত্রী না খেতে পেয়ে রাস্তায় বেরোয়, যে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যায়, তাকে সমাজ একঘরে কচ্ছেন। আর যে লম্পট ব্যভিচারী, জালিয়াৎ চোর, স্ত্রীঘাতক—যে তিন বার জেলখেটে এসেছে ইত্যাদি, এই সনাতন সমাজ তার মাথার উপর হাত বুলোয়! বিদ্যাসাগর হলেন একঘরে আর মোহান্ত হলেন পরম ধার্ম্মিক। না দাদা! আমি একঘরে হব।" এ মতের যে পরিবর্ত্তন হয় নাই ইহা প্রকৃত, কিন্তু বিজয়বাবুর উক্ত মন্তব্য হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ধরিয়া লইয়াছেন যে দ্বিজেন্দ্র "একঘরে" পুস্তকে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের উপর সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ যে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও দ্বিজেন্দ্রের স্থায়ী অভিমত। সে ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা দ্বিজেন্দ্রের জীবন ও রচনা উভয়ই অকাট্য সাক্ষ্যদান করে। "একঘরে"র পুনর্মুদ্রণ সম্বন্ধে বিজয়বাবুর যে উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা পাঠে জানা যায় তাহা প্রকৃত নহে, এবং আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি কয়েকজন তথাকথিত উন্নতিশীল-সম্প্রদায়-ভুক্ত স্তাবকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াই দ্বিজেন্দ্র ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ভূমিকা পাঠেও তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র লিখিয়াছিলেন "নানাদিক্ হইতে পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে ইহার ভাষা মোলায়েম করিয়া পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত করিব। কিন্তু দেখিলাম যে তাহা করিতে গেলে পুস্তকখানি আদ্যন্ত নূতন করিয়া লিখিতে হয়।" সে কার্য্য সময়সাপেক্ষ, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র নাটকাদি রচনা ফেলিয়া

রাখিয়া সেই "ছেঁড়া লেঠায়" সময় অপব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না— অথচ স্তাবকগণের 'জোর তাগাদা', কাজেই ভাষার আর সংস্কার হইল না—কিছু কিছু বাদ দিয়া যেমন পুস্তক তেমনই ছাপা হইয়া গেল। ভূমিকা পড়িলে ইহাই বোধ হয়।

বিজয় বাবু যে উক্ত মন্তব্যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র তাঁহার রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধুগণের সহিত স্বাভাবিক সৌজন্য-গুণে মিশিতেন, নতুবা তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল না,—দ্বিজেন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ ও আত্মীয় শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন তাহা বিজয় বাবুর সম্পূর্ণ ভ্রম। সকলেই জানেন দ্বিজেন্দ্র সেরূপ কপট ব্যবহার ঘৃণা করিতেন। বন্ধুদের সহিত মতান্তর হইলে দ্বিজেন্দ্র স্পষ্টই সে কথা বলিতেন, মুখে সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাদের মতে সায় দিয়া, ভিতরে ভিতরে 'একঘরে' ছাপাইয়া তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল নাই একথা জানাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেন না। হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মের উপর দ্বিজেন্দ্রের মমত্ববোধ না থাকিলে দ্বিজেন্দ্র সেই সমাজ ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেন—তাহার দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দিয়া সেগুলি নিরাকরণের চেষ্টা করিতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের রক্ষণশীল দলের অন্যতম অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) আমরণ হিন্দুসমাজের শুভ কামনা করিয়া গিয়াছেন। * * * আর্য্যাশ্রম-ধর্ম্মের বিলোপসাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। জাতি বা বর্ণ-নির্ব্বিচারে বিবাহাদির অনুষ্ঠান তিনি আবশ্যক বা সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেন নাই। * * * তিনি স্বীয়পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমারের উপনয়নসংস্কার করিয়াছিলেন, এবং আমায় একদিন বলিয়াছিলেন—'রক্তসংমিশ্রণের আমি আদৌ কোনও আবশ্যক বা উপকারিতা বুঝিতে পারি না।"

হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্যকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন তাহা তাঁহার যৌবনের একটি ঘটনা স্মরণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। কলিকাতার কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রথমে দ্বিজেন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। পাত্রী রূপে গুণে ও বংশগৌরবে তাঁহার পক্ষে প্রার্থনীয় ছিল। কিন্তু পাত্রীর অভিভাবকগণ ব্রাহ্মমতে ভিন্ন বিবাহ দিতে অসম্মত হওয়াতে সেই সম্বন্ধ দ্বিজেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করেন—তিনি হিন্দুমতে ভিন্ন অন্যমতে বিবাহ করিবেন না পণ করিয়াছিলেন। শেষে হিন্দুমতেই তাঁহার বিবাহ হয়। হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি উহার সংস্কার প্রার্থনা করিতেন। এবিষয়ে তাঁহার পরিণত বয়সের অভিমত "বঙ্গনারী" নাটকের নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথনে ব্যক্ত হইয়াছে:—

"দেবেন্দ্র। হুঁ! সনাতন হিন্দুপ্রথা তা হ'লে তুমি উল্টোতে চাও।

সদানন্দ। একটু চাই বই কি দেবেন্দ্র। সনাতন হিন্দুপ্রথা যদি একেবারে নির্ভুল হ'ত তাহ'লে এ জাতির আজ এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। এ প্রথার মধ্যে কেবল ধর্ম্মের পুণ্যরশ্মি নাই। এর মধ্যে অনেক অধর্ম্মের আগাছা [illegible] শিকড় গেড়েছে, তাদের উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন হিন্দুসমাজের দোষ দেখাইয়াছেন, তেমনি ব্রাহ্ম-সমাজের, বিলেতফেরত সমাজের, স্বজাতির সকল সমাজের ত্রুটীর পৃষ্ঠেই নিরপেক্ষভাবে তাঁহার বিদ্রূপের কশা বর্ষিত হইয়াছে। সমাজকে লোকের চক্ষে ঘৃণিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না—সংস্কার-সাধনে সমাজকে উন্নত ও পবিত্র করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ব্যঙ্গ" কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু! নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুধু নকলে।
যেথা আবর্জ্জনা, ধরি সম্মার্জ্জনী, তাই বলে আমি ত অন্ধ না;
যেখানে দেবতা, ভক্তিপুষ্প দিয়ে স্তুতি-ছন্দে করি বন্দনা।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখে হিন্দুধর্ম্মের মহত্ব ও ক্রটী উভয়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উভয়স্থলেই তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের উপর আন্তরিক মমত্ববশতঃই সেরূপ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। মেবারপতন নাটকে সগরসিংহ যখন বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়, যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া —সে দয়া শুদ্ধ মনুষ্যজাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাকেও বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে—সেই ধর্ম্ম এক কথায় ছেড়ে দিলে—মহাবৎ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, তুমি কি পাপ করেছো তুমি জান না।" তখন হিন্দুধর্ম্মের মমতায় উচ্ছ্বসিত হইয়াই তিনি সে কথা লিখিয়াছেন, আবার যখন সেই নাটকেই মহাবৎখাঁ বলিতেছেন "মুসলমান ধর্ম্ম আর যাই হোক্, তার এ মহত্বটুকু আছে যে, সে যে কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে নিতে পারে। আর হিন্দুধর্ম্ম? একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায়ও হিন্দু হতে পারে না।" তখনও সেই অনুযোগ-আক্ষেপের মধ্যে স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই প্রকট হইয়াছে। ঐ নাটকেই যখন রামায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তিনি অরুণ সিংহের মুখে শ্লেষোক্তি নিঃসৃত করিয়াছেন—"যিনি হিন্দু হয়ে রামায়ণ পড়েন নি, তাঁর মুসলমান হওয়াই ঠিক্।" তখন সেই উক্তি যে তাঁহার ভারতীয় কাব্যের গৌরবে আত্মগৌরববোধের অভিব্যক্তি তাহা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হয় না। যখনই তাঁহার রচনায় প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, তখনই তাঁহার মন্তব্যের অন্তস্তল হইতে স্বধর্ম্মে ভক্তির পীযুষধারা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র যখন তাঁহার গঙ্গাস্তোত্রটি রচনা করিবার অভিলাষ করেন, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে বলেন 'যদি প্রাণে ভক্তি আসে ত ঐ স্তোত্রটি লিখিবেন নতুবা লিখিবেন

না।' তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্র বলেন "আমার পিতামহ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন—আমার জননী অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের কন্যা—দেখি আমার ভক্তি আসে কি না?" এই আত্মশ্লাঘাতেও স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যখন জীবনসায়াহ্নে 'পরপারে' নাটকের শ্যামাভক্ত ভবানীপ্রসাদের মুখে 'মা মা' শব্দে ক্রন্দন করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই ক্রন্দন, সেই প্রার্থনা, সেই গীতি-উচ্ছ্বাস যে কবিজনসুলভ আবেগধ্বনি মাত্র, প্রকৃত স্বধর্ম্ম-বাৎসল্যের অভিব্যক্তি নহে, সে কথা বলিতে সাহস হয় না। তিনি গায়িয়াছিলেন—

"আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায় এই যে এসেছি তোমার কাছে।
নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা খেলা, হয়ে এল সন্ধ্যা বেলা
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসছে ধীরে বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা আর ত তোমায় ছাড়ব না মা
ও মা পরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।"

এই গান গায়িতে গায়িতে তাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ, নয়ন বাষ্পাকুল হইয়া আসিত—কে বলিতে পারে যে ইহা তাঁহার কূটস্থ ভক্তিমন্দাকিনীর বিগলিত ধারা নহে।

দ্বিজেন্দ্র তাঁহার অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রসময় লাহার নিকট একদিন কথায় কথায় কহিয়াছিলেন—'দেখ, এতদিনে মা মা বলে ডাকা অবধি এসে পৌছেছি, এর বেশী আর উঠতে পারিনি। ইচ্ছা আছে চৈতন্য-দেবের কথা লিখ্‌বো, কিন্তু এখনো তার উপযুক্ত হতে পারিনি—যদি আর বছর দশেক বেঁচে থাকি তা হলে বোধ হয় লিখ্‌তে পারবো?" মাতৃভক্ত

কবির সে কামনা পূর্ণ হইল না—সে দিন আসিবার পূর্ব্বেই স্নেহময়ী জননী তাঁহার আনন্দ-দুলালকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের!

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের দেশ-ধর্ম্মকে কি চক্ষে দেখিতেন এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতাভিমানী স্বার্থসর্ব্বস্ব শিক্ষিত-জনের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত তুলনায় স্বদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—তিনি বঙ্গীয় কৃষিজীবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"ওরে চাষী হারাস্‌নে তোর সবল দেহ, সরল জীবন,
সভ্যতার এই সংঘর্ষণে এসে।
হারাস্‌নে তোর শুদ্ধ হৃদয় বেশী বুদ্ধির জোরে পড়ে;—
ধনে মানে ফতুর হোস্‌নে শেষে।
হারাস্‌নে তোর সুস্থ ক্ষুধা, গাঢ় নিদ্রা মনের শান্তি
হারাস্‌নে তোর উচ্চ শুভ্র হাসি।
হারাস্‌নে তোর সদানন্দ পরিতুষ্ট ক্রীড়া, গল্প,
হারাস্‌নে তোর কেঠো মেঠো বাঁশী।
ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রীতি, পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ,
সরল ভক্তি বাপে এবং মাতে;
পাস্‌নি যা ঈশ্বরের কাছে—পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্বন্ধ—
তাও গড়ে নেওয়া হাতে;
হারাস্‌নে তোর সরল ধর্ম্ম—গঙ্গা-স্নানে পুণ্য ভাবা,
পরদারে মাতা বলে জানা।
বৃক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞতা সর্ব্বভূতে দয়া মায়া,
গাইকে ভগবতী বলে' মানা।

হেলায় হারাস্‌নেক এ সব,—যাতে তোরে করে ছিল,
চাষার সেরা ওরে গ্রামবাসী।
জগৎ খুঁজে এসো গিয়ে—এখনো হে মিশনারি,
কোথা পাবে এমন ধারা চাষী।
হে সভ্যতা! সর্ব্বনাশটি করেছ ত আমাদিগের,
এসেছি বিকিয়ে ধর্ম্ম হাটে;
পায়ে ধরি, দূরে থাকো—বেচারীদের টেনে এনে
ফেলোনাক তোমার হাড়ি কাঠে।"

যিনি স্বদেশবাসীর এইরূপ কল্যাণ চিন্তা করেন—যাঁহার দেশের জন্য এরূপ ভাবে প্রাণ কাঁদে, তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য সর্ব্বোত্তম কি না সে বিচার বিতর্কের প্রয়োজন নাই, তাঁহার মত স্বদেশবাৎসল্য লাভ করিবার সৌভাগ্য যে অধিক লোকের ঘটে না—এবং সেই সুদুর্লভ, স্বদেশ-প্রীতি লাভ করিলে মানব যে ধন্য হইয়া যায় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশব্যাপী জয়ধ্বনিই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

স্বভাব ও চরিত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্রের চরিত্রে দুইটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সারল্যের অবতার ছিলেন, সে সারল্য অনেক সময়ে বালকত্বে, শিশু-

সুলভ বিশ্বাসপরায়ণতায় পরিণত হইত। এই হেতু তিনি কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কপটের কাছে একবার ঠকিলে, সে প্রবঞ্চনার কথা তিনি জীবনে ভুলিতে পারিতেন না। এই সরলতা ছিল বলিয়াই প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিতেন আবার মন খুলিয়া নিন্দা তিরস্কার করিতে পারিতেন। কাহারও কোন কার্য্যের বা লেখার নিন্দা করিতেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতি যে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করিতেন, এমন কথা বলিতে পারি না। দ্বিতীয় গুণ তাঁহার ঔদার্য্য; তিনি মিত্র স্বজনের নিকট যেন উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। তিনি স্তুতিশুষ্ক বন্দনার কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বন্ধু বা সহচরের মুখে তাঁহার কোন কার্য্যের নিন্দা শুনিলে বান্ধবতার বন্ধন ছিন্ন করিতেন না। বরং বন্ধুমুখে অতিমাত্রায় কোন বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিলে তিনি যেন একটু সঙ্কুচিত হইতেন। তাই ব্যাজস্তুতির হিসাবে তাঁহার নাট্য-কাব্যের প্রশংসা করিতে হইত। মিত্র স্বজনের মধ্যে তিনি বালকের মত, হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, ছুটাছুটি করিতেন; কিন্তু সেই সময়ে একজন বাহিরের লোক বা অপরিচিত কেহ আসিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি চুপ করিয়া যাইতেন। অপরিচিত বা অল্প পরিচিত ভদ্রলোক থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলাল নবোঢ়ার মতন সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা ভাবিত হয়ত লোকটা অহঙ্কারী, কিন্তু দুই চারি দিন মেলা-মেশা করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিত যে দ্বিজেন্দ্রলালে লেশমাত্রও অহঙ্কার নাই। তিনি বন্ধুবৎসল ছিলেন; মিত্র স্বজনের মান অভিমান রক্ষা করিতে, তাহাদিগকে বেমালুম অর্থ সাহায্য করিতে, তিনি যেমন জানিতেন তেমন বুঝি আর কেহ জানিত না।” (মানসী, আষাঢ়, ১৩২০)।

দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু-প্রীতির কথা পূর্ণিমা-মিলন ও বিদায়-অভিনন্দন

পরিচ্ছেদদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সদালাপী 'মজ্‌লিসী' লোক ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য অসাধারণ ছিল।

বন্ধু-বাৎসল্য। সেই জন্য আত্মীয় বন্ধু সমাগমে তাঁহার কলিকাতার বাটী সর্ব্বদাই 'সর্‌গরম্‌' থাকিত। বন্ধু-স্বজনকে চা, তামাক দিয়া পরিচর্য্যা করিবার জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত থাকিতেন। বন্ধুদের উপদ্রবে তিনি এরূপ অভ্যস্থ হইয়াছিলেন যে—পাঁচকড়িবাবু বলেন—যদি তাঁহারা কোনও দিন দ্বিজেন্দ্রের বাটীতে গিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোনরূপ সাংসারিক বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেরই নাম নানাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি; এ স্থলে তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর পরিচয় দিতেছি। তাঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্য-সংসারে পরিচিত এবং তাঁহাদের অনেকেই সদাসর্ব্বদা দ্বিজেন্দ্রের কলিকাতার ভবনে যাতায়াত করিতেন। এই বন্ধুগণের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। প্রসাদদাসবাবু দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয় ও নিত্যসহচর ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের 'দাদামহাশয়' বলিয়া তিনি "দাদামহাশয়" নামেই দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুসমাজে সম্ভাষিত হইতেন। দ্বিজেন্দ্র তাঁহাকে প্রবীণ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন—অথচ সমবয়স্ক পরম অন্তরঙ্গের মত তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং—মধুর সম্পর্কের (নাতজামাই) দাবীতে রহস্য-পরিহাস করিতেন। নাট্যরথী স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র ও দ্বিজেন্দ্রের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা, হাইকোর্টের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, মনস্বী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সাহিত্যরথী

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, রসিককবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, মিনার্ভাথিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশয়গণ দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ঝামাপুকুরে থাকিতে হেমবাবু এবং 'সুরধামে' থাকিতে ললিতবাবু দ্বিজেন্দ্রের প্রতিবেশী ও নিত্যসহচর ছিলেন, এবং অপর সকলে সর্ব্বদাই দ্বিজেন্দ্রের বাটীতে যাইতেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী মিঃ এ কে রায়, স্বর্গীয় মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত—আই, সি, এস্, বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের Under-Secretary শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, এবং কবিবর স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র সি-এস্ মহাশয়দের সহিতও দ্বিজেন্দ্রের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। এতদ্ভিন্ন কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রের গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এক্ষণে ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু প্রভৃতি বহু সুহৃদ্ ও আত্মীয় স্বজন দ্বিজেন্দ্রের ভবনে যাতায়াত করিতেন।

বন্ধুবৎসল দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুজনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি সদালাপে আসর জমাইতে পারিতেন

রঙ্গ-রহস্য।

একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তিনি যে কেবল রচনাতেই হাস্যরসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, বন্ধুজন-সমাজে আলাপ-পরিচয়ের সময়ও তাঁহার পরিহাস-রসিকতা স্ফূর্ত্তি পাইত। কিন্তু বাল্যকালে তিনি গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন—তাঁহার রহস্য-পটুতা যৌবনের পর প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—"যিনি এ যুগে হাস্যরসে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহার যে কিছুমাত্র পরিহাস করিবার প্রবৃত্তি ছিল, কিংবা দশজনের সঙ্গে মিলিয়া হাসিয়া সামাজিকতার সুখ বাড়াইবার দিকে

ঝোঁক ছিল, তাহা হয়ত তাঁহার বাল্যকালে কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই। যে ছাত্রেরা ক্লাসে বসিয়া হাসিত বা গল্প করিত, তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন না।" (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০) দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গ-প্রিয়তা কেবল কথাতেই পর্য্যবসিত হইত না, সময়ে সময়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু-সমাজে তাহা কার্য্যেও প্রকাশিত হইত—তিনি বন্ধুদের সহিত মিলিয়া practical joke'ও করিতেন। তাঁহার 'দাদা মহাশয়' প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মধ্যে মধ্যে ঐরূপ রহস্য চলিত। একবার গ্রীষ্মকালে সকলে বলিয়া উঠিলেন "দাদা মশায়ের দেখ্‌ছি বড় শীত কর্‌ছে—লেপ চাপা দাও।" সত্যসত্যই সেদিন একাধিক লেপের ভারে দাদা মহাশয়কে অস্থির হইতে হইয়াছিল। আর একদিন দ্বিজেন্দ্র বলিলেন "আজকের এমন দিনটা মিছে কেটে যাচ্ছে, কি করা যায় বলুন দেখি।" কোনও বন্ধু বলিলেন "দাদা মহাশয়ের দাড়িতে কলপ দেওয়া যাক্।" তৎক্ষণাৎ দাদা মহাশয়ের অন্তরালে একটি শিশিতে জল পুরিয়া কাগজ মুড়িয়া চাকরকে শিখাইয়া দেওয়া হইল 'বলিস্ বোস কোম্পানির দোকান থেকে এনেছি'; পরিচারক শিশি লইয়া উপস্থিত হইতেই শুভ্রশ্মশ্রু 'দাদা মহাশয়' কলপের ভয়ে সে স্থান হইতে ছুটিয়া পালাইলেন। যে সময়ে কাব্যে নীতি ও কাব্যে অস্পষ্টতা লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের মাসিক সাহিত্যাদিতে বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুগণের মধ্যে একদিন কথা হইল 'যে যতবার রবি বাবুর নাম করিবে তাহাকে ততবার এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।' তৎকালে রবীন্দ্রনাথের নাম না করিলে সে মজ্‌লিসে কাহারোই অন্ন পরিপাক হইত না—সুতরাং কাহাকেও কাহাকেও দিনে আট আনারও অধিক জরিমানা দিতে হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রের রহস্যালাপ তাঁহার বন্ধুস্বজনই উপভোগ করিতেন—কিন্তু

তাঁহার আর একটি গুণ ছিল, যাহার জন্য তিনি সকল সমাজেই আদৃত হইতেন—সেটি তাঁহার গীত গায়িবার মোহিনী শক্তি। তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই হাসির গান গায়িবার জন্য অনুরুদ্ধ হইতেন। তিনি সে অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না। সময়ে অসময়ে সকল অবস্থাতেই এই হাসির গান গায়িতে বাধ্য হইয়া শেষে তাঁহার এই হাসির গান গায়িবার উপর একটা বিরাগ আসিয়াছিল—লোকে একটা অরুচি ধরাইয়া দিয়াছিল। তিনি রহস্যচ্ছলে তাঁহার তৎকালীন মনের এই ভাবটি তাঁহার রচনাতেও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মন্দ্রকাব্যে 'সুখ মৃত্যু' কামনার কবিতাটিতে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—"গাহিতে হাসির গান যেন সে সময়—কেহ নাহি করে অনুরোধ।"—'হাসির গানে' লিখিয়াছিলেন—"আর যা বল রাজি আছি—কেবল ঐ হাসির গানটি ছেড়ে দিছি।" দ্বিজেন্দ্র মুখে এই কথা বলিতেন বটে কিন্তু কার্য্যকালে তিনি স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃ নিজের বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া লোকের অনুরোধ রক্ষা করিতেন। এমন কি তিনি যখন পীড়িত এবং চিকিৎসক তাঁহাকে সকল প্রকার মানসিক ও কায়িক আয়াস হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়াছিলেন, তখনও তিনি গান গায়িবার অনুরোধ কাটাইতে পারিতেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি লোকরঞ্জনের ক্ষমতা ছিল—তিনি অভিনয় করিতে পারিতেন। কলিকাতার সঙ্গীত-সমাজে একবার তাঁহার 'সীতা' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল—সেই অভিনয়ে তিনি বাল্মীকির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুন্দর অভিনয় করেন। খুলনায় স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের অনুষ্ঠিত তাঁহার 'প্রতাপসিংহ' নাটকের অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্র, শক্ত-সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু-বাৎসল্য এবং সরল স্বভাব সময়ে সময়ে তাঁহার জীবনে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। বন্ধুদের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না এবং সেই কারণে তিনি আপনাকে লোক-চক্ষে কয়েকবার নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়া ছিলেন। একবার জনৈক বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে 'বঙ্গবাসী' আপিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তক খানি আনিয়া, উহাতে রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-স্মৃতি লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। পরে দ্বিজেন্দ্রকে তিনি ঐ জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-দেবতার কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধেই দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখেন। রবীন্দ্রনাথও সে পত্রের উত্তর দেন। সেই পত্রবিনিময় হইতেই উভয় বন্ধুর মনো-মালিন্যের সূত্রপাত—পরে ঐ বিষয় লইয়া সাময়িক পত্রে যে সাহিত্যিক বাদানুবাদ হয় সে কথা অন্য পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আর একবার আর একজন স্তাবক দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার "একঘরে" পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। এই "একঘরে" ছাপাইয়া যৌবনকালে দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল—তিনি স্বজন-সমাজে নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত স্তাবক দ্বিজেন্দ্রকে বুঝাইয়া ছিলেন যে ঐ পুস্তকে নাকি সমাজের উপকার হইয়াছে এবং সমাজের উপকারের জন্য উহার পুনর্মুদ্রণ করা উচিত। অপর কেহ হইলে উক্ত স্তাবকের মতিবিড়ম্বনায় সন্দিহান হইয়া তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু সরল-হৃদয় দ্বিজেন্দ্রলাল বন্ধুর সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মৃত্যুর পরেও আপনাকে বিরুদ্ধ সমালোচকের অপ্রিয় মন্তব্যের বিষয়ীভূত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রের হৃদয় নিরতিশয় স্নেহ-প্রবণ ছিল। তাঁহার পিতামাতার

উপর কিরূপ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, তাঁহার পত্নী-প্রেম কত প্রবল ছিল, একমাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নী মালতী দেবীকে তিনি কত স্নেহ করিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল দুঃখ করিতেন, তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় স্বজনগণের কাহারই মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা ও মাতার অন্তিম সময়ে তিনি বিলাতে, স্ত্রীর মৃত্যুকালে তিনি মফস্বলে ছিলেন; মালতী দেবী দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় ২২ বর্ষ পূর্ব্বে লোকান্তরিতা হয়েন, সে সময়েও দ্বিজেন্দ্রলাল স্থানান্তরে ছিলেন।

সন্তান-স্নেহ।

দ্বিজেন্দ্রলালের সন্তান-বাৎসল্য উল্লেখযোগ্য। সকল পিতাই সন্তানগণকে ভাল বাসেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র যেমন তাঁহার মাতৃহারা পুত্র-কন্যাকে ভাল বাসিতেন, তেমন বুঝি অনেক পিতামাতাই পারেন না। প্রসাদদাস বাবু বলেন 'মণ্টু' বলিতে তিনি অজ্ঞান হইতেন। মণ্টুকে অদেয় তাঁহার কিছুই ছিল না, মণ্টু বা মায়া কোনও জিনিস চাহিলে তাহা তাঁহাকে দিতেই হইবে। অধরবাবু বলেন "দ্বিজুবাবু 'মণ্টু'কে এক বাহুতে এবং 'মায়া'কে অপর বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন এইটি আমার 'যথা' আর এইটি 'সর্ব্বস্ব'।" কোনও ফিরিওয়ালা যদি খাদ্য-দ্রব্য লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিত যে সেই খাদ্যদ্রব্য সে তাঁহার পুত্র-কন্যাকে খাইতে দিবে বলিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ মূল্য দিতেন। একজন কাবুলি মেওয়াবিক্রেতা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিত এবং তিনি আহ্লাদের সহিত উচিত মূল্যের অধিক দিয়া তাহার পণ্য ক্রয় করিতেন। ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চকদিগের উপর দ্বিজেন্দ্রের দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের ও পত্নী-প্রেমের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রতারিত করিত; সে দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। দ্বিজেন্দ্র ভণ্ড সন্ন্যাসীদের প্রশ্রয় দিতেন না। একবার একজন ঐরূপ সন্ন্যাসী

দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তদীয় পুত্র ও কন্যা—দিলীপকুমার ও মায়াদেবী

৩৩২ পৃঃ।

আসিয়া তাঁহাকে বলে যে সে 'সুরধামে' আসিয়াছে সুতরাং সে দিন তাহার 'সুরধামে'র যোগ্য সেবা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পত্নীস্মৃতি-সৌধের নাম গ্রহণ করাতে দ্বিজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহার চর্ব্বচোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহাকে তুষ্ট করেন।

দ্বিজেন্দ্র নিরতিশয় করুণহৃদয় ছিলেন। বৃদ্ধদের প্রতি তাঁহার মমতা ছিল এবং শিশুদিগকে তিনি ভালবাসিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সতীর্থ ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের লোকান্তরিত আত্মাকে সম্ভাষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তুমি ত বালক বালিকা মাত্রকেই বড় ভালবাসিতে এবং শিশুর হাসিতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে। একদিন তোমার কলিকাতার বাড়ীতে বসিয়া কহিয়াছিলে —বাড়ীর জন্য যে জমি কিনিয়াছিলাম, তার অর্দ্ধেকটায় বাড়ী করিয়াছি, দেখিতেছ। বাকি অর্দ্ধেকখানি পড়িয়া আছে। জমির দর যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে ঐ অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিলেই পূরা জমির দামটা পাওয়া যায়। গ্রাহকও অনেক, অনুরোধও বিস্তর হইতেছে। কিন্তু ভাই, জমিটুকু ছাড়ি নাই। ঐ জমিতে প্রত্যহ বিকালবেলা পাড়ার ছেলে মেয়েগুলি খেলা করে, ছুটাছুটি করে। আলিপুরের আপিস হইতে আসিয়া তাহাদের দেখিয়া দিনের অবসাদ ভুলিয়া যাই। বালক-বালিকাদের মুখ দেখিলে আমি বড় আনন্দ পাই।" (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১)

শিশু-প্রীতি।

রসময় বাবু দ্বিজেন্দ্রলালের বৃদ্ধপ্রীতি বা বৃদ্ধদের প্রতি সহৃদয় অনুকম্পার সম্বন্ধে একটি গল্প করেন। একদিন রসময় বাবু দ্বিজেন্দ্রের বাটীতে তাঁহার সহিত সন্ধ্যার সময় দেখা করিতে গিয়া দেখেন তখনও দ্বিজেন্দ্র বাটীতে আসেন নাই। সে দিন বাটী আসিতে তাঁহার রাত্রি হইয়া গেল। বিলম্ব হইবার কারণ

বৃদ্ধজনে দয়া।

জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিজেন্দ্র এই ঘটনাটি বিবৃত করিলেন। আলিপুর হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিনে গেজেটেড্ অফিসারদের এবং তাহার পরদিন মিনিষ্টিরিয়াল অফিসারদের পেন্‌সনের টাকা দিবার নিয়ম আছে। কিন্তু ঐ মাসের ১লা ছুটি ছিল বলিয়া ২রা গেজেটেড্ অফিসারদের সঙ্গে অপরাপর লোকেরাও পেন্‌সন্ লইতে আসিয়াছিল। একদিনে সকলকে পেন্‌সন্ দিতে যাইলে অনেক বিলম্ব হইবে, নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও ২।৩ ঘণ্টা থাকিতে হইবে বলিয়া কলেক্টারী কর্ম্মচারীরা শেষোক্ত অল্প বেতনের পেন্‌সনারদের পরদিন আসিতে বলিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পেন্সন্ প্রত্যাশিগণ হতাশ হইয়া পুনরায় পরদিন আসিতে হইবে শুনিয়া আক্ষেপ ও মিনতি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে আলিপুরের ট্রেজারি দ্বিজেন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। তিনি বাহিরে ঐ গোলমাল শুনিয়া, কারণ অবগত হইয়া, বলিলেন, যে বৃদ্ধদের আর ফিরাইয়া কাজ নাই। যদি আফিসের পর ২।৩ ঘণ্টা থাকিলেই উঁহারা সকলে পেন্সন্ পাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ অতিরিক্ত সময় থাকিতে রাজি আছেন। দ্বিজেন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরা সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। বিগলিত-দন্ত বৃদ্ধদের হাস্যমুখ দেখিয়া তিনি অপার আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ট্রেজারির টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় দ্বিজেন্দ্রকে তাঁহার বসিবার কক্ষ হইতে বাহিরে জনতার মধ্য দিয়া চাবিহস্তে ধনাগারে যাইতে হইত। অপরাপর ট্রেজারি অফিসারেরা যখন ঐ কার্য্য করিতেন, তখন তাঁহাদের ধনাগারে যাইবার পূর্ব্বে চাপরাসী ও রক্ষকেরা জনতা সরাইয়া দিয়া, হাকিমের যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র সেরূপ আড়ম্বর করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জনতার মধ্য দিয়া ভিড় ঠেলিয়া সামান্য

ব্যক্তির ন্যায় গমনাগমন করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিত না তাঁহারা জানিতেও পারিত না যে তিনিই ট্রেজারি অফিসার।

দ্বিজেন্দ্রলালের, বেশভূষায় পারিপাট্য ছিল না। মোটা কাপড় ও সাদাসিধা চালেই তিনি অভ্যস্থ ছিলেন। দেবকুমার বাবু বলেন

বিলাসিতায় অনাস্থা

"রুক্ষকেশ, মলিন বেশ, নগ্নগাত্র, নগ্নপদ, বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বাটীতে চুপ্ চুপ্ করিয়া বেড়াইতেছেন, আজিও সে দৃশ্য যেন স্পষ্ট চোখেই দেখিতে পাইতেছি।" (সাহিত্য, ১৩২০) দ্বিজেন্দ্রের আহারাদিতেও কোনরূপ বিলাসিতা ছিল না। দ্বিজেন্দ্র পুরুষের স্ত্রীলোকোচিত সৌখীন ফিন্‌ফিনে পরিচ্ছদ, ফেরতা দিয়া চাদর গায়ে দেওয়া একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার রচনায় যেমন পুরুষোচিত ভাব অভিব্যক্ত, তাঁহার জীবনেও সেইরূপ পৌরুষের আদর প্রকাশ পাইত। তিনি "সোরাব রুস্তামে"এ সারিয়ারকে দিয়া বলাইয়াছেন—"পুরুষগুলো যদি স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল রাখে, নাকি সুরে কথা কয়, অপাঙ্গে চায়, আঁচল ঘুরিয়ে পরে, আর 'প্রাণনাথ' বল্‌তে সুরু করে, তাহ'লে স্ত্রীলোকদের একটা উপায় কর্ত্তে হয়। যে পুরুষগুলো কেশের বেশের বেশী পারিপাট্য করে, তাদের দেখে আমার ভারি দুঃখ হয়।" এই অভিমতটি কবির নিজের মত।

দেবকুমার বাবু বলেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সকালে, বিকালে, রাত্রিকালে—সর্ব্বদাই তাঁহার

অধ্যয়ন-স্পৃহা

কাছে অসংখ্য লোক আসিত, কিন্তু, তাঁহাকে অবসর সময়ের একটুও অপব্যবহার করিতে দেখি নাই। মনে আছে গয়ায় মনস্বী লোকেন পালিত মহাশয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ করিতে করিতে তিনি একেবারেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সে জ্ঞান নাই। বিচার-বিতর্ক, পাঠ ও আবৃত্তি তুমুলবেগে চলিতেছে। এক রাত্রি মনে পড়ে—প্রায় যখন বারটা বাজে, আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অভাবে একাই আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম, জানি না, সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখি, ঘড়িতে যখন রাত্রি ৩া৽টা বাজিয়া গিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও সমভাবেই উচ্চকণ্ঠে Byron পড়িতেছেন ও পালিত মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁহাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া Shelley হইতে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন।

মৃত্যুর তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে রসময় বাবু এবং আর কয়েকজন দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু তাঁহার "সুরধামে" বৈকালে গিয়া দেখেন দ্বিজেন্দ্র নিম্নতলে নাই। শুনিলেন তিনি তাঁহার কন্যা 'মায়া'র পাঠ বলিয়া দিতেছেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি নামিয়া আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার কন্যার একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন বটে, কিন্তু তত্রাচ তিনি নিজেও কন্যাটিকে পাঠাভ্যাস করান এবং সেই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ বোধ করেন।

ভূতপূর্ব্ব "বাণী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"যেদিন প্রথম তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি মাসিকপত্র (ভারতবর্ষ) প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার নিকট আসেন, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। যখন তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে তাঁহার সহযোগী করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তখন তাঁহার উদার-হৃদয়ের ও বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছিলাম সত্য ; কিন্তু যখন আমি আমার অক্ষমতার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তখন তাঁহার কাছে যে সকল উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। তখন

তাঁহার সহৃদয়তা ও সহজ-সরল সহাস্য আননের শক্তি অনুভব করিয়া তাঁহার কথায় না বলিবার শক্তি আমার ছিল না। হৃদয় বশীকরণের অমোঘ শক্তি যে তাঁহার এত ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না—মানবের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে মানব যে কার্য্য করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতাম না, জানিতাম না সাধুসন্ন্যাসী ভিন্ন এত অল্প সময়ের মধ্যে লোককে আপন করিয়া লইতে পারে, এমন শক্তিধরগৃহী বাঙ্গালায় আছেন।" (ভারত-বর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০)

চট্টগ্রামের সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তদীয় "বঙ্গবাণী" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রের দুরাত্মা-সমূহ তৃতীয় রিচার্ড বা আয়াগো, লেডী ম্যাক্‌বেথ্, গনিরীল্ বা রীগান্ হইতে পারে নাই, এই লক্ষণটুকুর মধ্যে সমগ্র লোকটার আধ্যাত্ম-চরিত্রের গুপ্তরহস্য নিহিত। এই রঙ্গপ্রিয় ভিতর-বাহির-খোলা, এই দোষে গুণে সরল এবং সহৃদয় ব্যক্তিই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। প্রথম পরিচয় এবং আলাপের দিনেই মানুষটি তাঁহার সমগ্র চরিত্র নিরাবরণ করিয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মনুষ্যত্বের হিসাবেও ইহা পরম দুর্ল্লভগুণ বলিয়া মনে করি। এই ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একবার মাত্র চাক্ষুস পরিচয় ও আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। প্রথম আলাপের দিনেই তাঁহার সঙ্গে বেগতিক তর্কযুদ্ধে মাতিয়া যাইতে বাধ্য হই।"

দেবকুমার বাবু বলেন "ইংরাজ জাতির বিবিধগুণ-মুগ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল অকপটেই ইংরাজের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু পদ, সম্মান লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে একদিনও কেহ লালায়িত হইতে দেখে নাই।" স্বার্থের জন্য কাহারো তোষামোদ করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। দ্বিজেন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ রসময় বাবু যে তদীয় 'দ্বিজেন্দ্র-লাল' কবিতায় আবেগ-ভরে লিখিয়াছিলেন—

"আত্মসম্মানের জ্ঞান ছিল তব প্রাণে,
প্রাণে ছিল কি দৃঢ়তা কর্ত্তব্যে কঠোর,
হৃদয়ের কাছে তুমি হও নাই চোর,
জীবিকা সর্ব্বস্ব বলি ভাব নাই জ্ঞানে।" (নব্যভারত, ১৩২০)

সে কথার প্রতিবর্ণ সত্য। দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলেন 'দ্বিজু বড়মানুষদের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতেন না। তিনি বলিতেন বড়লোকদের ভিতর আমার যে সকল বন্ধু ছিলেন, এক দেবকুমার ছাড়া প্রায় সকলেরই সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছি। দ্বিজু যখন মুঙ্গেরে ছিলেন সেই সময়ে একদিন * * রার রাজা দ্বিজুর বাসায় দ্বিজুর সঙ্গে দেখা করিতে যান। দ্বিজু তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার পরিচারক তাঁহাকে ডাকিয়া দেয় নাই—রাজা প্রায় একঘণ্টা তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। দ্বিজুর নিদ্রা ভাঙ্গিলে পরিচারক তাঁহাকে সংবাদ দিলে দ্বিজু তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না—বলিলেন 'রাজা বড় বাজে বকেন —আমি এখন তাঁহার সহিত দেখা করিব না।' রাজা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দ্বিজুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে ফিরিয়া গেলেন। অন্য কেহ হইলে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা প্রার্থনীয় মনে করিতেন—আমি তখন তাঁহাদেরই কাছে কর্ম্ম করিতাম।"

দ্বিজেন্দ্রের পরমাত্মীয় অধরবাবু বলেন—বড়লোকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজা নিজে একজন গুণবান্ ও গুণগ্রাহী সাহিত্যরসিক ছিলেন। তিনিও দ্বিজেন্দ্রকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা-মিলনে তিনি বহুবার (একাধিকবার সপুত্র—বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহাশয়ের সহিত) উপস্থিত হইয়াছিলেন সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রও তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার

প্রাসাদে যাইতেন। একদিন মহারাজা দ্বিজেন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে দ্বিজেন্দ্র রহস্যচ্ছলে বলেন, "আপনার বাড়ীতে আমি খেতে যাব কেন, আপনি কি আমার বাড়ীতে আহার করেন?" তাহাতে মহারাজা সস্মিতবদনে উত্তর দেন "তুমি কি আমাকে কখনও নিমন্ত্রণ করেছ?" দ্বিজেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া পরে একদিন মহারাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন এবং মহারাজাও সানন্দচিত্তে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। অধরবাবু বলেন যে মহারাজার মতামতের উপর দ্বিজেন্দ্রের যত শ্রদ্ধা ছিল, অপর কোনও বড়লোকের মতামতের উপর তত ছিল না। মহারাজা একবার দ্বিজেন্দ্রের বাণী-সাধনার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন। অন্য কেহ হইলে সে পত্রখানি সযত্নে রক্ষা করিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র প্রশংসা-পত্রের বা certificateএর উপর এতই উদাসীন ছিলেন যে,—জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেন,—একবার বাসা বদল হইবার সময় তিনি সেই পত্রখানি দ্বিজেন্দ্রের পরিত্যক্ত-কাগজের ঝুড়ি (waste-paper basket) হইতে কুড়াইয়া পান।

কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুজনের প্রশংসার প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। "পাষাণী" নাট্যকাব্যখানি তিনি তদীয় বন্ধু স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের নামে উৎসর্গ করেন। পালিত মহাশয়ের ঐ নাট্যকাব্যখানি ভাল লাগে নাই—অথচ শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'কলিকাতা গেজেটে' এবং স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় 'নব্যভারতে' উহার প্রভূত প্রশংসা করেন। তৎপরে দ্বিজেন্দ্র তাঁহার আর একখানি নাট্য-কাব্য অপর একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করেন—তিনিও ঐ পুস্তকের গুণগ্রাহী হয়েন নাই অথচ অপরে সে পুস্তকের প্রশংসা করে। তদবধি, মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, দ্বিজেন্দ্র তাঁহার মহানাটকগুলি মৃত মহাত্মাগণের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন—কেবল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তকগুলিই বন্ধু-বান্ধবের নামে উপহার দেন।

কোনও কোনও সাহিত্যিক নিজের রচনা সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ (suggestion) গ্রহণ করিতে, কুণ্ঠা বোধ করেন। দ্বিজেন্দ্রের সেরূপ অহমিকা ছিল না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে বন্ধুদের পরামর্শেই তিনি নুরজাহান-চরিত্র অঙ্কিত করেন ও দুর্গাদাস নাটক রচনা করেন, এবং 'সিংহল-বিজয়' নাটক প্রকাশ করিবার কালে তিনি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন যে, তাঁহার গুণগ্রাহী কিশোরী বাবুর কথায় 'মহাবংশ' হইতে আখ্যানবস্তুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তিনি 'সিংহল-বিজয়' রচনা করেন। মাইকেলও তদীয় বন্ধু ৺রাজনারায়ণ বসুর পরামর্শে ঐ 'মহাবংশ' অবলম্বন করিয়া 'সিংহল বিজয়' নামে এক খানি মহাকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের সেই অসমাপ্ত বাণীব্রত দ্বিজেন্দ্রলাল (যদিও বিভিন্ন ভবে) উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

অধরবাবু বলেন, শেষ বয়সে দ্বিজুবাবুর দৃষ্টিশক্তির কিছু হ্রাস হইয়াছিল —তিনি হঠাৎ দেখিলে লোক চিনিতে পারিতেন না—সেইজন্য মধ্যে মধ্যে অপ্রতিভ হইতেন। একদিন তিনি ও অধরবাবু কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ফুটপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচার-পতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও পদব্রজে অপরদিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সারদা বাবু দ্বিজেন্দ্রকে দেখিবামাত্র "কেমন আছ?" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। দ্বিজেন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া "হ্যাঁ ভাই, ভাল আছি, তুমি ভাল আছ ত?" এই কথা বলিয়া মুরুব্বিআনা চালে সারদা বাবুর পিঠ চাপড়াইয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন ভাবিয়া, বিদায় দিলেন। সারদা বাবু চলিয়া গেলে, অধর বাবু সবিস্ময়ে দ্বিজেন্দ্রকে বলিলেন, "কাকে কি কয়লেন! কে বলুন দেখি?" দ্বিজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" অধরবাবু উত্তর দিলেন

"জজ সারদা বাবু।" সেই কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তাইত, তাহ'লে কাজটা বড় অন্যায় হয়ে গেল ত? উনি কি মনে করবেন!" ততক্ষণ সারদা বাবু অনেকদূর অগ্রসর হইয়া চলিয়া গিয়াছেন—তখন আর সে ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল না।

দ্বিজেন্দ্র চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ যে সাক্ষ্য দান করেন, তাহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পাঁচকড়ি বাবু বলেন "দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, নিরাবিল শরৎ-জ্যোৎস্নার মতন ছিল, অতিবড় শত্রুও এ পক্ষে তাঁহার কোনও নিন্দা রটাইতে পারে নাই।" বিজয়বাবু বলেন—"যে সচ্চরিত্রতায় এবং সাধুতার জন্য বাল্যকালে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাহা যে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল একথা তাঁহার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই জানেন। তিনি যে কত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনের অনেক ছোট বড় কথায় দেশের লোকে জানিয়া সুখী হইতে পারিবে।"

নাটকের উন্নতিকল্পে তিনি এরূপ আগ্রহবান্ ছিলেন যে অনেক সময়ে তাঁহার নাটক অভিনীত হইবার পূর্ব্বে তিনি নিজে নট-নটীদের ভূমিকা যথাযথ শিক্ষা হইতেছে কিনা তাহা রঙ্গমঞ্চে অভ্যাসের সময় তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেন। সময়ে সময়ে অভিনেত্রীদের তাঁহাকে নিজেই কঠিন ভূমিকার ও গানের সুর শিক্ষা দিতে হইত। কিন্তু সেরূপ স্থলে গম্ভীর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের মত তিনি আত্মসমাহিত থাকিতেন। সে বিষয়ে কখনও কেহ তাঁহার বিন্দুমাত্র বেচাল বা লঘুতা দেখেন নাই।

পরিমিত নিয়মে সুরাপান তিনি দূষণীয় ভাবিতেন না। এমন কি তিনি একটি কবিতায় উক্তরূপ সুরাপানের সপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া

সে অভ্যাসের সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, পরে জনৈক বন্ধু তাঁহার ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিলে তিনি ঐ কবিতার শেষে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি যোগ করিয়া দিয়া, পরিমিত মদ্যপায়ীরও কিরূপ ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে পারে তাহা দেখাইয়া, উক্ত কবিতার কু-অভ্যাসসমর্থনের দোষ স্খালন করেন। তিনি পরিমিত সুরাপানের বিপক্ষ ছিলেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি দূষণীয় জানিয়া ঐ কু-অভ্যাস লুকাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে তিনি সমর্থন করিতেন না। একদিন তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহার বাটীতে বসিয়া সুরাপান করিতেছিলেন, এমন সময়ে ৺শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় আসিয়া পড়াতে উক্ত বন্ধুটি সুরার পাত্র লুকাইবার মানসে ইজিচেয়ারের নীচে রাখিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইয়া পদদ্বারা সুরাসমেত গ্লাসটি ফেলিয়া দিয়া চেয়ারের বাহিরে সরাইয়া দেন। তাহা দেখিয়া সেস্থলে দ্বিজেন্দ্রের অপর যে সকল বন্ধুবান্ধবেরা বসিয়াছিলেন তাঁহারা হাসিয়া উঠেন। শরৎবাবু পাছে মনে করেন যে তাঁহাকে দেখিয়া সকলে হাসিতেছে, সেই জন্য দ্বিজেন্দ্র বলিয়াছিলেন—"শরৎ, তুমি মনে করোনা তোমায় দেখে সবাই হাস্‌ছে; অমুক তোমায় সমিহ করে মদের গ্লাসটা লুকিয়ে ছিল, আমি সেটা বের করে দিয়েছি, তাই সবাই হাস্‌ছে।" শরৎবাবু চলিয়া গেলে দ্বিজেন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি তাঁহাকে শরৎবাবুর সম্মুখে অপ্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া অনুযোগ করিলে, দ্বিজেন্দ্র বলেন—"যদি ওটা দোষই ভাব, তবে খাও কেন? ছেড়ে দাও। খাবে ত লুকাবে কেন?"

বিলাতে অবস্থান কালে দ্বিজেন্দ্র সে দেশের প্রথামত কখন কখন সুরাপান করিতেন। এখানে আসিয়া সে অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সাহিত্যিক ও অপরাপর বন্ধুগণের সহিত নৌকা-বিহারে ও 'পার্টিতে' মধ্যে মধ্যে মৃদুমদিরা পান করিতেন। যতদিন

তাঁহার পত্নী জীবিতা ছিলেন ততদিন তিনি ঐ অভ্যাসের বশীভূত হয়েন নাই—তাঁহার পত্নী তাঁহার ঐ অভ্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রকে সুরাপান করিতে দেখিলে তিনি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। এই বিষয় লইয়া উভয়ে কথান্তর হইত, এমন কি একদিন বন্ধুবান্ধবদের সহিত দ্বিজেন্দ্রকে বাটীতে সুরাপান করিতে দেখিয়া তিনি রাগ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। সেই কারণে যতদিন তাঁহার পত্নী জীবিতা ছিলেন, দ্বিজেন্দ্র সুরাপান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সুরাপান অভ্যাস করেন—এবং গয়ায় অবস্থান কালে কোনও বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুর দৃষ্টান্তে ও সাহচর্য্যে উহা তাঁহার দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। তিনি পরিমিত ভাবেই প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সুরাপান করিতেন। কিন্তু কখন কখন সে সীমাও লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন। কলিকাতায় আসিলে তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ অনুযোগ করিলে, তিনি কৈফিয়ৎ দিতেন যে নিঃসঙ্গ বিপত্নীক বলিয়া তাঁহার মনে যে অবসাদ আসে সেই টুকু দূর করিবার জন্যই তিনি সুরাপান করেন; তিনি বলিতেন, উহার প্রয়োজন—"Just to pick me up"। বন্ধুরা তর্ক করিলে তিনি তর্কে হারিতেন না—বলিতেন "মদ খাওয়া দোষ নয়, মদে খাওয়াই দোষ।" শেষে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইলে ডাক্তারে যখন বলিলেন, তাঁহার blood pressure বাড়িয়াছে, মদ খাইলে তিনি মারা যাইবেন। তখন বাধ্য হইয়া তিনি সুরাপান ত্যাগ করেন। জীবনাবসানের বৎসরৈক কাল পূর্ব্ব হইতে তিনি মদ্যপান একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুই একবার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবার প্রবল প্রলোভন উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি আত্মদমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অধরবাবু বলেন, দ্বিজেন্দ্র পরস্ত্রীকে যথার্থই মাতৃবৎ দেখিতেন। পরনারীর সহিত দ্বিজেন্দ্র যেরূপ নিঃসঙ্কোচে—নির্ব্বিকার চিত্তে মিশিতেন

তাহা যিনি প্রত্যক্ষ না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না—তিনি যথার্থই জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাঁহার একটি শিক্ষিতা বিধবা কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন—তাঁহার কন্যার সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রের সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্র সেই সাক্ষাৎকে মহা বিপদ্ বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহার সেই নারীভীতি উপলক্ষ করিয়া তাঁহার বন্ধুগণ কয়েকবার তাঁহার সহিত—Practical joke—তামাসা করিয়াছিলেন। একটি ঘটনার কথা শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন (৩৪৭ পৃঃ)। আর একবার অধরবাবু ও অন্যান্য বন্ধুগণ পরামর্শ করিয়া কোন স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে দ্বিজেন্দ্রকে একটি কবিতা পাঠাইয়াদেন —কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ—

"উদাস করিয়া প্রাণ কি যে গেয়েছিলে গান,
আজও প্রাণে সুরতান বাজিতেছে তেমনি" ইত্যাদি

সেই পত্রে, লেখিকা দ্বিজেন্দ্রের দর্শন প্রার্থনা করেন এইরূপ ইঙ্গিত ছিল। সেই পত্র পাইয়া দ্বিজেন্দ্র এরূপ ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, যে শেষে উক্ত বন্ধুগণকে বিদ্রূপের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্র মনে করিয়াছিলেন উপরোক্তা বিধবা পাত্রীটিই ঐ কবিতার লেখিকা—পাছে তিনি সশরীরে পত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী তাঁহার বাসায় (তৎকালে দ্বিজেন্দ্র সুকিয়াষ্ট্রীটের বাসাবাটীতে থাকিতেন) আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এবং তাহা হইলে তিনি কি উপায়ে সেই মহা বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন, সেই ভাবনায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয় ও নিত্যসহচর "দাদামহাশয়" শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে যে অকাট্য সাক্ষ্য দিয়াছেন

তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। প্রসাদদাস বাবু লিখিয়াছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। যাঁহাদের দ্বিজেন্দ্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে, যে দ্বিজেন্দ্রের চরিত্র ভাল ছিল না। সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহারা কাহাকেও যশোগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে দেখিলে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া যশস্বীর গৌরবহানির জন্য অযথা গ্লানি করিয়াই থাকে।

"অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্"

তাহার উপর সরল নির্ভীক দ্বিজেন্দ্র এরূপ ছিদ্রান্বেষীদিগের দুই কথা বলিবার অবসর দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কেবল ইহাই নহে, তাহাদিগের কথায় কর্ণপাতও করিতেন না। সে সকল অবসরের কথা ক্রমে বলিতেছি। আপাততঃ একটি কথা বলিয়া রাখি যে যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রকে ভালরূপ জানিতেন, তাঁহার সহিত বিশেষরূপে মিশিতেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, যে, যে সকল মহাত্মাগণ চরিত্রগুণে মানব-মধ্যে দেবতুল্য বা ঋষিতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র চরিত্র-গুণে তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। এরূপ সত্যপ্রিয়, সরল, উদার, নির্ভীক, রিপুজয়ী তেজস্বী লোক সংসারে বিরল। যদি দ্বিজেন্দ্রের কবি-যশঃ কিছুমাত্র না থাকিত, তাহা হইলেও একমাত্র চরিত্র-বলেই দ্বিজেন্দ্র পূজার্হ। একথা তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। "সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতম্" একথা যদি সত্য হয়, তবে দ্বিজেন্দ্রে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদি ষড়রিপু জয় করাকেই প্রকৃত বীরের লক্ষণ বলা যায়, তবে দ্বিজেন্দ্রও একজন প্রকৃত বীর পুরুষ ছিলেন।

"ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যে দ্বিজেন্দ্র ছিদ্রান্বেষীদিগকে দুই কথা বলিবার

অবসর দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা অগ্রে আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্র যেরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, তিনি যদি একটা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বেড়াইতে পারিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে স্থলবিশেষে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতে পারিতেন; কিন্তু কপটতা কি, তাহা তিনি জানিতেন না।

"অনেকের ধারণা, স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্র চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। এটি তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। সত্য বটে, দ্বিজেন্দ্র প্রায়ই থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে এবং অভিনয়ের শিক্ষা দিতে যাইতেন, এবং সেই উপলক্ষে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের সহিত নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতেন; কিন্তু সে কথাবার্ত্তা গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ন্যায় একেবারে নির্দ্দোষ। যাহাকে যেটুকু শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, তাহাকে সেইটুকু শিক্ষা দিতেন, অন্য কোন দূষিত ভাব তাঁহার মনেও উদয় হইত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সিংহের ন্যায় স্বীয় আসনে বসিয়া থাকিতেন; এবং সকলে তাঁহাকে রীতিমত ভয় ও মান্য করিত। যাহারা বিপত্নীক সম্বন্ধে এরূপ ভাবের ধারণা করিতে পারে না, তাহারা ইহাতে অন্যরূপ মনে করিতে পারে, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি, দ্বিজেন্দ্রের মন অনেকের মন অপেক্ষা এ বিষয়ে অনেক উচ্চ ছিল। আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা এবং সত্যনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রের মুখেও স্পষ্ট শুনিয়াছি, যে দ্বিজেন্দ্র বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি কখন আসক্ত ছিলেন না। বিবাহের পূর্ব্বে বিদেশে কোন রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে, কাহারও কাহারও পরামর্শে যখন সে বিবাহ অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন, তখন হইতে সে রমণীর সহিত আর ঘনিষ্ঠতা করেন নাই। কিন্তু পণ্যাস্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা

ছিল তাহা তাঁহার "পরপারে" নাটক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এ বিষয়ে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। পরস্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার যে কিরূপ ভাব ছিল সে বিষয়ে কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ দিতে পারিতাম, কিন্তু কোনও বিশেষ গোপনীয় কারণবশতঃ সে সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে এক সময়ের কথা বলিতে পারি, যে যখন তাঁহার কয়েকজন সুহৃৎ পরামর্শ করিয়া কোনও স্ত্রীলোকের নাম দিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, তখন দ্বিজেন্দ্র যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহা তাঁহার বন্ধুগণই জানেন। সেই পত্রে যে রাত্রিতে সেই কল্পিত স্ত্রীলোকের দ্বিজেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার কথা ছিল, সেরাত্রিতে তিনি স্থানান্তরে থাকিবার সংকল্প করিলেন দেখিয়া সকলে সত্য কথা প্রকাশ করিল, তখন আবার দ্বিজেন্দ্রের চিরাভ্যস্ত রহস্য-প্রিয়তা ফিরিয়া আসিল।

তাঁহার আর এক দোষের কথা লোকে বলিয়া থাকে; সে পান-দোষ। এ দোষ দ্বিজেন্দ্রের ছিল সত্য, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিবার পরই ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তথাকার রীতিনীতিতে কতক পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। যে দেশে পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া সুরা ও ধূম পান করে, সে দেশে শিক্ষিত বালক সুরাপানকে বিশেষ দোষের চক্ষে না দেখা বিশেষ বিচিত্র বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তার প্রতি দোষারোপ করা কঠিন। যদি সুরাপান বিশেষ দোষের বলিয়া তাঁহার ধারণা থাকিত এবং তথাপি চিত্ত-দৌর্ব্বল্যবশতঃ তিনি সুরাসক্ত হইতেন, তবে তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারিত। এই এক সংযত পান-দোষ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবার নাই।

তদ্ভিন্ন, সরলতা ও সত্যপ্রিয়তায় দ্বিজেন্দ্র ঋষিতুল্য ছিলেন। যে বিষয় সত্য বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত, তাহা নিঃসঙ্কোচে সর্ব্ব সমক্ষে, এবং পুস্তক বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার "হাসির গানে" কি গোঁড়া হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামি, কি বিলাত-ফেরতের সাহেবী কিছুই আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে "তুমি সকল নৈবেদ্যেই ঠোকর মার যে—সকলেই তোমার উপর চটিয়া যাইবে ত?" দ্বিজেন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন, "যে মানুষ হইবে চটিবে না।" এই প্রশ্নোত্তর হইতেই দ্বিজেন্দ্রের স্পষ্টবাদিত্ব সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারা যায়। দ্বিজেন্দ্রের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক সংসারে অতি বিরল। যাহার যে পরিমাণে দাবী, তাহাকে ততোধিক দিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, কেহই বলিতে পারেন না, যে "দ্বিজেন্দ্রলাল আমার প্রতি এই অন্যায় করিয়াছেন, অথবা আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা তিনি করেন নাই।" তবে এমন হইতে পারে, যে কেহ তাঁহার নিকট হইতে অতিরিক্ত আশা করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র তাহা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু হয়ত তাঁহার সেই অতিরিক্ত আশা পূর্ণ করিতে গেলে অন্য একজনকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হয়, সুতরাং দ্বিজেন্দ্র সেস্থলে অক্ষম হইয়াছেন কিন্তু সে দোষ দ্বিজেন্দ্রের নয়, দোষ অন্যায্য আশাকারীর। কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে তিনি ভীরু, অলস, অথবা কাপুরুষ মনে করিতেন। এ সকল কথার অধিক আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকের যে অন্যায় ধারণা আছে তাহা কথঞ্চিৎ দূর করার জন্য যতটুকু বলা প্রয়োজন মনে করিলাম, ততটুকু বলিলাম। অন্যে যাহাই বলুক, একাধারে এরূপ অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, আদর্শ চরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

এবং সারল্য আজকাল বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্লভ, একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

পূর্ব্বপরিচ্ছেদের শেষাংশে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার পর আর দ্বিজেন্দ্রলালের ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু উহা লিপিবদ্ধ করিবার পরে মাসিক-সাহিত্যে নিম্নোদ্ধৃত বাদানুবাদটি প্রকাশিত হওয়ায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বলিলে দ্বিজেন্দ্রের স্মৃতির উপর অবিচার করা হয়।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র ১৩২৩ সালের ভাদ্র সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্,-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ পত্রিকায় গত বৎসর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি দুঃখবাদী (Pessimist) ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ছিলেন। আমরা তাঁহার মত ভ্রান্ত মনে করি। যিনি 'পরপারে' নাটক লিখিয়াছেন, এবং মহাসিন্ধুর ও-পারের সঙ্গীতের আভাস পাইয়াছিলেন, তিনি কখনও নাস্তিক হইতে পারেন না। তবে এক সময়ে হয়ত তিনি অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) ছিলেন। মন্দ্রের একটি কবিতায় তিনি বলিয়াছেন "মরণের পাছে কি জগৎ লুক্কায়িত আছে! * * কিংবা এইখানে শেষ সব।" কিন্তু তিনি প্রথম ও শেষ জীবনে যে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাবলীতেই রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ আর্য্যগাথার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন "যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন * * আর্য্যগাথা তাঁহারই আদর চাহে।" ইহা কি অবিশ্বাসীর কথা? * * * যিনি ঐশ-প্রেম বুঝাইবার জন্য নাটক পর্য্যন্ত লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন (মেবার-পতনের ভূমিকা—১৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) তিনি যে ঈশ্বরে আস্থাহীন ছিলেন এরূপ কথা কি

মানিয়া লওয়া যায়? মনে রাখিতে হইবে মেবারপতন দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের রচনা। * * * তবে এ কথা সত্য যে তিনি লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের স্বর্গ, নরক, দেবদেবী বিশ্বাস করিতেন না, এবং তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবটা বোধ হয় তেমন প্রবল ছিল না। * * * ভক্তির অভাব-বশতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেন নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ তাঁহার মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্ব্বে "বাণী"পত্রিকায় তাঁহার যে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা শুধু আধ্যাত্মিক নহে, তাহার প্রেমে গদগদ আত্মসমর্পণের ভাবটি এমনই মধুর যে এখানে সে বিষয় কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গানটি এই—

"তুমি যে আমার হৃদয়েশ্বর—তুমি যে আমার প্রাণ ;
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার সকলি তোমারই দান।
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি, হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি নয়নের জ্যোতিঃ কণ্ঠের মৃদু গান ;
সকলি তোমারই দান—সে যে সখা সকলি তোমারই দান।

* * * *

চেয়ে দেখ ঐ সন্ধ্যা আকাশে—দিবসের আলো ম্লান হয়ে আসে,
মিশে যায় আশা—হতাশের-শ্বাসে থেমে যায়—হাসি গান ;
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আমার, আর কেন বঁধু চেয়োনাক আর,—
আর কিছু নাই তোমায় দিবার, হল দিবা অবসান
আর কেন বঁধু!—লহ লহ তবে এ জীবন বলিদান।"

* * * দ্বিজেন্দ্রলাল যে দুঃখবাদী ছিলেন না তাহা তাঁহার কাব্য ও প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। একটি কবিতায় তাঁহার নবজাত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিয়াছেন "এস ধরাধামে বৎস! হেথা

বিশ্বময় সর্ব্বেব কদর্য্য নহে।" ইত্যাদি (মন্দ্র—আগন্তুক) ইহা দুঃখ-বাদীর উক্তি নহে। আবার একটি কবিতায় তিনি বলিছেন—"কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী, এমন জগৎ আমাদের?" আর যিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া গায়িয়াছেন—"একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর"—ইত্যাদি, তিনি কখনও দুঃখবাদী হইতে পারেন না। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল একবার রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ব্যাখ্যা সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে দুঃখবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজে পৃথিবী দুঃখময় মনে করিতেন না। * * * রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল বুঝিয়াছিলেন। দেবকুমারবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং ভক্ত হইয়াও তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন।"

ইহার উত্তরে দেবকুমারবাবু লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য প্রবন্ধটি আমার কয়েক বৎসর পূর্ব্বের রচনা। তখনো দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসের সূত্রপাত হয় নাই—তৎকালে তিনি সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী ত ছিলেনই, পরন্তু তখন তাঁহার তর্কে ব্যবহারে ও কোন কোন রচনায় তাঁহাকে প্রায়ই Pessimist বলিয়া আমাদের ধারণা হইত।

"যাহা হউক, ক্রমে নানা কারণে, তাঁহার যুক্তিপ্রিয় মনে অজ্ঞাত-রূপেও ধীরে ধীরে একটি বিশ্বাসের বীজ উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার নাটকের স্থানে স্থানে কোন কোন চরিত্রের বাক্যে ও ব্যবহারে এই পরিবর্ত্তনটি স্পষ্টতর প্রতিপন্ন হইয়া থাকিলেও, মুখে কোন দিনও তিনি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষ জীবনে, ভক্তি-রসাত্মক কোন সঙ্গীত বা কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি জলভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, বহুদিনই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি।

কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"তোমাদের ঈশ্বরকে না দেখিলে আমি মানিতে পারি না ; তবে যে এই কীর্ত্তন শুনিলে আমার প্রাণটা কেমন যেন আকুল হয়ে উঠে, তার কারণ বোধ এই যে, আমার মা অদ্বৈত প্রভুর বংশে জন্মিয়াছিলেন।"—কীর্ত্তন শুনিলে তাঁহার কি হয় জিজ্ঞাসা করায় এক দিন তিনি আমায় বলিলেন—"ঐ সুর শুনিলে আমার কেমন যেন ভয়ানক 'মন কেমন' করে ; যেন তখন আমার লজ্জা সঙ্কোচ ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠে নাচ্‌তে সাধ যায় ; সত্যি সত্যি আমার প্রাণটা তখন এমনি করে যে, যেন ডাকছেড়ে কাঁদতে পার্‌লে আমি বেঁচে যাই।" এক দিন কোথায় কাহার একটি কীর্ত্তন গান শুনিয়া তিনি বালকের মত শয্যা গ্রহণ করিয়া, লেপের আড়ালে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বহুক্ষণ যাবৎ কাঁদিয়াছিলেন এ কথাও একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রসঙ্গে আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন। যদি বলা যাইত, "আপনার বেশ মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; তিনি অমনি সে উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—"ও কথা আমি স্বীকার করি না—তবে কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমার কেমন একটা যেন দুর্ব্বলতা আছে!"

"কিন্তু তা' হইলেও, অর্থাৎ তিনি তাঁহার ধারণামত সত্যের খাতিরে যতই কেন অস্বীকার করুন না, এ কথা খুবই ঠিক্ যে, শেষ বয়সে (মৃত্যুর ৩।৪ বছর পূর্ব্ব হইতে) তিনি ঈশ্বরে ও সাধু মহাপুরুষে আস্থাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল।"

দেবকুমারবাবু উক্ত মন্তব্যে যে কথা বলিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রের অপর সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মুখেও ঐরূপ ধরণের কথা শুনিয়াছিলাম বলিয়া আমি দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয় ও নিত্যসহচর প্রসাদদাসবাবু, অধরবাবু ও রসময়বাবুর নিকট ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছিলাম।

তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে—কৃষ্ণবিহারীবাবুর অনুমানই ঠিক,—দ্বিজেন্দ্রলাল দুঃখবাদী বা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্রের মনে সংশয়বাদের ছায়া স্পর্শ করিয়াছিল এ কথা সত্য, কিন্তু সে অবস্থায় অনেক আস্তিকই কিছু দিনের জন্য নাস্তিক হইয়া দাঁড়ান—"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" রচয়িতাও হইয়াছিলেন—"এষা"র কবিও হইয়াছিলেন ("হে বিগ্রহ, পাষাণ হৃদয়", "একবার চীৎকারি চীৎকারি", কবিতা দ্রষ্টব্য) কিন্তু তা' বলিয়া কি, সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রশেখরকে না বন্ধুবর অক্ষয়কুমারকে নাস্তিক বলিব? দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগের কবিতায় (২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), 'বিধবা' কবিতায় (২৫৬ পৃঃ উদ্ধৃত) ও অপরাপর রচনায় সেরূপ আভাষ আছে—তিনি মুখেও সেইরূপ কথা বলিতেন এবং বন্ধুরা প্রতিবাদ করিলে "তর্কে হারিতেন না" এ কথাও সত্য। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে দ্বিজেন্দ্রের অস্থিমজ্জায় আস্তিকতা বিজড়িত ছিল—কৃষ্ণবিহারীবাবু দ্বিজেন্দ্রের রচনা হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সেরূপ কথা দ্বিজেন্দ্রের রচনায় আরও অনেক আছে—'পরপারে' নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে (১৯৭-৯৮ ও ১৯৩ পৃষ্ঠায়) এবং স্বদেশ-প্রেম অধ্যায়ের শেষাংশে সেরূপ কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি মেবার পতন নাটকের ভূমিকায় স্পষ্টই (২৬৭-৬৮ পৃঃ উদ্ধৃত) বলিয়াছিলেন—যিনি তাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন তিনি ভুল করিবেন—অর্থাৎ তিনি নাস্তিক নহেন। পরন্তু দুঃখবাদ অসুন্দর; প্রকৃত কবি সুন্দরের উপাসক; দ্বিজেন্দ্র প্রকৃত কবি ছিলেন, তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের সত্তা অনুভব করিতেন—তিনি নিজেই কবির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"কবি সেই যে সে সৌন্দর্য্যে দেখে একটা মহা প্রাণ
কবি সেই যে দেখে বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান। (কবি—'আলেখ্য')।

দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ জীবনে শুধু যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এরূপ নহে; তিনি হিন্দুর ভক্তি-আস্বাদ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের কথা লিখিবেন, কিন্তু তাহার যোগ্য হয়েন নাই—এ কথা তিনি একাধিক বন্ধুর কাছে নিভৃতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হয়ত ভক্তিহীন বন্ধুদের কাছে উপহসিত হইবার ভয়ে সে কথা কোনও দিন উত্থাপন করেন নাই—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলিয়া গিয়াছেন 'ঘৃণা লজ্জা ভয় এ তিন থাকৃতে নয়'—সে অবস্থা তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ব্যাকুলতার উন্মেষ হইতেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষ কথা, তিনি শুধু আধ্যাত্মিক গীত লিখিয়া—কীর্ত্তন গায়িয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়া যান নাই, আনুষ্ঠানিক হিন্দুর বাহ্য অনুষ্ঠানের উপরও তাঁহার শ্রদ্ধার উন্মেষ হইতেছিল; প্রসাদদাসবাবু ও অধরবাবু বলেন শেষাবস্থায় তিনি পথে যাইতে যাইতে কালীপ্রতিমাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জপের উপর তাঁহার বিশ্বাস আসিয়াছিল—ভীষ্ম নাটকের প্রথম দৃশ্যে সেই বিশ্বাসের আভাষ দিয়াছেন—সিংহল-বিজয়ে বালকের মুখে সেই ধারণা স্ফুটতর আকারে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সিংহল-বিজয় নাটকের সেই দৃশ্যটি পরিমার্জ্জন করিতে করিতেই তিনি লোকান্তরিত হয়েন। পাঠককে সেই কথাগুলি (২১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) আর একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি—বিশেষতঃ শেষের পংক্তি কয়টি, যেখানে দ্বিজেন্দ্র বালককে বলাইয়াছেন—"নিশ্চয় এ রকম হয়েছে; নৈলে তারা (জপ) করবে কেন।" দ্বিজেন্দ্র যে স্পর্দ্ধা করিতেন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের সন্তান; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—তাঁহার সে স্পর্দ্ধা বৃথা-বাক্যে পর্য্যবসিত হয় নাই—তিনি শেষাবস্থায় ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

শেষজীবন ও মৃত্যু

১৯০৮ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী ১৫ মাসের, দীর্ঘ অবকাশ (Furlough) লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার 'সুরধাম' ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়াতে সেই সুরম্য ভবনে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহাকে আর গয়ায় ফিরিয়া যাইতে হয় নাই; ১৯০৯ খৃঃ ২৮শে এপ্রিল তিনি ২৪ পরগণায় (আলিপুরে) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন। কলিকাতায় চারিবর্ষ কাল অবস্থানের পর, বাঙ্গালাপ্রদেশ প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইবার প্রাক্কালে, ১৯১২খৃঃ ২৯শে জানুয়ারী, তিনি বাঁকুড়ায় বদলি হয়েন। সেখানে মাসত্রয় অবস্থানের পর তিনি বিহার গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গেরে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। বাঁকুড়া হইতে মুঙ্গেরে যাত্রা কালে কলিকাতায় আসিয়া তিনি অসুস্থ হয়েন। সেই অসুস্থতাই তাঁহার সাংঘাতিক সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত। তিনি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যালভার্টের সাহেবের চিকিৎসাধীন হয়েন। Calvert সাহেব বলেন তাঁহার (Blood-pressure) রক্তের চাপ (বেগ) অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, তাঁহাকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে। পীড়ার উপশম না হওয়াতে তিনি এক বৎসরের (Combined Leave) অবকাশ লইতে বাধ্য হইলেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার পীড়া কঠিন—তাঁহাকে হিন্দু বিধবার মত আহারাদি করিতে হইবে—আমিষাদি খাদ্য এবং উত্তেজক

পানীয় তাঁহার পক্ষে প্রাণঘাতী। তিনি আহারাদি বিষয়ে চিকিৎসকের আদেশ সাধ্যমত পালন করিয়াছিলেন, এবং পীড়ার সূত্রপাতের কয়েক মাস পরে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইয়া যথার্থই হিন্দু বিধবার মত সকল বিষয়ে সংযমী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার অভ্যস্ত আহারাদি বিষয়ে প্রবল প্রলোভন হইতে আত্মদমন করিতে দেখিয়া বন্ধুগণ তাঁহার সংযমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু আহারাদি বিষয়ে সংযমী হইলেও মানসিক উত্তেজনা হইতে তিনি আপনাকে একেবারে মুক্ত করিতে পারেন নাই। সামাজিক শিষ্টাচারের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে লোকরঞ্জনের জন্য গীত গায়িতে হইত। এ বিষয়ে তিনি স্বাভাবিক সৌজন্য বশতঃ সকল সময়ে অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যবন্ধু ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় দ্বিজেন্দ্রের লোকান্তরিত আত্মাকে সম্ভাষণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"চিকিৎসক তোমাকে লঘু আহার করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, * শরীর যত দুর্ব্বল হইবে, তত অধিক দিন বাঁচিবে। তিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ খাইতে, গান গাইতে এবং মস্তিষ্ক চালনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। * * * ১৩১৯ সালের ২৪শে ফাল্গুন শনিবার তোমার সুরধামে শেষ গিয়াছি। * * তোমার স্বাস্থ্যের কথাই অধিক হইল। বলিলে 'ভাই, ছ'মাস সাত মাস হিন্দু বিধবার

---

* Dr. Calvert এর কথাগুলি তোমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই :—

"You must live upon simple diet—the diet of a Hindu widow. The weaker you grow, the longer you live. Do not partake of a feast. Do not exercise your brain. You may allow yourself to be entertained but never try to entertain others."

খাদ্য খাইয়াছি, কিন্তু গান গাওয়া বা লেখা একেবারে বন্ধ করিতে পারি নাই।' আমি বলিলাম ঐ ত তোমার রোগ। সেবার সন্ধ্যার সময় একদিন তোমার বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম তুমি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া গান ধরিয়াছ। বন্ধু-বান্ধবকে গান শুনাইবার জন্য তুমি যে ভাবে গান করিতেছিলে, বোধহয় কোন ব্যবসাদার গায়ক অর্থলোভেও সে ভাবে গান গায়িতে রাজি হয় না। * * * তুমি বলিলে 'শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে যাব। একটু নির্জ্জনে থাকলে খড়ের স্নান করলে শরীরটা বোধ হয় ভাল হবে। মনে করেছি, খড়ের ধারে একটা বাড়ী করিব।'

"আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিলাম। সাতদিন পরে অর্থাৎ ২রা চৈত্র শনিবার তারিখে তুমি এখানে আসিলে। দু'তিন দিন সকালে বিকালে হাঁটিয়া এবং জলঙ্গীর জলে স্নান করিয়া শরীর বেশ একটু সুস্থ করিলে, কিন্তু তাহার পরেই বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে নিয়ম ভঙ্গ করিলে। * * তুমি দু'তিন জন বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইলে, দু'একটি গানও গায়িলে। আবার তোমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

"এক দিন তুমি আমি একত্র এখানকার ক্লাবে গেলাম। সহরের অনেক ভদ্র লোকই সেখানে ছিলেন। সকলে তোমাকে একটি গান গায়িতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "ডাক্তারের নিষেধ।" আমার কথা টিকিল না। তুমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান ধরিলে "পতিতো-দ্ধারিণী গঙ্গে।" আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।

"১০ই চৈত্র, রবিবার, প্রাতঃকালে তুমি যখন জন্মের মত জন্মভূমি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলে—* * তুমি কহিলে "আমার পক্ষে কলিকাতা কৃষ্ণনগর দুই-ই সমান। ভাবিয়াছিলাম এখানে আসিয়া একটু নির্জ্জনে থাকিব—তাহা হইল না। * * * বিলাতে "ডাক্তারের নিষেধ" একথা

শুনিলে কেহ কখনও নিষিদ্ধ কাজ করিতে অনুরোধ করে না— এদেশে আমাদের এখনও সে জ্ঞান হয় নাই।" (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১)

এই অবকাশের সময়ে দ্বিজেন্দ্রের গ্রন্থ রচনা একেবারে বন্ধ হয় নাই, পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে রচনা স্থগিত থাকিত মাত্র। অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল যে, চাকুরী হইতে অবসর লইয়া তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সেবায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। তিনি বলিতেন, নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে পেন্‌সন্ লইলে তাঁহার পেন্‌সনের আয় যে পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তাঁহার পুস্তক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে সেই ক্ষতি পূরণ হইতে পারিবে। তৎকালে তাঁহার পুস্তক বিক্রয় হইতে যে অর্থ উপার্জ্জন হইতেছিল, তিনি আশা করিয়াছিলেন আর কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিলেই, সেই আয় বর্দ্ধিত হইয়া তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে ততদিন অপেক্ষা করিতে দেন নাই। তৎপূর্ব্বেই শরীর উত্তরোত্তর অপটু হওয়াতে, এবং চাকুরীতে তাঁহার উন্নতির আশা নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি, ১৯১৩ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই, দীর্ঘ অবকাশের সময় তিনি "ভীষ্ম" ও "সিংহল বিজয়" নাটকদ্বয় রচনা করেন, "ত্রিবেণী" প্রকাশিত করেন এবং "চিন্তা ও কল্পনা" মুদ্রাঙ্কিত করিতেও আরম্ভ করেন।

চাকুরী হইতে অবসর লইয়া দ্বিজেন্দ্র দুই মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করেন। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মেসার্স্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ সেই মাসিক পত্র প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন (পরে তিনিই লব্ধপ্রতিষ্ঠ-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন

মহাশয়ের সহযোগে ঐ পত্রের প্রথম বর্ষে সম্পাদকতা করেন), পত্র খানির নামকরণ হয় "ভারতবর্ষ" এবং প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া দ্বিজেন্দ্র উহার 'সূচনা' লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিজেন্দ্র কত উচ্চ পর্দ্দাতে সুর বাঁধিয়া মাসিক-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন—তাহা সেই "সূচনা"তেই সুপ্রকট। তিনি সেই 'সূচনা'য় লিখিয়াছিলেন—"আমরা যেন না পিছু হটি। আমরা যেন না ভয় পাই। আমরা যেন সাহিত্যের বাতাসকে পবিত্র রাখিতে পারি। আমাদের বন্দনায় যেন বিগলিত-স্নেহা জননীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। আমাদের গানে যেন জগৎ মাতিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে। আমরা যেন আত্মসম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া, মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া, সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের কাছে সম্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া পৌছিবে।" কিন্তু হায়! সেই সুর বাঁধাই সার হইল, গায়িতে আর হইল না। বিধাতা তাঁহাকে সেই পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া দেখিয়া যাইবারও অবসর দিলেন না। প্রসাদদাস বাবু বলেন, ঐ পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রকে যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতে যে সাহিত্যের আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে হয়, (সে ভার তিনি সহকারীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, নিজেই সেই drudgery গ্রহণ করিয়াছিলেন), সেই গুরু ভারেই তাঁহার দুর্ব্বল শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কেহ বড়লোক হইলেই তাঁহার বালককালে কাহারো কথিত সেই সৌভাগ্য-সূচক ভবিষ্যৎবাণী আবিষ্কার করা, কোনও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে তাঁহার জীবনের গতি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে সেই অনিবার্য্য অন্তিম

ঘটনাটি স্থগিত বা নিবারিত হইতে পারিত, তাহা অনুমান করা মানব-মনের চিরন্তন দুর্ব্বলতা। হয়ত ১১পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তির উল্লেখ এবং চন্দ্রশেখর বাবুর ও প্রসাদদাস বাবুর উক্ত মন্তব্য-গুলি সেই দুর্ব্বলতারই অভিব্যক্তি।

কারণ যাহাই হউক, ভাগ্যবিধাতা অতি অতর্কিতে আসিয়া দ্বিজেন্দ্র-লালের জীবন-সূত্র অকস্মাৎ ছিন্ন করিয়া দিলেন। বঙ্গাব্দ ১৩২০, ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে ১৯১৩ খৃঃ) শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বভবন সুরধামে বসিয়া বাণী-সেবা করিতে করিতে আচম্বিতে সন্ন্যাস রোগে সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইলেন।

ঐ দিন শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বাটীতে অতিথি ছিলেন। তাঁহার সহিত এবং 'দাদামহাশয়' শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামীর সহিত গল্প গুজব করিয়া দ্বিজেন্দ্র অপরাহ্ণকাল অতিবাহিত করেন। বিজয় বাবুর সে দিন বৈকালের গাড়িতে মফস্বলে, তাঁহার কর্ম্মস্থানে, যাইবার কথা ছিল। দ্বিজেন্দ্র প্রসাদদাস বাবুকে বলেন 'আসুন আজ গল্প করে বিজয়কে ট্রেণ ফেল্ করে দেওয়া যা'ক।' বিজয় বাবু কিন্তু সে দিন থাকিতে রাজি ছিলেন না, তিনি ৫ টার গাড়িতে, ট্রেণে চড়িবার জন্য বিদায় লইলেন। সে দিন শনিবার—পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল যে, সে দিন দ্বিজেন্দ্র ও প্রসাদদাস বাবু, রাত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত "ভীষ্ম" নাটকের অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে যাইবেন। বিজয়বাবু বিদায় লইতেই দ্বিজেন্দ্র, প্রসাদদাস বাবুকে বাটীতে গিয়া রাত্রে থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পাঠাইলেন। প্রসাদদাস বাবুকে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্র তাঁহার "সিংহল বিজয়" নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতে লাগি-লেন; সে দিন বেলা দুইটা হইতে দ্বিজেন্দ্র ঐ পাণ্ডুলিপি খানি দেখিতে-ছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি দেখিতে দেখিতে দ্বিজেন্দ্র যেমন ঢালা বিছানায়

তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই, দুই হাত মস্তকের উপর সোজা করিয়া দিয়া তাকিয়ায় শুইয়া তিনি আলস্য ভাঙ্গি-লেন। তাঁহার বাটীতেই অবস্থিত ইভ্‌নিং ক্লাবের দুই জন সভ্য যুবক ঠিক সেই সময়ে আসিয়া, পার্শ্বের কক্ষে বিলিয়ার্ড খেলিতে প্রবেশ কালে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিলেন। কয়েক মিনিট পরেই তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, দ্বিজেন্দ্র ভগ্ন ও জড়িত স্বরে "Boy" বলিয়া ডাকি-লেন। সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহারা ত্বরিত-পদে আসিয়া দেখেন, দ্বিজেন্দ্র অচৈতন্য হইয়া গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিচারকদের ডাকিলেন, একজন ছুটিয়া নিকটেই প্রসাদদাস বাবুর বাটী হইতে তাঁহাকে ডাকিতে যাইলেন। প্রসাদদাস বাবু তাঁহার পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্রের (নিকটে যে সকল কাগজ পত্র ছিল, সমস্ত সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া) মস্তকে জল সেচন করা হইল—চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ক্রমে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, তাঁহার শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সপুত্র (ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার) আসিলেন। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের আর জ্ঞান হইল না। তিনি একবার মাত্র "মণ্টু" বলিয়া জড়িত স্বরে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে ডাকিয়াছিলেন—সেই তাঁহার ইহজীবনের শেষ কথা; তাঁহার বিলুপ্ত সংজ্ঞাও আর ফিরিয়া আইসে নাই। দ্বিজেন্দ্রের অন্যতম বন্ধু ও প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরদিন দার্জিলিঙ্গে যাইবার কথা ছিল, তিনি টিকিট কিনিয়া সন্ধ্যার পর দ্বিজেন্দ্রকে সংবাদ দিতে গিয়া দেখেন দ্বিজেন্দ্র অন্তিম শয্যায়। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, একই ভাবে আছেন—

অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ললিতবাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিলেন, এমন কি বিজয়বাবু ও প্রসাদদাস বাবু যখন অর্দ্ধঘটিকাকাল মাত্র পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লয়েন, তখনও তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রের দেহে বা মনে অসুস্থতার কোনও চিহ্নই লক্ষ্য করেন নাই। তিনি সহজ ভাবেই তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। বিজয়বাবু লিখিয়াছেন "কবির মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে আমি যখন চিকিৎসকের দ্বারা আমার চক্ষু পরীক্ষা করাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়া ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আমাকে বলিয়াছিলেন—'তুমি যদি নিজে বুঝিতে পারিয়াছ যে তোমার অসুখ কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, তবে পরীক্ষা করাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এই দেখ আমি নিজে বুঝিতে পারিতেছি, বেশ ভাল আছি। কাজেই শরীর পরীক্ষার জন্য অনেক দিন ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না।' মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যিনি প্রসন্নমনে এবং সুস্থ শরীরে ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিতেছি।" (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০)

বাস্তবিকই দ্বিজেন্দ্রের সেই অকস্মাৎ মৃত্যু-ঘটনা, আমাদের সকলের শোচনীয়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ, এবং মাতৃভূমির দুর্ভাগ্যকর হইলেও, তাঁহার নিজের পক্ষে যে তাহা পরম-সৌভাগ্যের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি যে তাঁহার ইহজীবনের স্নেহের বন্ধন—তাঁহার নয়নের মণি—পুত্র ও কন্যাকে অনাথা অবস্থায় ফেলিয়া যাইতেছেন, সেই অসহনীয় চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না—তিনি জীবন-মরণের ব্যবধান জানিতেও পারিলেন না—যে ইষ্টদেবীর চরণ-সেবায় তিনি কায়মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সেই বীণাবাদিনীর নূপুর-গুঞ্জন শুনিতে শুনিতেই তাঁহার ইহজীবনের শেষ নিমেষপাত হইয়া গেল—ইহা কি সামান্য সুকৃতির কথা!

দ্বিজেন্দ্রলাল—অন্তিমশয়নে

৩৬৩ পৃঃ।

রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় শুক্লদ্বাদশীর চন্দ্রোদয় হইলে "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে এসে" সত্যই যেন দ্বিজেন্দ্রকে "মধুর তানে কাতরপ্রাণে" ডাকিল, "আয় চলে আয়, ওরে—আয় চলে আয় আমার পাশে" ;—তিনি সেই ঈপ্সিত আহ্বানে "মহানন্দে"র স্নেহ-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন ; তিনি গায়িয়া ছিলেন "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান" তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল। তিনি কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার লোকান্তরিতা গৃহলক্ষ্মীকে সকাতরে আহ্বান করিয়াছিলেন "যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা, তুমি আমার এসো,"—কে বলিতে পারে—কবি যখন তাঁহার "হেথায় যাহা কিছু প্রেয়" তাহা ছাড়িয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার সেই মহাযাত্রার অজানা আঁধার পথ আলো করিতে সুরবালা 'সুরধামে' আসেন নাই! বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে হইতে কবি করুণস্বরে, আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে গায়িতে ছিলেন—

"পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে ;
বরিষ শ্রবণে, তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা—ভাগীরথি, জাহ্নবি সুরধুনি, কল কল্লোলিনি গঙ্গে ॥"

জহ্নুতনয়া কবির সে কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে অনুমান করিতে পারি। কবি মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন নাই, তৎপূর্ব্বেই সুপ্তি আসিয়া তাঁহার নয়নপল্লব নিমীলিত করিয়া দিয়াছিল। মায়া কাঁদিল,—আমরা কাঁদিলাম—কবির মৃত্যু হইল—কিন্তু মৃত্যু কোথায়! মধুসূদন বলিয়াছেন—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য পূজে সর্ব্বজন।"

দ্বিজেন্দ্রের সেই সৌভাগ্য ঘটিল—তিনি ধন্য হইলেন—অনন্ত জীবন লাভ করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রের দেহত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব হইতে দলে দলে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু গুণগ্রাহী অনেকেই সুরধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের প্রতিবেশী ও স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) মহাশয় কবির নশ্বরদেহ কুসুমদামে সজ্জিত করিবার এবং দ্বিজেন্দ্রের অন্যতম প্রতিবেশী ও বন্ধু শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় অন্তিম-শয্যায় শায়িত কবির আলোকচিত্র তুলিবার উদ্যোগ করিলেন এবং ষ্টার-থিয়েটারে ও মিনার্ভাথিয়েটারে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করিলেন। ললিতবাবুর আত্মীয় ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত চিত্ততোষ বসু মহাশয় সুরধামেই দীপালোকে কবির শেষ চিত্র তুলিলেন। কুসুমাস্তীর্ণশয়নে, পুষ্পমালা ভূষিত কবির দেহ বহন করিয়া বিডনষ্ট্রীট দিয়া গঙ্গাতীরে নিমতলার দাহঘাটে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে জনতা হইতে লাগিল। মিনার্ভা-থিয়েটারে তৎকালে অভিনয় হইতেছিল—থিয়েটারের সম্মুখে শোকযাত্রা উপস্থিত হইলে—অনেকে পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পরে অভিনয় শেষ হইলে উক্ত থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ অনেকেই দাহঘাটে কবির দেহ-সংকার দেখিতে আসিলেন (সে রাত্রে বা তৎপরদিন অভিনয় বন্ধ না করাতে উক্ত থিয়েটারের তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষগণ, 'নায়ক'পত্রে তীব্রভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন *—দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু মহেন্দ্রবাবু তৎকালে জীবিত ছিলেন না)।

---

* "সম্বন্ধ জীবনাবধি কথাটা সত্য বটে, কিন্তু মৃত্যুর পরও সমাজ গোটাকয়েক শিষ্টাচারের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। সে শিষ্টাচার বর্জ্জন করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুজন্য এক দিন থিয়েটার বন্ধ রাখিলে কি

দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র ও কন্যা, বালক ও বালিকা মাত্র—শ্রীমান্ দীলিপকুমার তৎকালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন—তখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই; তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন—কিন্তু দ্বিজেন্দ্র সে সংবাদ জানিয়া যাইতে পারেন নাই। দীলিপকুমার পিতার কয়েকটি মহৎ গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন—ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক। দ্বিজেন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবীর সহিত, বিগত ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬), ভারত-গৌরব, দেশব্রত সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভপরিণয় সংঘটিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রের জীবিতকালেই এই বিবাহ-সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল—দ্বিজেন্দ্র এই সম্বন্ধ প্রার্থনীয় বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। বিধাতা নবদম্পতিকে চিরসুখী করুন।

দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালায় যেরূপ শোকের কল্লোল উঠিয়াছিল, অপর কোনও বাণীসাধকের মৃত্যুতে বোধ হয় সেরূপ উঠে নাই। ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীরা ক্রমে গুণের আদর করিতে—প্রতিভার পূজা করিতে—শিখিয়াছে। সংবাদপত্রে মাসিকপত্রে, দ্বিজেন্দ্রের কীর্ত্তিকথা ঘোষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা, জীবিতকালে দ্বিজেন্দ্রের বিরোধী বলিয়া

ক্ষতি হইত? পয়সা অতি মিষ্ট সামগ্রী বটে, কিন্তু হুকুম মত পয়সা পাও কি? শনিবারে যখন মড়া ঘাড়ে করিয়া মিনার্ভার পাশ দিয়া যাই, তখন সদা সদ্য অভিনয় বন্ধ করিলে কি জাতি যাইত? পর দিন রবিবারেও অভিনয় বন্ধ করা চলিত, তা রবিবারেও কোন থিয়েটার বন্ধ করা হয় নাই. কি ভীষণ শিষ্টাচার। * * * আমাদের যে গেল—যাহা গেল, তাহাকে মাথা কুটিলেও আর পাইব না। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুসারে আমরা করিব। কিন্তু এইবার তোমাদের চিনিয়া রাখিলাম। ছি! ছি!! ছি!!! "নায়ক" ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও গত কথা ভুলিয়া মুক্তকণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রের গুণগান করিতে লাগিলেন। অনেকের ধারণা হইয়ছিল রবীন্দ্রনাথের সহিত মতান্তর হওয়াতে—দ্বিজেন্দ্রের প্রসার বুঝি শিক্ষিত-সমাজে কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যে দিন (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২০) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে দ্বিজেন্দ্রের বিয়োগে শোক-সভার প্রথম আয়োজন হইল, সেই দিন সকলে বুঝিতে পারিলেন—দ্বিজেন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়াছিলেন। কোন শোক-সভায় এত লোকের সমাগম আর কখনও দেখা যায় নাই। সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতলের ও নিম্নতলের সুবৃহৎ কক্ষদ্বয়, সভারম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে ভরিয়া গেল—তত্রাচ লোকসমাগমের শেষ নাই ;—বোধ হয় স্থান থাকিলে ১০টা সাহিত্যপরিষৎ-ভবন জনতায় পূর্ণ হইয়া যাইত। শেষে স্থির হইল নিকটস্থ পার্শ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সভা হইবে। জনস্রোত সেই দিকে ভাসিতে লাগিল। সেই জনতার বন্যা দেখিয়া স্বর্গীয় সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায়ের সম্পাদক) বন্ধুবর আমাকে বলিয়াছিলেন—'আর সভার দরকার কি ? এই ত হয়ে গেল ! আর কি চান ?' সত্যই সেই বিপুল জনসঙ্ঘ দর্শন করিয়া দ্বিজেন্দ্রের গুণগ্রাহী-দের মন, সেই বিষাদ-বেদনার সময়েও, এক অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

সেই শোক-সভায় প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষী ও বাগ্মীগণ বক্তৃতা করেন ; মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সেই সভার প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত ও সমর্থন করেন, স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ীর রচিত 'দ্বিজেন্দ্র-

স্মৃতি' নামক প্রবন্ধ তদীয় পুত্র, এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত 'আনন্দ-বিদায়' নামক প্রবন্ধ, পাঠ করেন, এবং শ্রীযুক্ত হেমন্ত-কুমার লাহিড়ী "আমার জন্মভূমি" সঙ্গীতটি গান করেন।

এই শোকসভার পরে, ৯ই শ্রাবণ, ১৩২০ (২৫ শে জুলাই ১৯১৩) বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট্ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়—সে সভাতেও বিপুল জনতা হইয়াছিল। সে সভাতে সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গসাহিত্যের নেতাগণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বের—প্রতিভার জয়ঘোষণা করেন। সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রসময় লাহা স্বরচিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক কবিতাটি উচ্ছ্বসিত আবেগে পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন, ইভ্নিংক্লাবের সভ্যবৃন্দ দ্বিজেন্দ্রের মহাসঙ্গীত 'ভারতবর্ষ' এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের রচিত 'দ্বিজেন্দ্র-বন্দনা' গীতটি ('আমার দেশ' গীতের সুরে) গান করিয়া শ্রোতা-গণকে বিমুগ্ধ করেন। সেই সভাতে দ্বিজেন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব হয় এবং কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী ও কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ভূস্বামী দ্বয় সেই চাঁদা-দাতৃগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লোকান্তরিত কবির প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের পরিচয় দেন।

তাহার পরে দ্বিজেন্দ্রের আর দুইটি বাৎসরিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। উভয় সভাই রামমোহন লাইব্রেরী-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বাৎসরিক স্মৃতিসভায়, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ও বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনোজ্ঞ অভিভাষণে পরলোকগত কবির

প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন; স্বর্গীয় কবিবর বরদাচরণ মিত্র মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের বাণী-সাধনার বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করেন এবং শ্রীমান্ দীলিপকুমার "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" মহাসঙ্গীতটি সুধাবর্ষী কণ্ঠে গান করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন।

দ্বিতীয় বর্ষের স্মৃতিসভায় প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানীর বংশধর বাণী-সাধক মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তদীয় শব্দৈশ্বর্য্যময়ী, অনিন্দ্যসুন্দরী ভাষায় দ্বিজেন্দ্রের কাব্যনাটক-সঙ্গীতাদির, এবং মনস্বী সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রের প্রবর্ত্তিত গীতের সুরের বিশেষত্বের, ও স্বর্গীয় লোকেন্দ্র পালিত দ্বিজেন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতম প্রীতিস্মৃতির, পরিচয় দেন। কবিবর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র স্বরচিত "দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি' কবিতা আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পাঠ করেন, পাঁচকড়ি বাবু বিপিন বাবু প্রভৃতি বাগ্মীগণ বক্তৃতা করেন, 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-বন্দনাত্মক একটি সুললিত রচনা, ও রসময় বাবু তদীয় দ্বিজেন্দ্র-গাথা সনেট-গুচ্ছ পাঠ করেন এবং শ্রীমান্ দীলিপকুমার এবং সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রিয় মিত্র দ্বিজেন্দ্রের কয়েকটি মহাসঙ্গীত গান করেন।

এস্থলে বলা প্রয়োজন, উক্ত স্মৃতিসভাগুলি প্রধানতঃ কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রধান উদ্যোগী হইয়া দেবকুমার বাবু তাঁহার অসামান্য বন্ধু-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি বঙ্গীয়সাহিত্যিকগণের ও দ্বিজেন্দ্রলালের গুণমুগ্ধ স্বদেশ-প্রেমিক মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভার পূর্ব্ব বৎসরদ্বয়ের মত বিরাট্ আয়োজন হয় নাই। মৃজাপুর ফ্রিনিজ্ ইউনিয়ন্ লাইব্রেরীর সভা যুবকবৃন্দের উদ্যোগে বিগত ২৮শে মে, ১৯১৬, উক্ত পুস্তকাগারে,

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দ্বিজেন্দ্রের সাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভার নাম রক্ষা হইয়াছে মাত্র। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া "বাঙ্গালী" দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন *। দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুগণ কবির স্মৃতিরক্ষার কি আয়োজন করিয়াছেন তাহা জানি না। দ্বিজেন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ, বাঙ্গালার অপরাপর কবি ও সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার আন্দোলনের মত, শেষে কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইলে, দেশের দুর্ভাগ্য এবং আমাদের লজ্জার বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই—তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বঙ্গসাহিত্যে রস রচনার আদর থাকিবে, বঙ্গসমাজ মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজিবে, যতদিন বাঙ্গালী মাতৃভূমিকে "আমার দেশ" বলিয়া ডাকিতে ভুলিয়া না যাইবে, ততদিন দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতে থাকিবে।

---

* "বাঙ্গালী গতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণের জন্য রামমোহন লাইব্রেরীতে সভা করিয়াছিলেন। এ বৎসর তাহার পুনরাভিনয় দেখিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। সমগ্র জাতির যাহা কর্ত্তব্য, দেশের যুবকসম্প্রদায় সাধ্যমত তাহা পালন করিলেন। সচরাচর আমরা স্মরণ-সভায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই। দেশের বয়স্ক ও মাতব্বর সামাজিকেরা সেই সকল অনুষ্ঠানে প্রায়ই উপস্থিত হন না। অনেকে উপস্থিত হইব বলিয়াও সে প্রতিশ্রুতি পালন করেন না। জাতীয় দৈন্য, প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য, চরিত্রগত সঙ্কীর্ণতার এই শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া লজ্জিত না হইয়া থাকা যায় না।" বাঙ্গালী, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

কাব্যকুঞ্জে শোকোচ্ছ্বাস

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর বাঙ্গালার মাসিক-সাহিত্যাদিতে যে সকল প্রবন্ধে তাঁহার কবিত্বের কথা—বঙ্গসাহিত্যে প্রভাবের কথা, আলোচিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রবন্ধের আভাষ এই পুস্তকের বহুস্থানে দিয়াছি। এক্ষণে কবির বিয়োগে যে সকল শোকগাথা মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলাম—

দ্বিজেন্দ্র-সম্ভাষণে

* * * *

"যাও, কবি, স্বপ্ন-লোকে, মনোগামী পুষ্পকের রথে,
সুরবালা সনে বাণী বর্ষিছেন লাজাঞ্জলি পথে।
ওই শোন মেঘে মেঘে দ্রিম্ দ্রিম্ বাজিছে ষড়জ,
সপ্ত-সুর-সরোবরে দল্-মল্ ফুটিছে সরোজ।
মত্ত করী সম তুমি পশ গিয়া কমল-কাননে,
মুক্তি-স্নান কর নীরে, জ্ঞানাঞ্জন মাখ দু'নয়নে।
ধীরে হ'বে প্রতিভাত, ছিল যাহা ঢাকা অন্ধকারে,
খুঁজেছ যা' আতি-পাতি, এই পার হ'তে 'পর-পারে'।
দেখিবে নিকটে এক রঙ্গ-ভরা মহানাট্য-শালা,
মহাকাল অভিনেতা, বিশ্বেশ্বর রচিছেন পালা।

আবার আসিবে তুমি ;—যুগে যুগে, জন্মে জন্মে যারে
মা বলেছ, সেই কোলে চির-স্নেহে টানিবে তোমারে।
এ যে উৎসর্গের তরে সুধা-কুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন,
অসমাপ্ত আছে যাহা, হ'বে, বন্ধু, হ'বে তা' পূরণ।
হারায় না কিছু বিশ্বে, প্রকৃতির গুছান-স্বভাব,
দ্বিজেন্দ্র পূরাবে এসে, দ্বিজেন্দ্রের অকাল-অভাব।"

সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২০। —— শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আজকে হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে বাণীর বীণার একটা তার!
বিশ্ব জুড়ে উঠেছে আজ এক মহা হাহাকার!

* * *

জন্মভূমি মায়ের অধিক যাহার কাছে পেয়েছে মান ;
বাঙ্গালা ভাষা হৃদয় যাহার, বাঙ্গালী যার ছিল গো প্রাণ ;
কুনীতি যে বিষের মত ক'র্‌ত দূরে পরিহার ;
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় যাহার মত ছিল না আর।
শিশুর মত সরল যে জন, গল্প কথায় কাটাত দিন ;
ধনী নির্ধন সমান যাহার অভিন্ন যার মহৎ হীন ;
নবীন প্রবীণ সবার সনে তুল্য যাহার ব্যবহার ;
স্নেহে, প্রেমে, দানে, ক্ষমায়, সমতুল্য নাহিক যার,
উদার, রসিক, ভাবুক, যিনি, গায়ক, কবি, নাট্যকার ;
তর্কশাস্ত্রে ছিল যাহার অসাধারণ অধিকার ;
চলে গেছে হঠাৎ সে আজ— শূন্য ক'রে বাঙ্গালা দেশ!
জীর্ণবস্ত্র ফেলে সে আজ পর্‌তে গেল নূতন বেশ!

ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০। —— শ্রীনরেন্দ্র দেব।

'দ্বিজু'

বাণীর অমূল্যনিধি, সাহিত্য-সম্রাট্,
অকস্মাৎ তোমা তরে স্বর্গের কপাট
খুলি গেল ; অসময়ে গেলে তাড়াতাড়ি
সাধের "জনমভূমি"—মাতৃবক্ষ ছাড়ি।

* * *

যৌবন-বসন্ত সনে মানস তোমার
স্বদেশের প্রেমরাগে বাজিল আবার
ব্যঙ্গহাস্যে ; উচ্ছ্বসিয়া উঠিল হৃদয় ;
হাসি-স্রোত বহাইল বঙ্গদেশময়।

* * *

"আমার দেশে"র কথা কার মুখে আর
শুনিবে ভারতবাসী অনন্ত ঝঙ্কার !
অশ্রান্ত অমৃত ধারা পান করিবার
কা'র মুখ পানে চাহি ভুলিবে সংসার-
দুঃখ দৈন্য রোগ শোক বাঙ্গালী-জীবন ?
সঞ্জীবনী-সুধা-দানে আবার নূতন
গড়িবে দেশের হিয়া, প্রীতি অনুরাগে
ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেবা দিবে আগে ?

* * *

শিক্ষক বলিয়া আজি করিব সম্মান,
সারদার বরপুত্র চিরমতিমান্।

সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২০। —— শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

দ্বিজেন্দ্র-বন্দনা

(টাউনহলের স্মৃতিসভায় গীত—সুর 'আমার দেশ')

বঙ্গ তোমার, জননী তোমার, ধাত্রী তোমার, তোমার দেশ,
হেরিয়া তোমার মুদিত নয়ন, হেরিয়া তোমার স্থির কেশ,
হেরিয়া তোমার ধূলায় শয়ন, হেরিয়া তোমার অন্তিম বেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে কাঁদে উচ্চে,—নাহিক শেষ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য কীর্ত্তি দ্বিজ-ইন্দ্র !" গাবে যখন কালের শেষ।
একদা যাহার সরস কণ্ঠ হাসায়ে বাংলা করিল জয়,
একদা যাহার দীপক-গীত ছাড়িল ভারত অম্বরময়,
ছন্দ যাহার ভাষার অঙ্গে পরাল কতই নবীন বেশ,
তার কিনা আজি ধূলায় শয়ন, তার কিনা আজি হইল শেষ।
কিসের ইত্যাদি——
গাহিল যে জন সুরজমন্ত্রে কবিতা কুঞ্জে মধুর তান,
চিত্র করিল প্রতাপ ও শক্ত, দুর্গাদাস রাঠোর মান ;
দেখাল যতেক মোগল সিংহ, গাহিল দিব্য মেবার শেষ ;
ধন্য আমরা পাইয়া তাহায়—ধন্য তাহার পুণ্য দেশ।
কিসের ইত্যাদি——
লইল যাহারে, শ্বেতবসনা মুক্ত করিয়া স্বর্ণদ্বার,
আজি গো কতই ক্ষুদ্র মহৎ, ভক্তি-প্রণত চরণে যার,
সাহিত্য অপার কীর্ত্তি যোবিল পরায়ে যাঁহারে অমর বেশ,
অকাল মৃত্যু গ্রাসিল তাঁহারে নাহিক হৃদয়ে দয়ার লেশ !
কিসের ইত্যাদি——

যদিও তোমার নিত্য বিরহে, নেহারি কেবল আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ, তোমারি গরিমা, মোহের রজনী করিবে ভোর,
আমরা পূজিব প্রতিমা তোমার,—মানুষ আমরা নহিত মেষ,
জ্যোতি তোমার, ধর্ম্ম তোমার, সাধনা তোমার, ব্যাপিবে দেশ।
কিসের ইত্যাদি——

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

দ্বিজেন্দ্র-বিয়োগে

* * *

বসন্তে জাগায়ে দিয়া কোকিল কোথায় গেল চলি'
'গৃহস্থের খোকা হোক' কাঁদিল সে 'চোখ গেল' বলি।
রঙ্গরসে সারাবঙ্গ মাতাইয়া যেন অর্দ্ধপথে
বঙ্গ-বৃন্দাবনচন্দ্র আরোহিলা অক্রূরের রথে।
যে দিয়াছে এত সুখ, সেও এত দুঃখ দিতে জানে—
হায়রে দুর্ভাগা দেশ, আনন্দ কি সহে তোর প্রাণে!
আপনি স্বদেশলক্ষ্মী হের আজি শূন্য কোল নিয়া
কবিবর, তোমা পানে অশ্রুনেত্রে আছেন চাহিয়া!
এরি মাঝে মর্ত্ত্যের কর্ত্তব্যের হইল কি শেষ?
'সকল দেশের রাণী' আজিও যে চিনিল না দেশ!
এখনো এ দগ্ধদেশে ছদ্মবেশে ফিরে 'নন্দলাল'—
ফিরে' এস, ফিরে' এস—সাহিত্যের আনন্দ দুলাল।
শতাব্দীর দুঃখ-দৈন্তে জর্জ্জরিত যাহার হৃদয়
হাস্য যে অমৃত তার—অবসন্ন আত্মার অভয়।

তুমি সেই অমৃতের কবি, ঋষি, মহাপ্রচারক
দেশভক্ত মহাকর্ম্মী, জননীর অক্লান্ত সাধক ;
যাও তবে কবিবর, 'সুরধামে', মহাসিন্ধু পারে ;
তোমারি অমৃত গীতি শান্তি দিক আজি সবাকারে।

মানসী, শ্রাবণ, ১৩২০। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

* * *

হে কবীন্দ্র, বাণীভক্ত, মহাপ্রাণ, স্বদেশপ্রেমিক
পরিহরি বসুধার এই মায়া-কন্দুক অলীক,
মহিমার উপাধানে রাখি শির ঘুমাইছ সুখে—
স্বপ্নহারা কি প্রশান্তি! কি নির্ম্মাল্য ভাসে তব মুখে!

* * *

অলঙ্কৃত ছিলে, দেব, অপার্থিব প্রসাদ সম্পদে,
ফুটিল যে তামরস তোমার সে মানসের হ্রদে
অফুরন্ত পরিমলে চিরদিন মাতোয়ারা করি
রাখিবে বঙ্গের কুঞ্জ। অকপট অশ্রুর লহরী
অতরল করি'—মোরা রচি' তব বিজয় তোরণ,
তোমার স্মৃতিরে সেথা পুণ্য লগ্নে করিব বরণ।
শতাব্দীর ইতি কথা কীর্ত্তি তব রাখিবে গাঁথিয়া
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মাঝে রত্নবেদী দিবে উদ্ভাসিয়া।

* * *

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল

উদার আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি'।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত॥
গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত
উঠেছিল বেজে তব মন্দ্র—মন্দ্র বাঁশী
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরে সুরে বেদনা উচ্ছ্বাসি'।
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত॥

সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্য ভুবনে,
সে সুর চারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্য পবনে।

যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।

সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩২০। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দ্বিজেন্দ্রলাল

(টাউনহলের স্মৃতিসভায় পঠিত)

হে ঋত্বিক্, তব যজ্ঞ না হইতে শেষ
চলে গেলে—কোথা গেলে স্বদেশবৎসল?
সিদ্ধি লভিবারে বুঝি হইতে সফল
আবার আসিছ ফিরে পরি নব বেশ।

*　　　*　　　*

কি ভালই বেসেছিলে জনম-ভূমিরে
বিশ্ব জুড়ি মাতৃমূর্ত্তি হেরিতে নয়নে,
মায়ের প্রতিমা স্থাপি হৃদয়-আসনে
কত প্রীতি স্মৃতি স্বপ্নে রেখেছিলে ঘিরে।

*　　　*　　　*

আমাদের দুঃখ দৈন্য মর্ম্ম কাতরতা
এ শুধু ক্ষণিক মেঘ, বুঝেছিলে তুমি
তোমার সাধনা স্বর্গ, দেবী জন্মভূমি
ঘোষেছিলে মুক্তকণ্ঠে তাই এ বারতা।

*　　　*　　　*

হৃদে যাঁর বেদ মন্ত্র গীতা যার প্রাণ
সেই ভারতের তুমি অমর সন্তান।

*　　　*　　　*

এ জীবন স্বপ্ন মাত্র বুঝায়ে ইঙ্গিতে
মর্ত্ত্য হতে জেগে উঠে স্বর্গে গেলে চলে ;
অমর হে কবিবর দোলে তব গলে
যশের মন্দার-মালা কতই ভঙ্গিতে,
সুরধাম ভরে গেছে মধুর সঙ্গীতে
সুরবালা-হৃদে কত আনন্দ উথলে !
সারস্বত-কুঞ্জে সেথা ভক্ত দলে দলে
দাঁড়ায়ে সহাস্য মুখে তোমারে বন্দিতে।
সেথায় উল্লাস—হেথা জাগিছে বিষাদ,
সেথা পুষ্পবৃষ্টি—হেথা ঝরে অশ্রুনীর,

সেথায় জ্যোৎস্না—হেথা তামস গভীর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পরস্পরে লভে কি এ স্বাদ ?
সুরধামে আজ তুমি লভিছ বিরাম
হেথা তব হাতে গড়া কাঁদে 'সুরধাম।'

নব্যভারত, মাঘ, ১৩২০। শ্রীরসময় লাহা।

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি

(দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভায় পঠিত)

মহাসিন্ধু পার হতে সে যেনরে ভেসে আসে
এ মধুর চন্দ্রালোকে মধুময় ফুলবাসে,
সমীর বহিয়া যায়, পিক কলকণ্ঠে গায়,
এই গীতি গন্ধময় যামিনীর আবরণে
সে যেন আবার আসে তার গীতি গন্ধ সনে।

* * *

দাও দাও হৃদি খুলে, আসুক বহিয়া তার,
প্রাণের সে কথাগুলি, হৃদি ভরি আরবার ;
এই স্নিগ্ধ মন্দানিলে, উছলিত এ সলিলে,
সে যে ঢেলে দিয়েছিল তার সব ভালবাসা ;
শেষদিনে সে পুরাল সকল দিনের আশা।

স্বপ্নের নন্দন শোভা স্মৃতির ঊষার হাসি—
তার দেশ তারে দিল ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
জীবনের ভালবাসা, মরণের পর আশা—
তার ভাষা তারে দিল অমৃতের বরদান ;
এ দুয়ের সেবাতে সে ভুলেছিল অর্থ মান।

এ দেশের মাটি তার মনোসাধ পূরায়েছে
সে কেন দেশের সাধ না পূরায়ে চলে গেছে ?
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা চলে গেছে নিয়ে ডালা ;
দু চারিটী ফেলে গেছে মধুর সুবাসে ভরা
তাই বুকে ক'রে আছে তার জনমের ধরা।

ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২২। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

স্মৃতি

("হেঁয়ালি" হইতে উদ্ধৃত)

মৃত্যু ? সে ত নির্ব্বাপিত ! উদ্ভাসিত জন্ম-মহোৎসব ;—
তব প্রভাতের দীপ্ত নভস্তলে জাগে কলরব।
সুসজ্জ উজ্জ্বল মঞ্চে লক্ষ যুবা, পরি' চারুবেশ,
স্ফীত-বক্ষে স্মিত-মুখে, গাহে ওই—রে "আমার দেশ।"
অম্বরের নীলবক্ষ,—শান্তি-পূত বিশ্রান্ত বিস্তৃত—
বিচ্ছিন্ন বিশদ শুভ্র অভ্ররূপ চন্দনে চর্চ্চিত।
ঊর্দ্ধে ভাতে নীলিমায় সৌর-কর গরিমা ভাস্বর,
নিম্নে নির্ঝরিণী অঙ্গে রত্নরেণু ঝরিছে ঝর্ঝর ;
মধ্যভাগে লঙ্ঘি' সানু শত শৈল-শৃঙ্গ তরঙ্গিত,
পুষ্প-পুঞ্জ-ভরা কুঞ্জ বিহঙ্গের গীতি কম্পিত।
উল্লাসে জাগিল বিশ্ব ; সে গরিমা, সে মাধুরী চুমি'
জাগে অতুলন বিশ্বে হাস্যময়ী শ্যামা জন্মভূমি।
অন্ধকার অস্তমিত, নাহি মেঘ, প্রভাত উদিত ;
গরিমার—মহিমার শুভ্র-দীপ্তি ললাটে স্ফুরিত।
তুমি প্রিয় জন্মভূমি !—ধন্য তুমি,—ধন্য পরমেশ !
দেখিলাম সাধনার চিরারাধ্য আমার স্বদেশ !

গাহ সবে কলরবে উৎসবের মন্দির ধ্বনিয়া,
দেখ দেবী—দেখ স্বর্গ,—লভ সিদ্ধি চরণে নমিয়া।
উতরিনু দৈন্য লজ্জা, গেছে দুঃখ—নাহি আর ক্লেশ;
নবীন প্রভাতে তুমি হাস্যময়—হে "আমার দেশ।"

১৩২২ শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

("তর্পণ" হইতে উদ্ধৃত)

ব্যঙ্গ-পদ্যে, শুভ্রশুচি পরিহাস-গানে
অতুলন, দেখায়ে সমাজ-ক্ষত শত,
রত্নোজ্জ্বল-ছত্র-গদ্যে, মুক্তা-শ্লোকে কত,
কবিত্ব-মণ্ডিত নাট্যে, বিকশিয়া প্রাণে
কি মহত্ত্ব ভ্রাতৃপ্রেমে, ত্যাগে, আত্মদানে,
বীরধর্ম্মে, সাধনায় পরহিত-ব্রত,
প্রাণ-ঢালা গীতে করি' দেশাত্মা জাগ্রত,
'মানুষ' গড়িতেছিলে, বঙ্গের সন্তানে।

অকস্মাৎ স্তব্ধ করি' স্তোত্র সুগম্ভীর,
ফেলিয়া 'ভারতবর্ষ'—'জন্মভূমি'—'দেশ'—
আরব্ধ বাণীর ব্রত, করিলে প্রয়াণ
কোথা তুমি, কলকণ্ঠ, কবিকুল-বীর,
রাখি চিরস্মৃতি হায়! সঙ্গীতের রেশ—
হে রসিক, হে ভাবুক, হে স্বদেশ-প্রাণ!

দর্শক, আষাঢ়, ১৩২১। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সমাপ্ত।
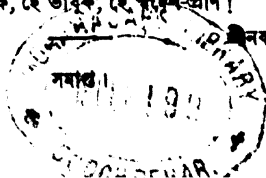
প্যারীচরণ সরকার।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত।

কর্ম্মবীর স্বদেশসেবকের জীবনচরিত। সচিত্র, মূল্য ১।০ মাত্র। প্রাইজ ও উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী—শিক্ষা-বিভাগের নির্ব্বাচিত। প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রে ও মাসিকপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"এই পুস্তক-খানি বঙ্গ-সাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগের একটী অভাব পূরণ করিল।"

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন—"এর সবটুকুই ভাল, পবিত্র, শ্রদ্ধেয়।"—বঙ্গদর্শন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্যারীবাবুর ধর্ম্মমত বিচার স্থলে গ্রন্থকার যে উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ও রচনায়ও বেশ পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।"

সাহিত্যরথী ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"I have felt fascinated by the story of this model life as told in this memoir."

"অচিরে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের যদি প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্দ্দশা বলিতে হইবে।"—হিতবাদী।

"The author Babu Navakrishna Ghosh, B. A. is not unknown to readers of Bengali literature, but he will by this Life, henceforth take a distinguished place in the ranks of Bengali authorship. * * * The story of the earnest and sublime "life of laborious days" led by this philanthropist has been charmingly told, and with much grace of style, in some 20 chapters full of information the author's industry has unearthed. * * We cannot think of a book more salubrious to the younger generation now in schools than this life of one who has fittingly been called the 'Arnold of the East."

Indian Mirror.

"We have no hesitation in saying that the book can fittingly take its place among the best biographical literature of Bengal."

Bengalee.

"Babu Navakrishna Ghose has done a service to the commnity and will, we hope, receive that encouragement which is his due. "*Amrita Bazar Patrika.*

"The book, we vanture to think, should not only be read as a moral reader but as a biography which is a part of the history of a nation" *National Magazine.*

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

নবকৃষ্ণ বাবুর লিখিত

কবি বিহারিলাল।

'সারদামঙ্গল,' 'বঙ্গ সুন্দরী' প্রভৃতি প্রণেতা, বর্ত্তমান যুগের গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক, কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর জীবন-কাহিনী ও কাব্যকথার সরস অনুশীলন। কবিতার মত মধুর এবং উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। পঞ্চদশ বর্ষপূর্ব্বে "প্রয়াস"পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবার সময় "সাহিত্য," "পূর্ণিমা" "বসুমতী," "সঞ্জয়" প্রভৃতি পত্রে এই গ্রন্থ "সুলিখিত," "সুখপাঠ্য" "উপভোগযোগ্য", "কৌতূহলপ্রদ" প্রভৃতি বাক্যে অভিনন্দিত এবং বহুতর কবি ও সাহিত্য-সেবী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। "লুসিটানিয়া" জাহাজের সহিত সাগরসমাধিগত "মানসী"র ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সম্পাদক স্বর্গীয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় "বঙ্গ-সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা" পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। "বিহারিলাল খুব বড় কবি। যদি কাল বিচার করা যায় তাহা হইলে তিনি বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় কবি। * * * দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের মনীষিগণ তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন, তাই কেহ সখা, কেহ গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় কবিকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণকে সেই অমৃতের অধিকারী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে "প্রয়াস"নামক মাসিকপত্রে যে প্রবন্ধনিচয় লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিহারিলালকে বুঝিবার পথ সুগম হইয়াছে। * * * নবকৃষ্ণ বাবুর পাণ্ডিত্য, অনুশীলন শক্তি ও কাব্যানুরাগ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।"

তর্পণ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত।

বহুচিত্রে সুশোভিত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চণ্ডীদাস কৃত্তিবাস, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ শতাধিক চিরস্মরণীয় বঙ্গসন্তানের জীবন-গাথা ও হাফটোন চিত্র।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—"তর্পণ প্রকৃতই তর্পণপদবাচ্য। বাঙ্গালাভাষায় এরূপ স্মারক কবিতা বড়ই বিরল। গ্রন্থে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, দানবীর, জ্ঞানবীর, সকল শ্রেণীর কর্ম্মীর কথাই আছে। বর্ত্তমান যুগ কর্ম্মের যুগ, এই যুগে মহাত্মাদিগের জীবনীর বিশেষ উপযোগ আছে। সুতরাং তর্পণকার প্রকৃতই এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। কবিতাগুলির রচনা বড়ই প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহিণী ও ভাবোদ্দীপক।'

হিতবাদী …াধারণ গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ণনায় আদ্যন্ত নিরপেক্ষতা রক্ষিত হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল ভাবপূর্ণ ও প্রতিভার দ্যোতক।"

অর্চ্চনা—"তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কবি তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী কাটাইয়া মনুষ্য মাত্রেরই পূজা করিয়াছেন। যে গ্রন্থ খুলিলে এক সঙ্গে এতগুলি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নাম ও চিত্র পাওয়া যায় সে পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক ইহাই আমাদের বাসনা। কবি নবকৃষ্ণ আপনার গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব মনোরম করিয়াছেন এবং অতিশয় কৃতিত্বের সহিত প্রত্যেকের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠে পরিতোষ লাভ করিয়াছি।"

বঙ্গবাসী—"গ্রন্থকার সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তিনি সুলেখক। আলোচ্য গ্রন্থ যে সাহিত্যিক মাত্রেরই আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সঞ্জীবনী—"প্রত্যেক মহাজনের বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ—"কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে।"

এডুকেশন গেজেট—"এই পুস্তকখানি সকল বাঙ্গালীরই রাখা উচিত।"

দর্শক—"নবকৃষ্ণ বাবু সুলেখক; তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী। বিদ্বজ্জন সমাজে এ পুস্তক যে বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যখন এই সকল কবিতা ধারাবাহিকরূপে দর্শকে প্রকাশিত হইত তখন হইতে বহু প্রশংসাপত্র দর্শক কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইত।"

Amrita Basar Patrika.—"This book is unique of its kind in Bengali literature. Written in a charming style the sonnets will, besides being instructive, have an educative value."

Bengalee.—"The language is just in keeping with the solemnity of the subjects treated—sonorous and forceful but lucid and elegant."

Hindoo Patriot.—"The idea * * does credit to the patriotism of the composer."

Indian Empire.—"The author's prolific pen has earned fresh lustre by the publication of this book."

নবকৃষ্ণ বাবুর আর তিনখানি সর্বজন প্রশংসিত গ্রন্থ—

১। ইলিয়াডের গল্প—(সচিত্র) মূল্য ।০ আনা।
"শিক্ষাপ্রদ ও উপন্যাসের মত পাঠেচ্ছা-বর্দ্ধক"—অর্চ্চনা।

২। অডিসির গল্প—(সচিত্র) মূল্য ।০ আনা।
"মনোহর ভাষায় লিখিত"—সঞ্জীবনী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত।

৩। শান্তি—(নবপ্রকাশিত স্ত্রী-পাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস) মূল্য ৸০ আনা।
১৩২৫ সালের 'দর্শক' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবার সময় গ্রাহকগণ এই গল্পের আড়ম্বরশূন্য মনোহারিত্বের ও মার্জ্জিত-রুচি সরসতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

LIBRARY COOCHBEHAR 19